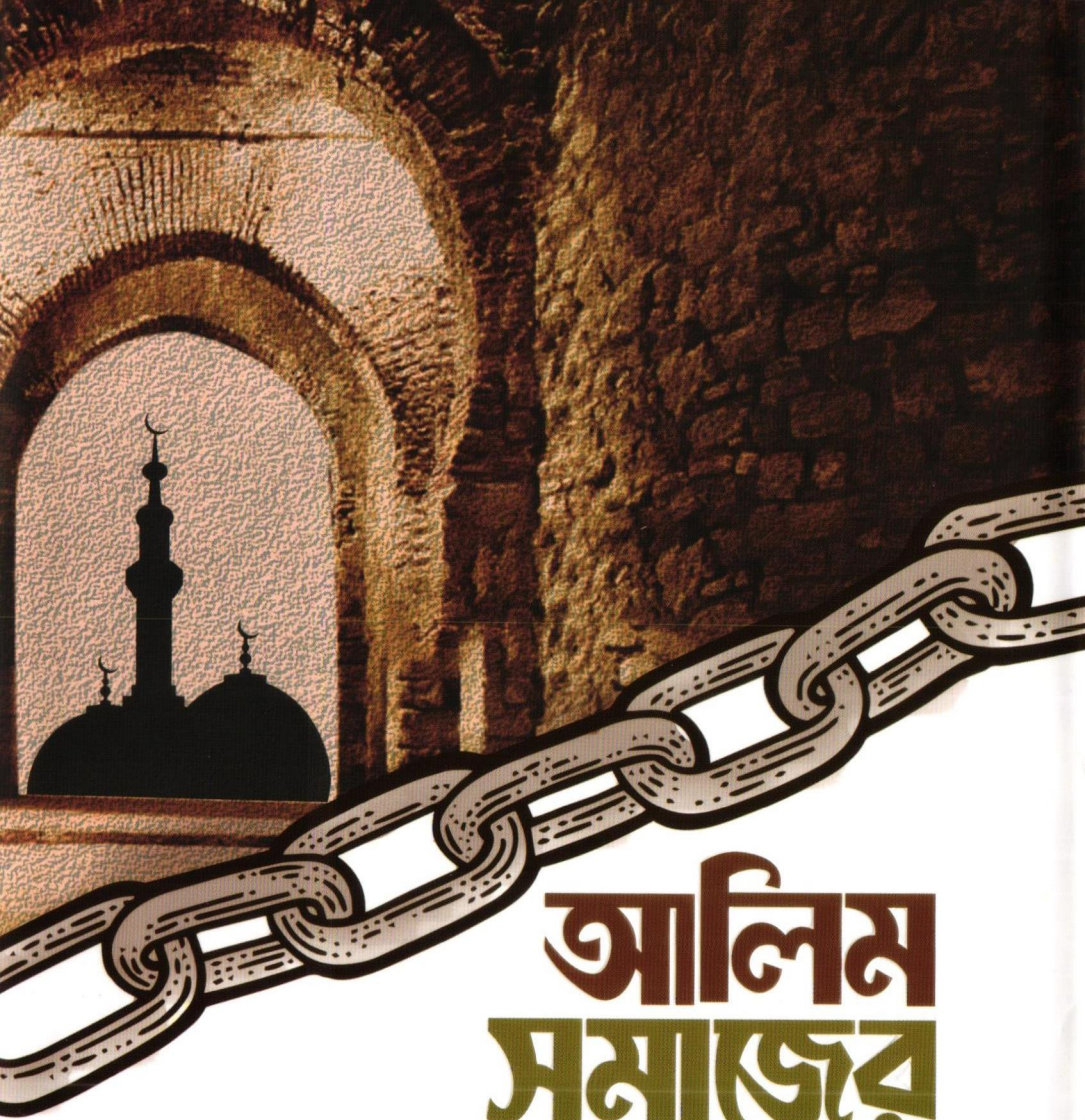

আলিম সমাজের ঐক্য

অন্তরায় ও প্রক্রিয়া : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. আহমদ আলী

ড. আহমদ আলী

ড. আহমদ আলী দেশের শীর্ষস্থানীয় গবেষক আলিম হিসেবে সুপরিচিত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক। ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল *ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা*'র সম্পাদক। পেশাগত জীবনের শুরুতে ছিলেন চুনতি হাকিমিয়ার মুহাদ্দিস ও উপাধ্যক্ষ।

যুবদাতুল বায়ান ফী ঈদাহিল কুরআন (১ম ও ২য় খণ্ড, তাফসীর) *তুলনামূলক ফিকহ, খলীফাতু রাসূলিল্লাহ আবূ বাক্‌র আস্-সিদ্দীক রা., তাযকিয়াতুন নাফস, ইসলামের শাস্তি আইন, ইসমাতুল আম্বিয়া, বিদআত* (১-৭ খণ্ড), *মুসলিম লিপিকলা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, প্রকৃত আলিমের সন্ধানে, আলিম সমাজের ঐক্য (অন্তরায় ও প্রক্রিয়া : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ), সার্বভৌমত্ব : ইসলামি দৃষ্টিকোণ, গণতন্ত্র : ইসলামি দৃষ্টিকোণ* ইত্যাদি ড. আহমদ আলীর উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর গবেষণাপ্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

ড. আহমদ আলীর জন্ম ১৯৬৯ সালে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায়। পড়াশোনা করেছেন চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তুমি মুমিনদের পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দেখতে পাবে যে, তারা একটি দেহসদৃশ। যদি দেহের কোনো এক অঙ্গে ব্যথার অনুযোগ থাকে, তাহলে গোটা দেহই আক্রান্ত হয়। তা ঘুমাতে পারে না এবং জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

বুখারী, *আস-সহীহ*
অধ্যায় : আল-আদাব
হা. নং : ২৭/৫৬৬৫

https://nagorikpathagar.org

আলিম সমাজের ঐক্য

অন্তরায় ও প্রক্রিয়া : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

https://nagorikpathagar.org

আলিম সমাজের ঐক্য

অন্তরায় ও প্রক্রিয়া : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. আহমদ আলী
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ প্রকাশন

https://nagorikpathagar.org

আলিম সমাজের ঐক্য

অন্তরায় ও প্রক্রিয়া : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. আহমদ আলী

প্রচ্ছদ প্রকাশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৩১৫-৩৭৩০২৫, ০১৭৮১-১৭২০২৬

prossodinfo@gmail.com

fb/Prossod Prokashon

www.prossodprokashon.com

১ম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২৩

২য় মুদ্রণ : এপ্রিল, ২০২৪

স্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

প্রকাশনাক্রম : ৫২

মূল্য : ৪৩০/- (চারশত ত্রিশ টাকা)

ALIM SHOMAJER OIKKO

ONTORAI O PROKKRIA : PREKKIT BANGLADESH

by Dr. Ahmad Ali

Published by Prossod Prokashon

ISBN: 978-984-96946-5-6

https://nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১

প্রথম অধ্যায় :

ইত্তিহাদ ও ইফতিরাক ১৯

ইত্তিহাদ (ঐক্য)-এর মর্ম ও নানা ধরন ১৯

দল ও ঐক্য : পরিসরগত পার্থক্য ২০

উদ্দিষ্ট ইত্তিহাদ (ঐক্য) ২১

ইসলামে ইত্তিহাদ বা ঐক্যের গুরুত্ব ২৩

ইফতিরাক (বিভক্তি ও দলাদলি)-এর অর্থ ৩৭

ইফতিরাক-সংক্রান্ত প্রচলিত কতিপয় ভুল ৩৯

কুফর ও বিদআতের অভিযোগ : কর্ম ও বিশেষণের পার্থক্য ৪৫

ইফতিরাক বনাম ইখতিলাফ ৪৮

আকীদাগত বিভক্ত জনগোষ্ঠীর স্বরূপ ৫২

ইসলামে আকীদাগত ইফতিরাকের উৎপত্তি ৫৫

বিভেদ সৃষ্টিকারী শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ ৫৯

ইফতিরাকের প্রধান প্রধান কারণ ৬২

১. জ্ঞানের উৎস নির্ধারণে মতভেদ ৬২

২. কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যায় মতভেদ ৬৩

৩. তাত্ত্বিক বিতর্ক ৬৪

৪. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে থাকা ৬৫

https://nagorikpathagar.org

৫. বিদআত ও ভ্রান্তির ব্যাপারে নমনীয়তা ৬৬
৬. দ্বীনের ব্যাপারে অযাচিত কড়াকড়ি (التشدد) ৬৬
৭. নিজস্ব চিন্তা ও অধ্যয়নের ওপর একান্ত নির্ভরতা ৬৯
৮. হিংসা-বিদ্বেষ ও জিদ ৭২
৯. নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব ৭৫
১০. রাজনৈতিক মতভেদ ও দলান্ধতা ৭৭
১১. অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র ৭৮
বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি ৮০
ইফতিরাক থেকে বাঁচার উপায় ৮১
ব্যাবহারিক বিষয়ে ইখতিলাফ এবং ইসলামে এর বিধান ৮৩
রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে ইখতিলাফ ও এর স্বরূপ ৮৯
মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসৃত ইখতিলাফের নিয়ম ও শিষ্টাচার ৯৬
ক. নিজের মতকে একমাত্র সঠিক মনে না করা ৯৭
খ. অপরের মতকে শ্রদ্ধা করা ১০১
গ. দলীল পাওয়া গেলে নিজের অবস্থান প্রত্যাহার করা ১০৪
ঘ. গবেষণাধর্মী বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বীকে খারাপ মনে না করা ১০৯
ঙ. ইমামগণের একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ১১২
চ. নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত মতপার্থক্য না করা ১১৭
ছ. অভিজ্ঞজনের ওপর ফাতওয়ার ভার ন্যস্ত করা ১১৯
জ. শারঈ দলীলনির্ভর প্রচলিত রীতির প্রতি নজর রাখা ১২৩
ব্যাবহারিক শাখাগত বিষয়সমূহে বাড়াবাড়ি এবং এর কারণ ১২৮
ক. তুলনামূলক অধ্যয়নের অভাব ১৩১
খ. সুন্নাহর ওপর পর্যাপ্ত ও গভীর জ্ঞান না রাখা ১৩২
গ. শরীয়তের ওপর গবেষণার মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ১৩৩
ঘ. শরীয়তের মাকাসিদ ও উসূল সম্পর্কে জ্ঞান না রাখা ১৩৩
ঙ. মাযহাবী শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা ১৩৪

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায় :

আলিমগণের ঐক্যের অন্তরায় ও অনৈক্যের পরিণাম ১৩৫

আলিমের পরিচয় ১৩৫

আলিমের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলি ১৪২

ক. অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা ১৪২

খ. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলি ১৪৮

আলিমের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য ১৫১

আলিমদের ঐক্যের গুরুত্ব ১৫৪

আলিমদের বিভেদের চিত্র : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ১৫৬

আলিমদের প্রধান প্রধান ধারা ১৫৭

ক. দেওবন্দী ধারা ১৫৭

নদভী ধারা ১৫৮

খ. সালাফী ধারা ১৫৯

গ. বেরেলভী ধারা ১৫৯

ঘ. দর্শননির্ভর বাতিনী সূফী ধারা ১৫৯

ঙ. শরীয়তনির্ভর সূফী ধারা ১৫৯

চ. মিশ্র ধারা ১৬০

ছ. জিহাদী ধারা ১৬০

বিভিন্ন ধারার দল-উপদলসমূহ ১৬১

ক. দেওবন্দী ধারার দল-উপদলসমূহ ১৬১

খ. সালাফী ধারার দল-উপদলসমূহ ১৭৫

বাংলাদেশে সালাফীদের দল-উপদলসমূহ ১৭৯

আধুনিক সালাফী ধারা ও গ্রুপগুলো ১৮৩

গ. বেরেলভী ধারার দল-উপদলসমূহ ১৮৪

ঘ. বাতিনী সূফী ধারার বিভিন্ন তরীকা-উপতরীকা ১৮৬

ঙ. শরীয়তনির্ভর সূফী ধারার বিভিন্ন তরীকা ও মারকায ১৯১

https://nagorikpathagar.org

চ. মিশ্র ধারার দল-উপদলসমূহ ১৯২
ছ. জিহাদী ধারার দল-উপদলসমূহ ১৯৪
আলিমগণের অনৈক্যের কারণসমূহ ১৯৫
১. যালিম শাসকবর্গের ষড়যন্ত্র ১৯৬
২. ভুল বোঝাবুঝি কিংবা দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ১৯৯
একটি সংশয়ের অপনোদন ২০০
৩. প্রবৃত্তির অনুসরণ ২০৮
৪. 'ফিকহুল খিলাফ ওয়াল ইজতিমা' সম্পর্কে অসচেতনতা ২০৯
আলিমদের অনৈক্যের পরিণাম ২০৯
ক. আলিমদের সামাজিক প্রভাব ও মর্যাদা খর্ব ২১০
খ. আলিমদের ব্যাপারে জঘন্য কুৎসা চর্চা ২১৩
গ. উম্মতের বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি নষ্ট ২১৩
ঘ. উম্মতের দ্বিধাগ্রস্ততা ও বিভ্রান্তি ২১৪
ঙ. শিরক-কুফর ও বিদআতের চর্চা বৃদ্ধি ২১৫
চ. সামাজিক অনাচার ও অপরাধ বৃদ্ধি ২১৬
ছ. দ্বীনী বিষয়গুলো নিয়ে পারস্পরিক হানাহানি ২১৭
জ. উম্মতের পতন ২১৭

তৃতীয় অধ্যায় :
ঐক্যের সম্ভাব্য প্রক্রিয়া ২১৯
ঐক্যের চেতনা বৃদ্ধি ২২০
ক. উলামা সমাবেশের আয়োজন করা ২২১
খ. আলিমদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা ২২১
গ. মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার করা ২২২
ঘ. আলিমদের নৈতিক মান বৃদ্ধি করা ২২৩

https://nagorikpathagar.org

চিন্তা-বিশ্বাসগত ঐক্য বা সমন্বয় ২২৪
ভারত উপমহাদেশে আলিমগণের ঐক্য প্রচেষ্টা ২২৬
বৃহত্তর ঐক্য গঠনের অন্তরায়সমূহ ও উত্তরণের পথ ২২৮
ক. নিজেদের একান্ত হক ও অন্যদের বাতিল মনে করা ২২৮
আকীদার প্রকারভেদ ও স্বরূপ ২৩১
এক. মৌলিক ও অকাট্য আকীদাসমূহ ২৩২
দুই. অপ্রধান ও যন্ননির্ভর আকীদাসমূহ ২৩২
খ. শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ২৩৩
গ. পারস্পরিক খিদমতের স্বীকৃতির অভাব ২৩৬
ঘ. নেতৃত্বের পদ ২৩৬
বৃহত্তর ঐক্যের ভিত্তি ২৩৮
ক. মৌলিক আকীদা ২৩৮
খ. মৌলিক আমল ২৩৯
গ. মৌলিক উৎস ২৩৯
আকীদাগত ভ্রান্তি কি বৃহত্তর ঐক্যের অন্তরায়? ২৪০
মাযহাবী ঐক্য বা সমন্বয় ২৪৫
আলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য বা সমন্বয় ২৪৭
বৃহত্তর ঐক্যের পথ সুগম করতে করণীয় ২৪৭
ক. পরস্পর মূল্যায়ন করা ২৪৭
খ. নিয়মিত মতবিনিময় করা ২৪৮
গ. পরমতসহিষ্ণুতা ২৪৯
ঘ. পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ির পথ পরিহার করা ২৫০
ঙ. পাবলিক প্লেসে বিরোধসংক্রান্ত আলোচনা বর্জন করা ২৫২
চ. শর্তারোপ না করা ২৫৩
ছ. যথাসম্ভব মতপার্থক্য ও তর্ক-বিবাদ এড়িয়ে চলা ২৫৩
জ. ইকামতে দ্বীনের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকা ২৫৮

https://nagorikpathagar.org

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায়, আল্লাহ তাআলা ইসলামকেই আমাদের জন্য একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং এজন্য আমাদের সকলকেই সব ধরনের ভেদাভেদ ভুলে সম্মিলিতভাবে ইসলামকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরতে হবে।

বলাই বাহুল্য, আমাদের সব মাযহাব বা দল-উপদলের মৌলিক বিশ্বাস, মৌলিক আমল ও মৌলিক উৎস এক ও অভিন্ন। যেমন : সকলেই এক আল্লাহ, এক রাসূল ও একই কিতাবে বিশ্বাসী। সকলেই সালাত, যাকাত, হজ ও সাওমসহ মৌলিক ইবাদাতের বিষয়েও একই বিশ্বাস পোষণ করেন। এতৎসত্ত্বেও একশ্রেণির আলিমদের মধ্যে প্রান্তিকতা এমনকি উগ্রতা লক্ষ করা যায়। আমরা মনে করি, এটা তাঁদের নিজেদের আসল চরিত্র নয়; বরং এটা বাইরে থেকে ইসলামের শত্রুদের আরোপিত প্রভাব। তাদের একটি প্রধান কৌশলই হলো, Divide and Rule (ভাগ করো আর শাসন করো)। এক্ষেত্রে অনেক আলিম নিজেদের অজান্তেই শুধু ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন। বিশেষ করে আমরা পাক-ভারত উপমহাদেশে আলিমদের মধ্যে যে বিরোধগুলো দেখি, এগুলোর বড়ো অংশই কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের পর থেকে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

ব্রিটিশরা আলিমদের পেছনে ব্যাপক ইনভেস্টমেন্ট করেছে। আর এর সাথে তারা বিভিন্ন মতবাদ ও দর্শন আলিমদের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে এবং সেগুলো প্রচার করিয়েছে। আর সেটাই আজ বিভিন্ন মতের জন্ম দিয়েছে। একইভাবে বিশ্বের অন্যান্য জায়গাতেও আমরা দেখি, আলিমদের পেছনে একটা বিশাল পরিকল্পনা কাজ করেছে। তো আলিমগণ যত তাড়াতাড়ি এই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন এবং যত বেশি করে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ ও সালাফে সালিহীনের পদাঙ্ককে সামনে রেখে অগ্রসর হতে পারবেন, ততই এই যে নানাবিধ সমস্যার কথা সামনে আসছে, এসবের সমাধান আমরা সেখানে খুঁজে পাব। আলিমদের মধ্যে একজন আরেকজনকে কাফির বলে ফাতওয়া দেওয়া, ইসলাম থেকে খারিজ করে দেওয়া, এমনকি অতি সামান্য বিষয় নিয়েও আমরা লক্ষ করছি যে, কাউকে কাফির, বাতিল ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এরূপ আচরণ মোটেও উচিত নয়। আমরা আরও লক্ষ করছি, আলিমদের মধ্যে একধরনের অসহিষ্ণুতা তৈরি হয়েছে। এটাও অনুচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আলিমগণ এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না, ততক্ষণ আমাদের সত্যিকার মুক্তি আসবে না এবং ইসলামকে আমরা সবার সামনে যথার্থ সৌন্দর্য সহকারে উপস্থাপন করতে পারব না।

https://nagorikpathagar.org

আমরা আলিমগণ আজ ঐক্যবদ্ধ নই বলেই আমাদের আলিমদের একেক গোষ্ঠী একেকভাবে নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, সমাজে ইসলাম ও উম্মাহর স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ ক্রমে বেড়েই চলছে। আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকারগুলো হারাচ্ছি, আমাদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে, সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে আমাদের গায়ে এঁটে দেওয়া হচ্ছে নানারূপ তকমা। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে দেশের সকল ধারা ও গোষ্ঠীর আলিমদের ঐক্য একান্তই জরুরি।

ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এত এত কঠোর নির্দেশনা থাকার পরও– সাধারণ মুসলিমদের কথা তো বাদই দিলাম, উম্মাহর যারা একান্ত অভিভাবক– আলিমগণ, তাঁদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাব সর্বাপেক্ষা বেশি পরিলক্ষিত হয়। দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, তাদের একটি অংশ বরাবরই উম্মতের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে উম্মতের বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। উম্মতের ওপর আপতিত বিপদ ও সংকটসমূহ তাঁদের মধ্যে কোনোরূপ ভাবাবেগ সৃষ্টি করে না। তাঁরা ছোটোখাটো মতভেদের মধ্যে লিপ্ত থাকেন এবং এগুলো নিরন্তর জিইয়ে রাখতে ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে প্রয়াস চালান। এসব নেতিবাচক কার্যক্রমের ঊর্ধ্বে উঠে উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে সম্মিলিত কোনো প্রচেষ্টায় যোগ দিতে তাঁদের কমই দেখা যায়। আলিমগণের মধ্যে কোথাও কোনো ঐক্যপ্রচেষ্টা শুরু হলেও এদের কারণে অনেক সময় তা ভন্ডুল হয়ে যায়। তাঁরা আজ কার্যত নানা ধারা, দল-উপদল ও গ্রুপে বিভক্ত। তাঁরা যে এক প্রাণ, এক দেহ– এই চেতনাবোধ বলতে গেলে তাঁরা প্রায় সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা যে পরস্পর একে অপরের ভাই– এরূপ কোনো অনুভূতি তাঁরা লালন করেন বলে পরিলক্ষিত হয় না বললেই চলে। বলতে গেলে, তাঁদের অধিকাংশই দীর্ঘ সময় ধরে পড়াশোনা করে যা অর্জন করেছেন, তা কেবল মাসায়িলসংক্রান্ত মতানৈক্য, পারস্পরিক বিভেদ ও সমালোচনায় ব্যয়িত হচ্ছে। এতে তাঁদের মধ্যে যে উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনশীল প্রতিভা ছিল, যাকে তাঁরা ইচ্ছে করলে উম্মাহর বিরাট কল্যাণে ব্যয় করতে পারতেন– তা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে তাঁরা ইসলামবিরোধী বিভিন্ন শক্তির সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছেন, প্রতিনিয়ত অন্যদের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছেন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আলিমদের পারস্পরিক মতানৈক্য, যার সূত্রপাত হয়েছিল আন্তরিক পরিবেশে জ্ঞানের উর্বর ভিত্তিভূমির ওপর ও গভীর বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে, কালক্রমে সেই মতানৈক্য একধরনের পেশিশক্তির

https://nagorikpathagar.org

প্রতিযোগিতার রূপ পরিগ্রহ করে এবং এর দুঃখজনক পরিণতি দাঁড়ায় পারস্পরিক কলহ-বিবাদ, অন্যায়-অবিচার, বিভাজন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। এমনকি সেই অন্যায় প্রতিযোগিতা শেষাবধি সৌজন্যের সকল সীমা অতিক্রম করে প্রভাব বিস্তারের এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, তাঁদের এক দলকে কেউ আক্রমণ করলে অন্য দল তাকিয়ে তামাশা দেখাকে শ্রেয় মনে করেন। অধিকন্তু, তাঁরা তাঁদের প্রতিপক্ষ দলকে দ্বীন ও মিল্লাতের প্রকাশ্য শত্রুদের যতটুকু না ক্ষতিকর মনে করেন, তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর মনে করেন। এ কারণে তাঁদের অনেককে দেখা যায়, তাঁরা দ্বীন ও মিল্লাতের প্রকাশ্য শত্রুদের মোকাবিলার চেয়ে প্রতিপক্ষ আলিমদের মোকাবিলাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। দূর ও কাছের ইতিহাস খোঁজ করলে এ ধরনের দুঃখজনক বহু ঘটনা সামনে চলে আসে।

এরূপ মতানৈক্য ও বিভেদ অত্যন্ত অযাচিত ও চরম নিন্দনীয়। এখানে দ্বীনের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা যতখানি না উদ্দেশ্য থাকে, তার চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে বিবদমান আলিমদের খেয়ালিপনা। বস্তুতপক্ষে তাঁদের অন্তরে নানা বিভ্রান্তি গেড়ে বসেছে। তাঁরা দ্বীনের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা ও উম্মাহর স্বার্থ রক্ষার ওপর নিজের ও নিজের পছন্দের দল-মতের স্বার্থ রক্ষা ও প্রাধান্য বিস্তারে বেশি আগ্রহী। এমনকি তাঁরা কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনাগুলো বেমালুম ভুলে গিয়ে এ অযাচিত মতানৈক্যের ব্যাধিতে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে গেছেন, ইসলামে মতানৈক্যের নিয়ম ও শিষ্টাচারও যেন তাঁরা ভুলে গেছেন। এ অবস্থায় ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন চলে এসেছে। এখন এসব প্রায়ই সাধারণ ও অর্বাচীন আলিমদের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে। ফলে সুস্থ চিন্তা-বুদ্ধি ও মননশীলতার ব্যাপক পদস্খলন ঘটেছে। কুরআন-হাদীসের বক্তব্যগুলোরও নানা উদ্দেশ্যে অপব্যবহার হতে চলেছে। এতে করে ইসলামের অপূর্ব মহিমা ও সৌন্দর্যগুলো ম্লান হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে। আমাদের পূর্বসূরি 'সালাফে সালিহীন' যে মতপার্থক্য করেছেন, তাতে এমন কোনো অনুষঙ্গ ছিল না যে, যেজন্য আমাদের আলিমগণকে বহুধাবিভক্ত হতে হয়েছে। তাঁরা মতপার্থক্য করেছেন ঠিকই; কিন্তু তাঁদের কথা, কাজ, কর্মসূচি ও মন– সবই ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাঁরা এমন সোনার মানুষ ছিলেন, যাঁরা অন্য কোনো মুমিনের জন্য কোনো খারাপ চিন্তা নিয়ে ঘুমাননি, অন্য কারও প্রতি কোনো বিদ্বেষ লালন করেননি। আর আমাদের বর্তমান আলিমদের অবস্থা কী? তাঁদের নিজেদের মধ্যে ও তাঁদের মনের মধ্যে মহাবিপর্যয় ঘটেছে! তাঁরা সদা চিন্তায় থাকেন,

https://nagorikpathagar.org

কখন ও কীভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও পাণ্ডিত্য জাহির করা যায় এবং কোন কোন কৌশলে নিজের পছন্দের দল ও মাসলাককে শক্তিশালী ও জয়ী করা যায় আর অন্য দল ও মাসলাককে পর্যুদস্ত করা যায় ইত্যাদি।

কাজেই গভীর ভাবনার বিষয় হলো, আলিমদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব ও অনৈক্যের পেছনে অন্তর্নিহিত মূল কারণগুলো কী কী, কেন তাঁরা পরস্পর এ কলহ-বিবাদে লিপ্ত হচ্ছেন এবং এ থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় আছে কি না, থাকলে কী কী? অবশ্যই উম্মাহর চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনেকেই অতীতেও বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন এবং বর্তমানেও অনেকে ভাবছেন। তাঁরা নানা সময় আলিমদের অনৈক্য ও বিভেদের বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করেছেন এবং পরিত্রাণের জন্য কিছু প্রস্তাবও তুলে ধরেছেন। উপরন্তু, তাঁরা তাঁদের সাধ্যমতো আলিমদের একটি প্ল্যাটফরমে জমায়েত করার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং এখনও করছেন; কিন্তু এ প্রচেষ্টাগুলো বারংবারই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, বরং অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো– দিনের পর দিন আলিমদের ভেদাভেদ ও বিভক্তি বেড়েই চলছে, তাঁরা নতুন নতুন দল-উপদল ও গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ছেন। কাজেই এ ব্যর্থতার কারণগুলো আমাদের গভীরভাবে অনুসন্ধান করা উচিত।

আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসও আমার পূর্বসূরিদের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতামাত্র। তবে বর্তমানে আলিমদের পারস্পরিক সম্পর্কের যে পতন ও অবক্ষয়, তাতে আমি মনে করছি না যে, আমার এ প্রয়াসও আলিমদের মধ্যকার বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণে খুব বেশি ভূমিকা রাখবে বা আশার আলো ছড়াবে। আমি গ্রন্থটিতে প্রথমত ঐক্যের মর্ম, গুরুত্ব; বিভক্তি ও দলাদলির অর্থ, মতপার্থক্য ও দলাদলির মধ্যকার পার্থক্য, ইসলামে দলাদলির উৎপত্তি ও এর প্রধান প্রধান কারণ, ইসলামে দল গঠনের হুকুম; ব্যাবহারিক বিষয়ে মতপার্থক্যের স্বরূপ, শিষ্টাচারসমূহ ও বাড়াবাড়ির কারণ; আলিমগণের ঐক্যের গুরুত্ব ও অনৈক্যের কারণ ও পরিণাম প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ। অতঃপর বাংলাদেশে আলিমদের বিভক্তির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরব এবং তাঁদের ঐক্যের পথে বাধাসমূহ ব্যাখ্যা করব, সর্বশেষ তাঁদের মধ্যে ঐক্য তৈরির একটি সম্ভাব্য প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

এতে আমাদের আলিমগণ তাঁদের মনের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদসংক্রান্ত যে দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন, তা সার্বিকভাবে পরিবর্তন করে বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। অধিকন্তু, এতে ঐক্য ও সংহতিসংক্রান্ত তাঁদের চিন্তা ও

https://nagorikpathagar.org

উপলব্ধির ক্ষতিকারক উপাদানসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে; সাথে সাথে এতৎসংক্রান্ত বিশুদ্ধ চিন্তাচেতনা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ, আলিমদের ঐক্যপ্রক্রিয়ায় বিদ্যমান দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো থেকে উত্তরণের জন্য কিছু পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আশা করছি, গ্রন্থটি তাঁদের বিবেকের দুয়ারে সামান্য হলেও নাড়া দেবে, তাঁদের ভাবনাজগতে কমবেশি আত্মোপলব্ধির সঞ্চার করবে এবং উম্মাহদরদি যেসব আলিম রয়েছেন, তাঁরা কিছুটা হলেও এ বই থেকে রসদ গ্রহণ করতে পারবেন। আমি দৃঢ় আশাবাদী যে, অচিরেই আলিমদের মনে ঐক্যের চেতনা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং অনৈক্য ও বিভেদের প্রভাব থেকে উত্তরণের ভাবনা উদয় হবে।

আমি আমার জ্ঞানগত দৈন্য ও সীমাবদ্ধতার কথা পুরোপুরিই স্বীকার করে নিচ্ছি। আমার কথার মধ্যে ভুলত্রুটি ও চিন্তার অপরিপক্বতা থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। আমি মনে করি, এতে উপস্থাপিত বক্তব্য ও তথ্যাবলি সঠিক হলে তা আল্লাহ তাআলার একান্ত অনুগ্রহ। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে কোথাও কোনো ভুলত্রুটি হলে তা হবে আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের কাছে কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। আপনাদের যেকোনো গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ আমি সাদরেই গ্রহণ করব। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেন এবং সংশোধনের সুযোগ দান করেন। বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি প্রচ্ছদ প্রকাশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি– جزاه الله تعالى عني أحسن الجزاء في الدارين ।

মহান আল্লাহ তাআলা আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন! এর অসীলায় আমাকে, আমার মাতা-পিতা, পরিবার-পরিজন, সন্তানসন্ততি, আসাতিযা কিরাম, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং এ গ্রন্থ লিখতে ও প্রকাশ করতে যাঁরা আমাকে নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ দান করুন, আমীন!

ড. আহমদ আলী
প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
০১.০১.২০২৩

https://nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

ইত্তিহাদ ও ইফতিরাক

ইত্তিহাদ (ঐক্য)-এর মর্ম ও নানা ধরন

'ইত্তিহাদ' শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ– একতা, ঐক্য, পরস্পর মিলিত হয়ে একক রূপ ধারণ করা, একীভূত হওয়া ইত্যাদি। প্রচলিত অর্থে ইত্তিহাদ বা ঐক্য বলতে বোঝানো হয়, কিছু লোক বা কয়েকটি দল অথবা গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র একইরূপ চেতনা ধারণ করা এবং কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে একই নিয়মের অধীনে পরিচালিত হওয়া। ধর্মীয়, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক নানা বিষয় ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে এবং ধর্ম, কর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কমন স্বার্থ ও কল্যাণে নানা ধরনের ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। যেমন :

ক. চিন্তা ও বিশ্বাসগত ঐক্য। একজাতীয় চিন্তা বা ধর্মবিশ্বাস পোষণকারীদের মধ্যে এ ঐক্য গড়ে ওঠে।

খ. আমলী (কার্যগত) ঐক্য। ধর্মের অনুশাসন ও বিধিবিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে একই ডিসিপ্লিনের অনুসারীদের মধ্যে এ ঐক্য গড়ে ওঠে। অনুরূপভাবে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে একই পেশা ও কর্মজীবীদের মধ্যেও এরূপ ঐক্য গড়ে ওঠে। ইসলামে ফিকহী বিষয়ে ঐক্য আমলী ঐক্যের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

গ. রাজনৈতিক ঐক্য। রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্যে বিভিন্ন চিন্তা ও বিশ্বাসের অনুসারী দল, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে এ ঐক্য গড়ে ওঠে।

ঘ. সামাজিক বা রাজনৈতিক ইস্যুভিত্তিক ঐক্য। সামাজিক বা রাজনৈতিক নির্দিষ্ট কতিপয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাময়িকভাবে ইস্যুভিত্তিক এ ঐক্য গড়ে ওঠে। এ ঐক্য যেমন বিভিন্ন চিন্তা ও বিশ্বাসের অনুসারীদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে, তেমনি বিভিন্ন পেশা ও কর্মজীবীদের মধ্যেও গড়ে উঠতে পারে।

https://nagorikpathagar.org

ঙ. শত্রুদের মোকাবিলায় ঐক্য। কমন শত্রুদের মোকাবিলায় ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকলের মধ্যে এ ঐক্য গড়ে ওঠে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও কমন শত্রুদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সামরিক চুক্তি ও ঐক্য গড়ে ওঠে।

আবার যাদের নিয়ে ঐক্য গড়ে ওঠে, তাদের কেন্দ্র করেও বিভিন্নরূপ ঐক্য প্রকাশ পেতে পারে। যেমন–

ক. দেশের সকল জনগণের ঐক্য। দেশের স্বাধীনতা ও ন্যায়সংগত স্বার্থ রক্ষা এবং জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ আদায়ের প্রয়োজনে ধর্ম-বর্ণ-দল-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল ধরনের জনগণ নিয়ে এ ঐক্য গড়ে উঠতে পারে।

খ. দেশের সকল মুসলিম জনগণের ঐক্য। দ্বীনের মৌলিক বিধিবিধানসমূহের হিফাজত এবং উম্মাহর ন্যায্য ও কমন অধিকারসমূহ রক্ষা ও আদায়ের প্রয়োজনেও দল-মত নির্বিশেষে সকল মুসলিম জনগণ নিয়ে এ ঐক্য গড়ে উঠতে পারে।

গ. ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্য। দেশ ও উম্মাহর রাজনৈতিক স্বার্থ ও বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনেও বিভিন্ন চিন্তা ও মতের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট কমন উদ্দেশ্য (যা সমানভাবে সকল চিন্তা-মতের অনুসারীদের জন্য প্রযোজ্য) অর্জনের লক্ষ্যে এ ঐক্য গড়ে উঠতে পারে।

ঘ. আলিমগণের ঐক্য। দ্বীনের মৌলিক বিধিবিধানসমূহের হিফাজত, উম্মাহর ন্যায্য ও কমন অধিকারসমূহ রক্ষা ও আদায় এবং ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষীদের চক্রান্তের মোকাবিলার প্রয়োজনেও কিছু সুনির্দিষ্ট কমন বিষয়ের ওপর দল-মত নির্বিশেষে সকল আলিমের মধ্যে এ ঐক্য গড়ে উঠতে পারে।

দল ও ঐক্য : পরিসরগত পার্থক্য

ইসলামে সাধারণত এমন দল গঠন করা এবং এমন কোনো কাজ করা জায়িয নয়– যাতে মুসলিমগণ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৩] পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নানাভাবে সকল মুসলিমকে একটিমাত্র জামাআতের অধীনে

৩. পরে আমরা ইসলামে দল গঠনের হুকুম নিয়ে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

https://nagorikpathagar.org

ঐক্যবদ্ধ থাকতে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, কালক্রমে মুসলিমগণ কুরআন ও হাদীসের এ নির্দেশগুলো ভুলে গিয়ে কিংবা উপেক্ষা করে বিভিন্ন চিন্তা-বিশ্বাস, কর্মনীতি ও গোষ্ঠীগত কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থকে কেন্দ্র করে নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। লক্ষ করা যায়, এ দল-উপদলগুলো সাধারণত একইরূপ চিন্তা-মতাবলম্বী, কর্মের অনুসারী ও লক্ষ্যাভিসারীদের নিয়ে গঠিত। আরবীতে এরূপ দল বোঝানোর জন্য সাধারণত ক্ষেত্রনির্বিশেষে ফিরকা, মাযহাব, মাসলাক, মাশরাব, মানহাজ ও তরীকা প্রভৃতি পরিভাষা প্রচলিত রয়েছে। আবার কেউ কেউ 'জামাআত' শব্দটিও দল অর্থে ব্যবহার করে থাকে। আবার উম্মতের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্য নিয়েও কিছু লোক একত্রিত হয়ে দল বা সংগঠন গড়ে তুলেছে। আরবীতে এরূপ দল বা সংগঠন বোঝানোর জন্য সাধারণত ক্ষেত্রনির্বিশেষে জমইয়্যাত ও মুনাযযামাহ প্রভৃতি পরিভাষা প্রচলিত রয়েছে। আবার কেউ কেউ 'জামাআত' শব্দটিও সংগঠন অর্থে ব্যবহার করে থাকে।

কাজেই বোঝা যায়, যেকোনো দল বা সংগঠন গঠিত হয় নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য অর্জন বা স্বার্থ চরিতার্থের জন্য নির্দিষ্ট চিন্তা-মতাবলম্বী, কর্মনীতির অনুসারী ও লক্ষ্যাভিসারীদের নিয়ে। এর পরিসর হয় অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ও ছোটো। পক্ষান্তরে ঐক্যের পরিসর হয় অনেক বেশি বিস্তৃত ও ব্যাপক। সাধারণত নানা চিন্তা-মত, কর্ম ও লক্ষ্যের অনুসারীদের মধ্যে তাদের সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য– এমন কতিপয় সুনির্দিষ্ট কমন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ঐক্য গঠিত হয়। আরবীতে সাধারণত ঐক্য বোঝানোর জন্য ইত্তিহাদ, ইত্তিফাক ও ওয়াহদাত প্রভৃতি পরিভাষা প্রচলিত রয়েছে।

উদ্দিষ্ট ইত্তিহাদ (ঐক্য)

বক্ষ্যমাণ আলোচনায় 'ইত্তিহাদ' (ঐক্য) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে উম্মতের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী তাদের নিজেদের দলীয় ও গোষ্ঠীগত চিন্তা ও মতের উর্ধ্বে উঠে উম্মাহর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট কতিপয় কমন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছা, ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি পরিহার করা।

উল্লেখ্য, এখানে আমাদের কথার উদ্দেশ্য এ নয় যে, সকলেই নিজ নিজ দল, মাযহাব ও চিন্তা পরিত্যাগ করে একটি জামাআতের অনুসরণ করবে। এটি যদিও নীতিগতভাবে কাম্য ও অতি প্রশংসনীয়, তবুও তা নানা কারণে বর্তমানে সম্ভব নয় কিংবা দুরূহ। এখানে 'ইত্তিহাদ' বলতে আমরা বোঝাচ্ছি, সকলেই–

https://nagorikpathagar.org

যে যেই দল বা গোষ্ঠীরই হোক না কেন, যে মাযহাবের অনুসারীই হোক না কেন– উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণের প্রয়োজনে দলীয় ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে, সম্মিলিত কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, বিপদাপদে প্রত্যেকেই অন্য দল ও মাযহাবের ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াবে, তাদের সাহায্য করবে। এটাই ইত্তিহাদ, এটাই ঐক্য।

এমনতিতেই মুসলিমদের প্রচুর দায়িত্ব ও কাজ। বর্তমানে তা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। দাওয়াত, তালীম, তারবিয়াহ, ইমামত, ইফতা, গবেষণা, রচনা, আবিষ্কার, ব্যাবসা-বাণিজ্য, সমাজের নেতৃত্ব, বিচার, শাসন প্রভৃতি বিচিত্র কর্মকাণ্ড। তবে সকলের পক্ষে একসাথে সকল কাজ করা প্রায় দুরূহ। তদুপরি প্রত্যেকের সামর্থ্যও এক নয়, যোগ্যতাও এক নয়। তাই কেউ হয়তো দাওয়াহর কাজ করছে, কেউ ইলম অর্জন করছে, কেউ শিক্ষকতা করছে, কেউ ইমামতি করছে, কেউ তাযকিয়াহ ও তারবিয়াহর কাজ করছে, কেউ গবেষণা করছে, কেউ ব্যাবসা করছে, কেউ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করছে।

মানুষের রুচি ও প্রবণতাও বিভিন্ন রকমের, তাই কাজও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। মানুষের দক্ষতাও একেক রকম; কেউ ভালো আলিম, কেউ ভালো গবেষক ও চিন্তক, কেউ ভালো শিক্ষক, কেউ ভালো বক্তা, কেউ ভালো সংগঠক ও ব্যবস্থাপক ...। কাজেই একজনের চিন্তা, রুচি ও কর্মের সাথে অন্য মুসলিম ভাইদের চিন্তা, রুচি ও কর্মের মিল নাও থাকতে পারে; কিন্তু উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণের প্রশ্নে সকলের মধ্যে একটা সুন্দর সমন্বয় থাকা প্রয়োজন, পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকা দরকার। এ সমন্বয় ও বোঝাপড়াকেই বলে ইত্তিহাদ, ঐক্য। হাদীসে সকল মুমিনকে একটিমাত্র দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

"তুমি মুমিনদের পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দেখতে পাবে যে, তারা একটি দেহসদৃশ। যদি দেহের কোনো এক অঙ্গে ব্যথার অনুযোগ থাকে, তাহলে গোটা দেহই আক্রান্ত হয়। তা ঘুমাতে পারে না এবং জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।"[৪]

---

৪. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আস-সহীহ*, (তাহকীক : ড. মুস্তাফা দেব আল-বুগা, বৈরূত : দারু ইবনি কাসীর, ১৯৮৭), অধ্যায় : আল-আদাব, হা. নং : ২৭/৫৬৬৫

https://nagorikpathagar.org

এ হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কোনো মুমিন– সে যেখানকার হোক এবং তার পরিচয় যা-ই হোক– কোনো বিপদ বা সমস্যায় আক্রান্ত হয়, তখন অন্য মুমিন ভাইদের এমন কষ্ট অনুভব করা উচিত, যেন তারা নিজেরাই আক্রান্ত হয়েছে। যদি তারা কেবল নিজেদের নিরাপত্তা ও সমস্যা নিয়েই চিন্তামগ্ন থাকে, অন্য কারও বিপদ বা সমস্যায় চিন্তিত না হয়, তবে তখন তাদের আর এক দেহের (তথা উম্মাহর) অংশ বলা যায় না। মুমিনরা নানা কারণে হয়তো বিভিন্ন দল, মাযহাব, কর্ম ও পেশায় বিভক্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের বড়ো পরিচয় হলো– তারা মুসলিম, তারা একে অপরের ভাই। এ সূত্রে তারা বৃহত্তর প্রয়োজনে একে অপরের পাশে এসে দাঁড়াবে এবং বিপদাপদে পরস্পর সাহায্য করবে– এটিই হলো ঐক্য ও ইত্তিহাদ।

ইসলামে ইত্তিহাদ বা ঐক্যের গুরুত্ব

ইত্তিহাদ বা ঐক্যের কথা কে না বলে? জ্ঞানী-গুণী থেকে শুরু করে অশিক্ষিত-মূর্খও ঐক্য কী এবং কেন তা প্রয়োজন– তা খুব ভালোভাবেই জানে। ঐক্যের ধারণাটা মানুষের সহজাত, আজন্ম বিষয়। ঐক্য ছাড়া সমাজ হতে পারে না। আর মানুষ সামাজিক জীব। তারা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজবদ্ধ জীবন গঠন করে। এর মাধ্যমে তারা অর্জন করে নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি এবং সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি। অপরদিকে এ ঐক্য নষ্ট হলেই তাদের মধ্যে দেখা দেয় চরম অশান্তি ও বিবাদ-বিসংবাদ এবং তাদের জীবনে নেমে আসে দুর্যোগের ঘোর অমানিশা ও অনৈক্যের ভয়াবহ পরিণাম। জাতি হিসেবে মুসলিমদের বেলায় কথাটি অকাট্যভাবে সত্য।

এ পৃথিবীতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে ঐক্যের সুমহান পয়গাম নিয়ে। এর মৌলিক আহ্বান হলো– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোনো [সত্যিকার] ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল)।' এই ঘোষণার মধ্যেই মুসলিমদের ঐক্যের বীজ নিহিত। এর মর্ম হলো– স্থান, কাল, পাত্র ও বর্ণ নির্বিশেষে ওই বাণী অনুসারী সকল মানুষ এক। অন্য কথায়, ওই বাণী গ্রহণের সাথে সাথে তার সকল অনুসারী অভিন্ন এক পরিচয় গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে আর কোনো ভেদাভেদ থাকে না। অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার আবর্তে গোটা মানবজাতি যখন জর্জরিত ও বিপর্যস্ত ছিল, তখন ইসলামই মুসলমানদের আদেশ দিয়েছে– "তোমরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ থাকো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

"তোমরা আল্লাহ তাআলার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু আর তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করে দিলেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তাআলা তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পারো।"[৫]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিমকে সর্বক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ থাকতে আদেশ করেছেন। এর একটি বড়ো কারণ হলো, কেবল আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিগত ইবাদাত-বন্দেগির মাধ্যমে ইসলামের সকল দাবি ও লক্ষ্য পূরণ হয় না। ইসলামের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো– পৃথিবীকে যাবতীয় ফিতনা ও জঞ্জাল থেকে মুক্ত করা।[৬] এ পথে সামগ্রিক ও সর্বাত্মক ঐক্যই হচ্ছে তাদের মূল হাতিয়ার, লক্ষ্যে পৌঁছার একান্ত মাধ্যম।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ আয়াতে 'হাবলুল্লাহ' বা আল্লাহর রজ্জু বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। একে রজ্জু বলার কারণ হলো– এ সূত্রের সাহায্যে যেমন মুমিনরা একদিকে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলে, তেমনি অপরদিকে তারা পরস্পর যুক্ত ও মিলিত হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল উম্মাহয় পরিণত হয়। এ পথে বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও অঞ্চল– কোনোটিই তাদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলতে পারে না।

---

৫. আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলে ইমরান) : ১০৩

৬. দ্র. আল-কুরআন, ২ : ১৯৩; ৮ : ৩৯

https://nagorikpathagar.org

মুসলিমমাত্রই এ কথা বিশ্বাস করে যে, ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিমূল হলো 'তাওহীদ'। এ কারণে ইসলামের জীবনাদর্শকে বলা হয় 'তাওহীদ' বা একত্ববাদভিত্তিক জীবনাদর্শ। 'তাওহীদ' শব্দটি আল্লাহ তাআলার অন্যতম সুন্দরতম নাম أحد (একক) থেকে গৃহীত। আল্লাহ তাআলা এক ও একক। এ বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির ওপর তাঁর একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত এবং সকলেই– ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়– তাঁর একান্ত বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে পরিচালিত হচ্ছে।[৭] কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই; নেই কোনো ফ্যাসাদ। কিন্তু মানুষ তাওহীদী ব্যবস্থাপনার বাইরে পা রাখার কিছু সাময়িক অবকাশ ও ইখতিয়ার পেয়ে থাকে।[৮] এ কারণে তারা নানা ধরনের দুর্গতিসহ ধ্বংসাত্মক মহাবিপদেরও সম্মুখীন হয়। মোটকথা, যেখানে প্রকৃত অর্থে তাওহীদী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে ফ্যাসাদ নেই, অরাজকতা নেই। আর যেখানে অনৈক্য হয়েছে, সেখানে তাওহীদের মূল সুর অনুপস্থিত আর এ অনৈক্যের পথ ধরেই ক্রমে শিরক ও কুফরীর সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে এবং অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিস্তার লাভ করে। এ ঐক্যহীনতার অশুভ পরিণতি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হরহামেশা দেখতে পাচ্ছি।

যখন পৃথিবীর তাবৎ মানুষ অরাজকতা-অশান্তি, সংঘাত-হানাহানিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তখনি মহানবী সা. তাওহীদের সুমহান বাণী নিয়ে এগিয়ে আসেন এবং বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا- "হে জনমণ্ডলী, তোমরা বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্যিকার) ইলাহ নেই, তবেই তোমরা সফল হবে।"[৯] তাঁর এ তাওহীদী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মুমিনগণ বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তা তথা সব সংকীর্ণতা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে পরস্পরের সাথে যুক্ত ও একত্রিত হয়। এভাবে তারা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি তথা মুসলিম উম্মাহয় পরিণত হয়।

---

৭. দ্র. আল-কুরআন, ৩ : ৮৩

৮. দ্র. আল-কুরআন, ২ : ৩৮; ৭৬ : ৩

৯. আহমাদ, ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, (তাহকীক : শুআইব আল-আরনাউত, বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৯), হা. নং : ১৬০২৩; ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ আত-তামীমী, *আস-সহীহ*, (তাহকীক : শুআইব আল-আরনাউত, বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩), হা. নং : ৬০৬২

https://nagorikpathagar.org

ইসলামের দৃষ্টিতে তাওহীদের সাথে ইত্তিহাদের সম্পর্ক এতই সুনিবিড় যে, আল্লাহ তাআলা সকলকেই তাওহীদের সূত্রে একতাবদ্ধ থাকার নির্দেশ দান করেছেন। হাদীসে মুমিনদের একটি প্রাণ, একটি দেহ, একটি প্রাসাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, اَلْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ-"মুমিনগণ একজন মানুষের মতোই, যখন তার মাথা আক্রান্ত হয়, তখন তার সারা শরীর আক্রান্ত হয় আর যখন তার চোখ আক্রান্ত হয়, তখন তার সারা শরীর আক্রান্ত হয়।"[১০]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا-"একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীরের মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে মজবুত করে।"[১১] এ হাদীসগুলো থেকে ইসলামে ইত্তিহাদের অপরিসীম গুরুত্বের কথা জানা যায়। বস্তুতপক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবনযাপন করা তাওহীদের অনিবার্য দাবি এবং মুমিন জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের ও সৌহার্দ্যের। যে কেউ তাওহীদের ঘোষণা দেবে, সেই সাথে সাথে অন্যান্য সকল মুমিনের ভাইয়ে পরিণত হবে, ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾-"মুমিনরা তো (একে অপরের) ভাই। কাজেই (তাদের মধ্যে যদি কোনো বিরোধ দেখা দেয়, তবে) তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও।"[১২]

ইসলাম মুসলিমদের যে জীবনাদর্শ দান করেছে, তাতে নানাভাবে ইত্তিহাদ তথা ঐক্যের চর্চা করানো হয়। ইসলামের যাবতীয় অনুশাসন ও শিক্ষা এভাবে প্রবর্তিত হয়েছে যে, যদি মুসলিমগণ তা যথাযথভাবে আদায় করে, তারা ঐক্যের জন্য প্রতিদিনই অধিক থেকে অধিকতর প্রয়োজন অনুভব করবে এবং এ সম্পর্কে অধিকতর সজাগ হয়ে উঠবে। আর এ সজাগতাই তাদের একটি একক ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী উম্মাহয় পরিণত করবে। একজন মুসলিম যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন তার মনমস্তিষ্ক ও অন্তরে যদি এ ভাবধারাটি সৃষ্টি হয় যে,

---

১০. মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, (বৈরুত : দারুল জীল, তা. বি.), হা. নং : ৬৭৫৩

১১. বুখারী, *আস-সহীহ*, হা. নং : ৪৬৮৭; মুসলিম, *আস-সহীহ*, হা. নং : ৬৭৫০

১২. আল-কুরআন, ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত) : ১০

https://nagorikpathagar.org

এ মুহূর্তে পৃথিবীর প্রতিটি এলাকায় কোটি কোটি মুসলিম তারই মতো একই কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করছে, আর সে তাদেরই একজন; সে যখন অভিন্ন চিন্তা ও লক্ষ্যের অনুগামী সালাতরত মুসলিমদের মধ্যে নিজের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে চিন্তা করে, তখন সে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে যে, ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে গোটা বিশ্বজুড়ে ইসলামী সমাজরূপ যে সুবৃহৎ প্রাসাদ গড়ে উঠেছে, তার অসংখ্য ইষ্টকের মধ্যে সেও একটি ইষ্টক মাত্র। এভাবে সকল ইবাদাতেই আছে তাওহীদের নিরন্তর মশক এবং সকল ইজতিমায়ী কাজে আছে ঐক্যের অনুশীলন। উপরন্তু, ইসলামের পঞ্চম রুকন হজ এমন একটি ইবাদাত, যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাওহীদ ও ইত্তিহাদের জীবন্ত নিদর্শন। এজন্য এখান থেকে গুরুত্বের সাথে তাওহীদ ও ইত্তিহাদের সবক নেওয়া উচিত। সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদভী রহ.-এর ভাষায়–

> "এ কথা সত্য যে, ঔপনিবেশিক শাসন ও বৃহৎ শক্তিবর্গের কূটনৈতিক শঠতার ফলে ইসলামী উম্মাহ আজ বিভিন্ন বর্ণের জাতীয়তাবাদের অভিশাপের শিকার হয়ে পড়েছে। হজ হচ্ছে সেই খণ্ডিত, কৃত্রিম ও অভিশপ্ত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনীন মহান ইসলামী জাতীয়তাবাদের বিজয়-উৎসব। এখানে এসে একাকার হয়ে যায় বিশ্বের শত কোটি তাওহীদবাদী মুসলমান। মুছে যায় ভাষা ও বর্ণের সব ব্যবধান, ভেঙে চুরমার হয়ে যায় মানুষের হাতে গড়া ভৌগোলিক সীমারেখার বিভেদ-প্রাচীর। স্ব স্ব জাতীয় পোশাক ও পরিচয়– এতদিন যা ছিল তাদের একান্ত গর্বের, একান্ত নিজস্ব– তা সব ত্যাগ করে তারা অঙ্গে ধারণ করে ইহরাম নামের শ্বেতশুভ্র একক ইসলামী জাতীয় পোশাক। চোখের পানিতে, আবেগের উচ্ছ্বাসে ও হৃদয়ের ভাষায় যে কোনো তফাত নেই, তার বাস্তব প্রমাণ মেলে তালবিয়ায়। একই ভাষায়, একই সুরে, একই তালে লক্ষ লক্ষ হাজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হজ-সংগীতের মধুর সুরমূর্ছনায়–
>
> لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.
>
> 'হে আল্লাহ, আমি আপনার সমীপে উপস্থিত। আমি আপনার সমীপে হাযির, আপনার কোনো শরীক নেই। আমি আপনার সমীপে উপস্থিত। আপনারই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত। আপনারই বাদশাহী। আপনার কোনো শরীক নেই।'

https://nagorikpathagar.org

এখানে আমীর-গরীব ও বান্দা-মনিবের কোনো তফাত নেই। নেই ছোটো-বড়োর কোনো ভেদাভেদ, নেই শাসিতের হীনম্মন্যতা ও শাসকের প্রভুত্বসুলভ অহংকার। ইহরামের শ্বেতশুভ্র পোশাকে ও লক্ষ কণ্ঠের ভাবগম্ভীর 'লাব্বাইকা' ধ্বনিতে সবকিছু ছাপিয়ে ভেসে ওঠে সর্বজনীন ইসলামী বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। হজের প্রতিটি বিধানে, প্রতিটি গতিবিধিতে সেই একই দৃশ্য জুড়িয়ে দেবে আপনার হৃদয়-প্রাণ। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে ভাষা, বর্ণ ও রক্তকৌলীন্যের যাবতীয় মিথ্যা অভিমান। এখানে এসে কাঁধে কাঁধ মেলায় দূর-নিকটের সাদা-কালো মুসলমান। বুকে বুক মেলায় আরব-আজমের আদমসন্তান। একসাথে তারা দৌড়াচ্ছে সাফা-মারওয়ার মাঝে, চলেছে মিনা-আরাফার পথে। অশ্রুসিক্ত চোখে, কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে দুহাত তুলে মুনাজাত করছে জাবালে রহমতের পাদদেশে। মুযদালিফার খোলা আকাশের নিচে, নরম বালুর বিছানায় একসাথে কাটছে সবার রাত। বিশ্ব-মানবতার মিলন্ত ঐক্যের সে কী অপূর্ব প্রকাশ!"

ইসলামের ঐক্যের এই চিরন্তন শিক্ষাকে মজবুতভাবে ধারণ করেই মুসলমানরা দুনিয়ার বুকে অসাধ্য সাধন করেছে। তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুনিয়ার বুকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক নবযুগের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছে। কিন্তু যখনই মুসলমানরা ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনৈক্য ও দলাদলির পথে পা বাড়িয়েছে; গোষ্ঠীগত, জাতিগত, মতাদর্শ ও মত-পথের বিভাজন-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে ইসলামের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই তারা সব গৌরব হারিয়ে একটি হতভাগা হতোদ্যম জাতিতে পরিণত হয়েছে। তারা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়েছে।

আজ দুনিয়ায় মুসলমানের সংখ্যা দুশো কোটির বেশি হওয়া সত্ত্বেও শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তারা অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। একমাত্র অনৈক্যের কারণেই মুসলমানদের ওপর দুর্ভাগ্যের এই অমানিশা চেপে বসেছে। এ কারণে পবিত্র কুরআনে বারংবার নানাভাবে ঐক্যের জন্য তাগাদা দেওয়া হয়েছে এবং বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ ও অনৈক্যকে বিপজ্জনক এবং মুশরিকদের ও জাহিলী যুগের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করে তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন–

https://nagorikpathagar.org

১. উম্মাহর একত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٢) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (٩٣)﴾

"তোমাদের এ উম্মাহ নিঃসন্দেহে এক অভিন্ন উম্মাহ। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব, তোমরা আমারই দাসত্ব-আনুগত্য করো। আর তারা (অনৈক্যের নায়করা) তাদের বিষয়কে (দ্বীনকে) নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো ও বিভক্ত করে নিয়েছে। কিন্তু (তাদের এ মারাত্মক কাজ করার আগে মনে রাখা উচিত ছিল যে,) প্রত্যেককেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।"[১৩]

২. অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (٥٢) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٣) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (٥٤)﴾

"তোমাদের এই যে উম্মাহ, নিঃসন্দেহে (দ্বীনের বন্ধনে) এক অভিন্ন উম্মাহ। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব, তোমরা আমাকেই ভয় করো। কিন্তু তারা (অনৈক্যের নায়করা) তাদের বিষয়কে (দ্বীনকে) নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো ও বিভক্ত করে নিয়েছে। আর প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে, তা নিয়েই তারা পরিতুষ্ট। অতএব, (হে নবী,) আপনি তাদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য (নিজ নিজ) বিভ্রান্তিতে (পড়ে থাকার জন্য) ছেড়ে দিন।"[১৪]

এ দুই জায়গাতেই বলা হয়েছে, শুরুতে সকল মানুষের দ্বীন ছিল একটি, উম্মত ছিল একটিই। তারা সকলের পরিচয় ছিল একটিই, আমলও ছিল অভিন্ন। তারা সকলেই আল্লাহ তাআলার একান্ত বান্দার পরিচয় বহন করত এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করত। পরে তারা দ্বীনের মধ্যে নানা পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করত কুফর ও শিরক অবলম্বন করে দ্বীনকে টুকরো টুকরো করেছে এবং পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। এ দুই জায়গাতেই দ্বীনকে বিভক্তকারীদের নিন্দা করা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে।

---

১৩. আল-কুরআন, ২১ (সূরা আল-আম্বিয়া) : ৯২-৯৩

১৪. আল-কুরআন, ২৩ (সূরা আল-মুমিনূন) : ৫২-৪

https://nagorikpathagar.org

৩. আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

"যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই আপনার ওপর বর্তায় না। তাদের (ফয়সালার) ব্যাপারটা আল্লাহ তাআলার কাছেই। (যেদিন তারা তাঁর কাছে ফিরে যাবে,) তখন তিনি তাদের বিস্তারিত বলবেন, তারা কে কী করেছিল।"[১৫]

এ আয়াতে বলা হয়েছে– যারা দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তারাই বড়োই অপরাধী। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের কুকীর্তি সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন এবং শাস্তি দেবেন।

৪. আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলেন–

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আসার পরেও মতবিরোধ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর আযাব।"[১৬]

এ আয়াতটিতে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, স্পষ্ট হিদায়াত পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ মতভেদ করে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এতে পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, তোমরা তাদের মতো হয়ে যেয়ো না।

৫. অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٣٢)﴾

---

১৫. আল-কুরআন, ৬ (সূরা আল-আনআম) : ১৫৯

১৬. আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলে ইমরান) : ১০৫

https://nagorikpathagar.org

"তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন করেছে এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে। (আসলে) প্রতিটি দলই তাদের নিজেদের কাছে যা কিছু আছে, তা নিয়েই আনন্দে নিমগ্ন হয়ে রয়েছে।"[১৭]

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, বস্তুত দ্বীনের মধ্যে বিভাজন এবং নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করে বহুধাবিভক্ত হয়ে যাওয়া মুশরিকদেরই বৈশিষ্ট্য– যা তাওহীদের মতাদর্শে বিশ্বাসীদের জন্য মোটেও শোভা পায় না। একাধিক 'ইলাহ'-এর পূজা ও অনুসরণ থেকে বহু দলে বিভক্তি ও দলাদলি অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ তাআলাকে ছেড়ে অন্যের পূজা ও অনুসরণ বস্তুত নাফসের পূজা ও অনুসরণেরই বহিঃপ্রকাশ। নাফসকে 'ইলাহ' হিসেবে গ্রহণ করা থেকেই এক আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাঁর মোকাবিলায় দৃশ্য-অদৃশ্য ইলাহ রচনার কাজ সংঘটিত হয়।[১৮] কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র ইলাহরূপে মেনে নিয়েছে এবং স্বীয় নাফসকে কেবল আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে নিঃশর্তভাবে সোপর্দ করে দিয়েছে, সে কখনও মুশরিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিভেদ ও অনৈক্যের নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না।

৬. আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

---

১৭. আল-কুরআন, ৩০ (সূরা আর-রূম) : ৩১-৩২

১৮. নাফসের আনুগত্য প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (৪৩) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (৪৪)﴾

"(হে নবী,) আপনি কি সে ব্যক্তির (অবস্থা) দেখেননি, যে তার (নাফসের) কামনা-বাসনাকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আপনি কি তার (মতো প্রবৃত্তিপূজারি ব্যক্তির) যিম্মাদার হতে পারেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ লোক (আপনার কথা) শোনে কিংবা (এর মর্ম) বোঝে? আসলে এরা হচ্ছে পশুর মতো; বরং (ক্ষেত্রবিশেষে) তারা আরও বেশি বিভ্রান্ত।" (আল-কুরআন, ২৫ [সূরা আল-ফুরকান] : ৪৩-৪৪)

https://nagorikpathagar.org

"যে ব্যক্তি তার কাছে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে (বে-ঈমান লোকদের) নিয়মনীতির অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ধাবিত করব, যেদিকে সে ধাবিত হয়েছে। (এর শাস্তি হিসেবে) তাকে আমি জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দেবো। আর (জাহান্নাম তো) খুবই নিকৃষ্ট আবাসস্থল!"[১৯]

এ আয়াতে সকল মুমিনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 'সাবীলুল মুমিনীন' তথা মুমিনদের অনুসৃত পথ অনুসরণ করতে, এর যেকোনোরূপ বিরোধিতা পরিহার করতে এবং এমন সব কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে– যা উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করে। উল্লেখ্য, সাবীলুল মুমিনীন থেকে বিচ্যুত হওয়া কুফরের নামান্তর এবং পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত হওয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ।

৭. আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَاصْبِرُوا، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকো। নতুবা তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।"[২০]

এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে, তোমরা পরস্পর বিভেদে লিপ্ত হয়ো না। কারণ, বিভেদ দুর্বলতার জন্ম দেয়। আর বিরোধীরা যখন মুসলিমদের বিভেদ সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন তাদের অন্তরে মুমিনদের প্রভাব খতম হয়ে যাবে।

৮. রাসূলুল্লাহ সা.-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

---

১৯. আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ১১৫

২০. আল-কুরআন, ৮ (সূরা আল-আনফাল) : ৪৬

https://nagorikpathagar.org

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং এতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।" [২১]

এ আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর উম্মতকে ঐক্যবদ্ধভাবে ইকামতে দ্বীনের কাজে ব্যাপৃত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, যুগে যুগে প্রেরিত অন্য নবী-রাসূলগণের প্রতিও এ নির্দেশ দান করা হয়েছিল।

৯. সাইয়িদুনা ঈসা আ.-এর অনুসারীদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾

"অতঃপর তাদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন দল নানা মতানৈক্য সৃষ্টি করল। সুতরাং জালিমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ।"[২২]

১০. বনী ইসরাঈলদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

"আরও দিয়েছিলাম তাদের (অর্থাৎ, বনী ইসরাঈল)কে দ্বীনের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। অতঃপর তারা জ্ঞান লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত, আপনার রব কিয়ামতের দিন তার ফয়সালা করে দেবেন।"[২৩]

এ দুই জায়গাতে বলা হয়েছে, অতীতে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের যদিও ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বীনের ওপর অটল থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা একে অপরের সাথে বিভিন্ন মতপার্থক্যে লিপ্ত হয় এবং নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

---

২১. আল-কুরআন, ৪২ (সূরা আশ-শূরা) : ১২

২২. আল-কুরআন, ৪৩ (সূরা আয-যুখরুফ) : ৬৫

২৩. আল-কুরআন, ৪৫ (সূরা আল-জাছিয়াহ) : ১৭

https://nagorikpathagar.org

এ কারণে তারা কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। দ্বিতীয় আয়াতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা যে পরস্পর মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়েছিল– এর কারণ এটা নয় যে, তাদের ইলম ছিল না কিংবা তাদের বিদ্যাবুদ্ধি কম দেওয়া হয়েছিল। বরং এর একমাত্র কারণ হলো– তারা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও জিদের বশবর্তী হয়ে এই ইলম ও বিদ্যাবুদ্ধিকেই নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য ও বিভেদের কাজে ব্যয় করেছে। বস্তুতপক্ষে দ্বীনের মধ্যে মতপার্থক্য ও বিভেদ সৃষ্টি একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি। এতে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। এটি তাদের ধ্বংস করে ছেড়েছে এবং তাদের দ্বীনকেও বিনষ্ট করে ফেলেছে। কেবল অবশিষ্ট রয়েছে তাদের ইতিহাস– যা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে আমরা তাদের থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে আমাদের কাজে লাগাতে পারি।

এটা সত্য যে, এই দ্বীন ও মুসলিম উম্মাহর চিরতরে ধ্বংস হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কারণ, এ দ্বীন ও উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। কাজেই এই যে ব্যাধি, তা উম্মাহর দেহে স্থায়ীভাবে লেগে থাকার জন্য নয়। যদি উম্মত এ ব্যাধি নিয়েই সামনে চলতে থাকে, তাহলে ক্ষণে ক্ষণে তাদের বিপর্যয় হবে, অধঃপতন হবে। আর এ ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারলেই তারা সমহিমায় জীবনযাপন করতে পারবে, জাতি হিসেবে শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

বিভিন্ন হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সা. উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং অনৈক্য ও বিভেদ থেকে দূরে জোর নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন–

১. সাইয়িদুনা মুআয ইবনু জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ .

"শয়তান হলো মানুষের জন্য নেকড়েস্বরূপ, যেমন মেষপালের নেকড়ে। যে ছাগল পাল ছেড়ে দূরে চলে যায় কিংবা এক প্রান্তে অবস্থান করে, নেকড়ে তার ওপর হানা দেয়। কাজেই তোমরা বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি থেকে বিরত থাকো। আর জামাআত (সম্মিলিত জনগোষ্ঠী) ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে অবস্থান করো।"[২৪]

২৪. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস মুআয ইবনু জাবাল, হা. নং : ২২০২৯, ২২১০৭। হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহি।

https://nagorikpathagar.org

২. সাইয়িদুনা হারিছ আল-আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

... أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَبِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ..

"...আমি তোমাদের এমন পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলো আল্লাহ তাআলাও আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো হলো– জামাআত, শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত ও আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ। কাজেই যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে প্রকারান্তরে তার গলদেশ থেকে ইসলামের রজ্জুকে খুলে ফেলল– যে পর্যন্ত না সে জামাআতে ফিরে আসে। ..."[২৫]

৩. সাইয়িদুনা উমার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

..عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ. مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ..

"তোমরা জামাআতকে আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, শয়তান একজনের সাথে থাকে; দুজন থেকে অনেক দূরে থাকে। কাজেই যে ব্যক্তি জান্নাতের সুখ-সম্ভোগ লাভ করতে চায়, সে যেন জামাআতকে আঁকড়ে ধরে।"[২৬]

৪. সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شُذَّ إِلَى النَّارِ.

"আল্লাহর হাত (সহযোগিতা) থাকে জামাআতের সাথে। আর যে ব্যক্তি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[২৭]

---

২৫. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস হারিছ আল-আশআরী, হা. নং : ১৭৮০০। বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শুআইব আল-আরনাউত (রহ.) বলেন, হাদীসটি সহীহ।

২৬. তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ফিতান, পরিচ্ছেদ : লুযূমুল জামাআত, হা. নং : ২১৬৫; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, মুসনাদ উমার রা., হা. নং : ১৭৭। হাদীসটি সহীহ।

২৭. তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মাদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ফিতান, (বৈরুত : দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরবী, তা.বি.), হা. নং : ২১৬৭। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, হাদীসটি গরীব।

https://nagorikpathagar.org

৫. সাইয়িদুনা নূমান ইবনু বাশীর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ.

"জামাআত হলো রহমত আর বিচ্ছিন্নতা হলো আযাব।"[২৮]

৬. সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। তোমাদের জন্য তিনি যে তিনটি কাজ পছন্দ করেন, তা হলো– তোমরা তাঁর ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কিছু শরীক করবে না এবং তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ করবে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। আর যে তিনটি বিষয় তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন, তা হলো– নিরর্থক কথাবার্তা বলা, অধিক প্রশ্ন করা এবং সম্পদ বিনষ্ট করা।"[২৯]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং জামাআতকে আঁকড়ে ধরার গুরুত্ব জানা যায়। মোটকথা, মুসলিম উম্মাহর শক্তির প্রাণই হলো ঐক্য। মুসলিমগণ কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে ঐক্যবদ্ধ হলে দুর্দমনীয় শক্তির অধিকারী হবে এবং পতনোন্মুখ জাতি ফিরে পাবে নতুন প্রাণ। অন্যদিকে যদি তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার হবে।

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিমগণ ছিলেন একটি অভিন্ন শক্তিশালী উম্মাহ। কুরআন ও হাদীসের বিধান অনুযায়ী ঠিক যেভাবে তাঁদের একটি অভিন্ন উম্মাহয় পরিণত হওয়া উচিত ছিল, তাঁরা তা-ই হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাদা-কালোতে প্রভেদ ছিল না, আরব-অনারবদের মধ্যে পার্থক্য ছিল না আর ছিল না উঁচু-নিচুতে বিভেদ। এ মহান ঐক্যের সুবাদে তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যেই দুনিয়ার বুকে অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তাঁরা সভ্যতা-সংস্কৃতির

---

২৮. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং : ১৮৪৪৯, ১৮৪৫০, ১৯৩৫১

২৯. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আকদিয়াহ, হা. নং : ৫/৪৫৭৮

https://nagorikpathagar.org

বেলায় এক উৎকৃষ্ট নবযুগের সূচনা করেছিলেন। তারা তৎকালীন দুটি মহাশক্তিকে পর্যুদস্ত ও পরাভূত করে এক অজেয় শক্তিরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন সময়ে ঐক্য ও মহামিলনের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা সত্যিই মহাবিস্ময়কর। অমুসলিম পণ্ডিতরা পর্যন্ত তাঁদের এ ঐক্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারেনি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এককালের জাঁদরেল সভানেত্রী মিসেস সরোজিনি নাইডু বলেন–

> "I have been struck over and over again by this indivisible unity of Islam that makes a man inactively a brother, when you meet an Egyptian, an Algerian, an Indian and Turk in London, what matters that Egypt was the motherland of one and India motherland of other."

ইফতিরাক (বিভক্তি ও দলাদলি)-এর অর্থ

'ইফতিরাক' (الافتراق) অর্থ– মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া, বিভক্ত হওয়া। এ শব্দ থেকে 'ফিরকা' শব্দটি গৃহীত। এর অর্থ বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী, দল, গ্রুপ। 'ইফতিরাক'-এর বিপরীত শব্দ হলো 'ইজতিমা'। এর অর্থ– সমবেত হওয়া, মিলিত হওয়া। এখানে 'ইফতিরাক' বলতে বোঝানো হয়েছে– উম্মাহর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া; রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাত ও সাহাবা কিরামের আদর্শের ওপর বিদ্যমান জামাআত থেকে বের হয়ে নতুন দল রচনা করা। কেউ কেউ একে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করেছেন–

> الافتراق هو الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين القطعية، سواءً كانت الأصول الاعتقادية، أو الأصول العملية المتعلقة بالقطعيات، أو المتعلقة بمصالح الأمة العظمى، أو بهما معًا .

> "ইফতিরাক হলো, দ্বীনের অকাট্য মৌলিক কোনো একটি বিষয়ে কিংবা একাধিক বিষয়ে সুন্নাত ও জামাআত থেকে বের হয়ে যাওয়া। চাই এ মৌলিক বিষয়গুলো বিশ্বাসসংক্রান্ত হোক অথবা অকাট্যভাবে সুপ্রমাণিত ব্যাবহারিক বিষয় কিংবা উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাবহারিক বিষয় হোক অথবা একই সাথে অকাট্য ও উম্মতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় হোক।"[৩০]

---

৩০. নাসির আল-আকল, *আল-ইফতিরাক : মাফহুমুহু ওয়া আসবাবুহু*, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), পৃ. ২

https://nagorikpathagar.org

এ সংজ্ঞা থেকে জানা যায়, আকীদাসংক্রান্ত কোনো মৌলিক বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরোধিতা করা যেমন ইফতিরাকরূপে গণ্য, তেমনি মুসলিমদের ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা এবং উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে সম্মিলিত মুসলিম জনগোষ্ঠী (জামাআত) ও তাদের শাসকের বিরোধিতা করাও ইফতিরাকরূপে গণ্য হবে। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ.

"যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং (এ অবস্থায়) জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে লড়াই করে, অন্ধ গোষ্ঠীপ্রীতি বা দলপ্রীতির জন্য ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোষ্ঠী বা দলীয় গোঁড়ামির দিকে আহ্বান জানায় অথবা গোষ্ঠী বা দলের সাহায্যার্থে জুলুমের পক্ষেই থাকে, হক-ইনসাফের তোয়াক্কা না করে যুদ্ধ করে আর তাতে নিহত হয়, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ভালো-মন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে, মুমিনকেও রেহাই দেয় না এবং যার সাথে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করে না, সে আমার (কেউ) নয়; আমিও তার (কেউ) নই।"[৩১]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, অন্ধ গোষ্ঠীপ্রীতি বা দলপ্রীতির জন্য অথবা গোষ্ঠী ও দলের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত মুসলিম জনগোষ্ঠী (জামাআত) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ হলো 'ইফতিরাক'।

উল্লেখ্য, প্রত্যেক কুফরে আকবর (বড়ো কুফর)-ই ইফতিরাকরূপে গণ্য হয়। তবে প্রত্যেক ইফতিরাক কুফর নয়। অর্থাৎ, এমন যেকোনো বিশ্বাস বা কাজ–

৩১. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ, হা. নং : ১৩/৪৮৯২

https://nagorikpathagar.org

যা ইসলামের কোনো অকাট্য মৌলিক বিশ্বাসের পরিপন্থি এবং যা কুফরের নামান্তর, তা নিঃসন্দেহে ইফতিরাক। তবে প্রত্যেক ইফতিরাফ কুফর নয় এ অর্থে যে, কখনও কোনো দল, গ্রুপ বা জনগোষ্ঠী থেকে ইফতিরাক (বিচ্ছিন্নতা) পাওয়া যায়, তবে কখনও সেই ইফতিরাকের জন্য তাদের কুফরের অভিধায় অভিহিত করা যাবে না; এমনকি যদিও সে ক্ষেত্রবিশেষে সমগ্র মুসলিম জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। যেমন– খারিজীদের ইফতিরাক। সাইয়িদুনা আলী রা.-এর খিলাফতকালে তারা উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মুসলিম জামাআত ত্যাগ করে, উম্মতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং ইমামুল মুসলিমীনের আনুগত্য ত্যাগ করে। এতৎসত্ত্বেও সাহাবীগণ তাদের 'কাফির' বলে আখ্যায়িত করেননি। একবার সাইয়িদুনা আলী রা.-কে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি তাদের কাফিররূপে ফায়সালা দেননি। অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. ও অন্য সাহাবীগণও এরূপ মত পোষণ করেন। উপরন্তু, আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা.-সহ অনেক সাহাবীই নাজদাহ আল-হারূরীর পেছনে সালাত আদায় করতেন এবং তাঁরা খারিজীদের সাথে মুসলমানদের মতোই পরস্পর কথাবার্তা বলতেন, আলাপ করতেন।[৩২]

বর্ণিত আছে, সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. প্রসিদ্ধ খারিজী নেতা নাজদাহ আল-হারূরীর নানা প্রশ্নের জবাব দেন;[৩৩] অধিকন্তু তিনি এবং অপর খারিজী নেতা নাফি ইবনুল আযরাক দুজনই দুজন মুসলিমের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মতোই একে অপরের সাথে আলাপ করেন এবং দুজনই কুরআনের মাধ্যমে একে অপরের কথা খণ্ডন করেন।[৩৪]

ইফতিরাক-সংক্রান্ত প্রচলিত কতিপয় ভুল

এটা ঠিক যে, উম্মতের মধ্যে নানা ধরনের ইফতিরাক দেখা দেবে এবং তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে। বিভিন্ন হাদীসে বিষয়টি স্পষ্টভাবে এসেছে। যেমন–

---

৩২. আসিমী, মুহাম্মদ ইবনু আবদির রাহমান, *আলু রাসূলিল্লাহ সা. ওয়া আউলিয়াহু*, (http://www.ahlalhdeeth.com), পৃ. ১৫৪

৩৩. মুসলিম, *আস-সহীহ*, হা. নং : ৪৭৮৭-৪৭৯২

৩৪. তাবারানী, আবুল কাসিম সুলাইমান, *আল-মুজামুল কাবীর*, আহাদীসু আবদিল্লাহ ইবনি আব্বাস রা., (তাহকীক : হামদী ইবনু আবদিল মাজীদ, মসুলঃ মাকতাবাতুল উলূম ও হিকাম, ১৯৮৩), হা. নং : ১০৫৯৭

https://nagorikpathagar.org

সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

تَفَرَّقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.

"ইয়াহুদীরা একাত্তর বা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয় এবং খ্রিষ্টানরাও অনুরূপ দলে বিভক্ত হয়। আর আমার উম্মাত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে।"[৩৫]

তবে ইফতিরাক ও বিভক্তিসংক্রান্ত কিছু ভুল ধারণা আমাদের অনেকের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি ভুল হলো :

ক. অনেকেই এ কথা মনে করেন যে, উম্মতের মধ্যে কোনো ইফতিরাক বা বিভক্তিই নেই। এটি একটি চরম ভ্রান্ত ধারণা। এরূপ কথা বলে হয়তো তাঁরা সমাজে নিজেদের অতি উদারভাবাপন্ন লোক হিসেবে প্রমাণ করতে চান। এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে তাঁদের কেউ কেউ ইফতিরাক-সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসগুলোও অস্বীকার করতে প্রবৃত্ত হন, কেউ আবার এসব হাদীসের অযাচিত ব্যাখ্যা করেন; আর কেউ হাদীসে উল্লেখিত ভ্রান্ত ফিরকা দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে ইসলাম থেকে বহিভূর্ত দলগুলোকে বোঝাতে চান, কেউ আবার অমুসলিম দলগুলোকেও বোঝাতে চান।

আমরা মনে করি, এরূপ ব্যাখ্যা ও দাবি অযাচিত তো বটেই; বরং তা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসসমূহের বক্তব্যের পরিপন্থি। উপরন্তু, কুরআন ও হাদীসের বহু বক্তব্য দ্বারা এ কথা অকাট্য ও সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, উম্মত নানারূপ বিভক্তির সম্মুখীন হবে। কার্যতও উম্মতের মধ্যে নানারূপ বিভক্তি রয়েছে এবং এটিই বাস্তব। উল্লেখ্য, 'ইফতিরাক' আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ পরীক্ষা। প্রত্যেক ব্যক্তিই হকের সন্ধান পান না, আর অনেকেই পেলেও হকের ওপর অটল-অবিচল থাকতে সমর্থ হন না। নিয়তিই হলো– এ দুনিয়াতে হকের ওপর খুব কম লোকই অটল থাকে। এ কারণে 'উম্মত বহু দলে বিভক্ত হবে'– কথাটি স্বীকার করা উম্মতের প্রতি কোনো খারাপ বা

---

৩৫. তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফী ইফতিরাকি হাযিহিল উম্মাত, হা. নং : ২৬৪০। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

https://nagorikpathagar.org

সংকীর্ণ ধারণার পরিচয় বহন করে না; বরং এটিই বাস্তবতা– যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তদুপরি এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. যা আমাদের জানিয়েছেন, তা অকুণ্ঠচিত্তে বিশ্বাস করাও আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক।

'উম্মতের মধ্যে ইফতিরাক হবে'– এ কথার মর্ম এও নয় যে, মানুষ এ ইফতিরাক ও বিভক্তিকে গ্রহণ করে নেবে, মেনে নেবে; কিংবা এরূপ ধারণা করবে যে, বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা শরীয়তসম্মত ব্যাপার; অথবা এ কথার ওপর ভিত্তি করে সে জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে; অথবা ইফতিরাক-সংক্রান্ত শাশ্বত নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করে হক অনুসন্ধান করবে না বা এ চেষ্টায় রত থাকবে না। বরং উম্মতের ইফতিরাকের অশুভ ফল থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব হলো– সে প্রতিনিয়ত হকের অনুসন্ধান করবে এবং একে আঁকড়ে ধরতে প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবে, আর না-হক ও মিথ্যার পরিচয় লাভের জন্য চেষ্টা করবে, যাতে সে না-হক ও মিথ্যা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারে। এ কথাও জেনে রাখা উচিত, হক একমাত্র রাসূলুল্লাহ সা., তাঁর সাহাবীগণ ও সালাফে সালিহীনের অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

খ. আবার অনেকেই ইফতিরাক-সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে বিভক্তির দলীল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। এ ভ্রান্তিটি ঠিক প্রথম ভ্রান্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা বিশ্বাস করেন, ইফতিরাক (উম্মতের বিভক্তি) একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। তাই লোকেরা দলাদলি ও বিভক্তিতে জড়িয়ে পড়বে, তা স্বচ্ছন্দে মাথা পেতে নেবে, তা-ই স্বাভাবিক ব্যাপার। তদুপরি দ্বীনের দাঈরা যদি এ বাস্তবতাকে মেনে নেন, নীরবে সহ্য করে যান এবং এ সমস্যা সমাধানের কোনোরূপ প্রচেষ্টা না চালান, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। উপরন্তু তাঁরা মনে করেন, মুসলিম যে দলেই থাক না কেন, তা তার জন্য ক্ষতিকর নয়। কারণ, ইফতিরাক একটি অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। তাই তাদের মতে, যে কেউ চাইলে তার পছন্দমতো যেকোনো দলের সাথে থাকতে পারে– যদিও তা ভ্রান্ত হোক অথবা যেসব ভ্রান্ত বিষয় নিয়ে উম্মতের মধ্যে বিভক্তির সূত্রপাত ঘটেছে, সেসব বিষয়ের ওপর সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টাও চালাতে পারে।

এটিও একটি চরম বিভ্রান্তিকর অমূলক ধারণা। ইফতিরাক-সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসগুলোকে নিজেদের বিভক্তির দলীলরূপে পেশ করা কিংবা একে নানারূপ বিদআত ও ভ্রান্তির ওপর সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে পরিণত করা মোটেও

https://nagorikpathagar.org

সমীচীন নয়। কারণ, ইফতিরাক-সংক্রান্ত হাদীসগুলো যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে তা নিষিদ্ধ ও গর্হিত হওয়ার কথাই ফুটে উঠেছে। উপরন্তু বিভিন্ন হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা. উম্মতের ইফতিরাকের ব্যাপারে উম্মতকে যেমন অবহিত করছেন, তেমনি এর পাশাপাশি এ কথাও তিনি উম্মতকে জানিয়েছেন যে, এ উম্মতের একটি অকুভোতয় দল সব সময় হকের ওপর অবিচল থাকবে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি দাওয়াত জানাতে থাকবে, যদিও এ দলের অনুসারীদের সংখ্যা সময় ও অবস্থাভেদে কমবেশি হতে পারে এবং নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করতে পারে।[৩৬] এ দলটিই সকলের আদর্শ ও অনুকরণীয় হয়ে সত্য ও ন্যায়ের দীপ্তি ছড়াবে। যেসব ব্যক্তি আন্তরিকভাবে হিদায়াত লাভ করতে চায়, তারা এর মাধ্যমে হিদায়াত পাবে; যারা হক ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকতে চাইবে, তারা এ দলটির নীতি ও আদর্শ মেনে চলবে। কাজেই দুনিয়াতে যতদিন হক যাহির ও সুস্পষ্ট থাকবে, সেই পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামত অবধি কোনো দাঈ কিংবা অন্য কারও জন্য এটা সমীচীন হবে না যে, সে হককে অবজ্ঞা করবে; যদিও হকের অনুসারীদের সংখ্যা অল্প হয়। অনুরূপ কারও জন্য কখনোই কোনো বিদআত ও ভ্রান্তিকে মাথা পেতে মেনে নেওয়া এবং এগুলোর ওপর সন্তুষ্ট থাকা কিংবা এগুলোর পক্ষাবলম্বন করা সমীচীন হবে না, যদিও ভ্রান্ত বিদআতী ও প্রবৃত্তিপূজারিদের সংখ্যা প্রচুর হয় এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও প্রবল হয়। কারণ, হকের ওপর অটল লোকদের সংখ্যা প্রায়ই ভ্রান্ত লোকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক কমই হয়ে থাকে। ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে এ কথা সুস্পষ্টভাবে এসেছে, মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলো তিহাত্তর দলের মধ্যে কেবল একটিই।

---

৩৬. যেমন, সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

"আমাদের উম্মতের কিছু লোক প্রকাশ্যে হকের ওপর অটল থাকবে। (এ ক্ষেত্রে) তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এরূপ অবস্থায় পরিশেষে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ (অর্থাৎ কিয়ামত) চলে আসবে।" (মুসলিম, *আস-সহীহ*, হা. নং : ৫০৫৯)

https://nagorikpathagar.org

গ. কেউ কেউ ইফতিরাক-সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে বিরোধী মতাবলম্বীদের দ্রুত দ্বীন ও মিল্লাত থেকে খারিজ করার দলীলরূপে ব্যবহার করে থাকে। তারা যেকোনো বিষয়ে প্রতিপক্ষকে শরীয়তের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও ইমামগণের অনুসৃত রীতির প্রতি লক্ষ না রেখে দ্রুত 'খারিজী', 'জামাআত থেকে বহির্ভূত' ও 'ধর্মত্যাগী' প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করে। এরূপ কাজ মোটের ওপর যথার্থ নয়। কারণ, কাউকে কাফির কিংবা ভ্রান্ত বা জামাআত থেকে বহির্ভূত প্রভৃতি ফাতওয়া দিতে হলে সুনির্দিষ্ট কিছু বিধি ও নীতির অনুসরণ করতে হয়। এমনকি বিদআতে লিপ্ত ও প্রবৃত্তিপূজারিদের বেলায়ও ফাতওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ, ব্যক্তির অবস্থা ও কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কাউকে কেবল নিজস্ব ধারণা ও মতের ওপর ভিত্তি করে কাফির বা ভ্রান্ত ফাতওয়া দেওয়া এবং এজন্য তাকে বর্জন করা ও তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করা জায়িয নয়। অর্থাৎ, কাউকে কোনো বিদআতে লিপ্ত হতে দেখলে কিংবা কাউকে দ্বীন, শরীয়ত ও সুন্নাতের পরিপন্থি কোনো কাজ করতে দেখলে সাথে সাথেই তাকে 'জামাআত ত্যাগী' আখ্যা দেওয়া সমীচীন নয়। কারণ, অনেকেই অজ্ঞতার কারণেও এরূপ অযাচিত কাজে লিপ্ত হতে পারে। আর অজ্ঞদেরকে তাদের অনেক কাজেই মাযূররূপে গণ্য করা হয়। তা ছাড়া অনেকেই প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েও এসব কাজে লিপ্ত হতে পারে। যেমন– বর্তমানে কোনো কোনো মুসলিম দেশেও অনেক সময় অনেককেই দাড়ি মুণ্ডাতে, হিজাব বা নিকাব বর্জন করতে, কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে এবং শরীয়তে বৈধ নয়– এরূপ অনেক কাজ করতে বাধ্য করা হয়। যদি তারা তা না করে, তবে তাদের হয় হত্যা করা হবে কিংবা কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে অথবা তাদের ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করা হবে।

আবার যারা নানা বিদআত চর্চা করে কিংবা নানা ভ্রান্ত চিন্তা পোষণ করে, তাদের মধ্যে এমন অনেক লোকও রয়েছে– যাদের কাছে এসব বিষয় সুস্পষ্ট নয়, আবার তাদের কেউ কেউ এসব বিষয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে ইচ্ছেমতো নানা তাবীল ও যুক্তিও পেশ করে থাকে। এরূপ অবস্থায় সত্যপন্থি আলিমদের কর্তব্য হলো– বিষয়গুলো তাদের কাছে যথাযথ দলীল-প্রমাণসহ সুস্পষ্ট করে তোলা এবং তাদের যুক্তি ও তাবীলগুলোর অসারতা প্রমাণ করা। আমরা সমাজে এমন অনেক লোককে দেখতে পাই– যারা নানা ধরনের বিদআতে লিপ্ত। এ ধরনের ব্যক্তিরা যদি অশিক্ষিত লোক হয় কিংবা দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়, তবে তাদের এ আমলের কারণে জামাআতবহির্ভূত,

https://nagorikpathagar.org

গুমরাহ কিংবা ভ্রান্ত জাহান্নামী দলের অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যায়িত করা সমীচীন নয়। আর তাদের এ আমলকে ইফতিরাক (বিচ্ছিন্নতা) হিসেবেও আখ্যা দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে হকপন্থিদের কর্তব্য হলো, প্রচলিত কাজটির ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো তাদের কাছে যথাযথ দলীল-প্রমাণসহ সুস্পষ্ট করে তোলা এবং তাদের ব্যাখ্যা ও যুক্তি-প্রমাণগুলোর অসারতা প্রমাণ করা। তবে হ্যাঁ, যে বিদআতগুলো স্পষ্ট কুফর, সেসব ব্যাপারে আলাদা কথা।

মোটকথা, দ্বীনের সুস্পষ্ট ও অকাট্য মৌলিক বিষয়সমূহ ব্যতীত ব্যাবহারিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিদআত বা নতুন চিন্তা কিংবা কোনো বিরোধিতার জন্য কারও প্রতি 'দ্বীন ও মিল্লাত থেকে বহির্ভূত' হওয়ার অভিযোগ আরোপ করার যে ত্বরাপ্রবণতা আমাদের অনেকের মধ্যে চাঙা হয়ে উঠছে, তা মোটের ওপর সমীচীন নয়। এরূপ পদক্ষেপ উম্মতের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। হকপন্থিদের করণীয় হলো– যদি তাঁরা কাউকে তাদের ধারণামতো সুন্নাতের পরিপন্থি কোনো আমল করতে দেখেন, তবে প্রথমে তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানতে করতে চেষ্টা করবেন যে, আমলটি আদৌ বিদআত কি না, আর বিদআত হলে কোন পর্যায়ের বিদআত, এটি কুফরের পর্যায়ভুক্ত নাকি সাধারণ আমলী বিদআত? এরপর তাঁরা লোকটির অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন– সে কি উক্ত বিষয়ে জাহিল কিংবা ব্যাখ্যাকারী অথবা প্রচলিত রীতির অনুসরণকারী? এ কারণে তাঁরা শুরুতে তার সাথে সুন্দর ও নম্রভাবে আচরণ করবেন, তাকে সদুপদেশ দেবেন, তার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন এবং তার যুক্তি-প্রমাণগুলোর অসারতা প্রমাণ করবেন। কারণ, তাঁদের উদ্দেশ্য হলো তার হিদায়াত; তাকে দোষারোপ করা, আক্রমণ করা উদ্দেশ্য নয়।

ঘ. অনেকেই সব ধরনের ইখতিলাফকে সমপর্যায়ের ধারণা করে থাকে। তারা জানে না, শরীয়তে এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে– যেগুলোতে ইখতিলাফের অবকাশ রয়েছে; আর কিছু বিষয় এমন রয়েছে– যেগুলোতে ইখতিলাফের কোনোই অবকাশ নেই। তারা, এমনকি অনেক আলিমও এ দু-ধরনের বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে সচেতন নন। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ এ ধরনের কতিপয় অজ্ঞতা তুলে ধরছি :

ঘ.১. কেউ কেউ কিছু মতবিরোধযোগ্য বিষয়কেও দ্বীনের অকাট্য ও মৌলিক বিষয়রূপে গণ্য করে থাকেন। তারা এক্ষেত্রে না বিজ্ঞ আলিমগণের অনুসৃত মূলনীতিসমূহের প্রতি লক্ষ রাখেন, না তাঁদের মতামতের প্রতি লক্ষ রাখেন।

https://nagorikpathagar.org

ঘ.২. অনেকেই আছেন, যারা নানা ধরনের ভ্রান্তিসমূহের মধ্যে তারতম্য করতে জানেন না। উল্লেখ্য, কিছু ভ্রান্তি আছে– যা কুফরের পর্যায়ভুক্ত। আর কিছু ভ্রান্তি আছে– যা কুফরের পর্যায়ভুক্ত নয়।

ঘ.৩. আবার অনেকেই আছেন, যারা বিদআতসমূহের মধ্যে তারতম্য করতে জানেন না অথবা সে ব্যাপারে সচেতন নন। উল্লেখ্য, ফলাফল ও ভয়াবহতার দিক থেকে বিদআতগুলো নানা পর্যায়ে বিভক্ত। কিছু বিদআত আছে, যেগুলো অত্যন্ত মারাত্মক ও কুফরের পর্যায়ভুক্ত; আর কিছু বিদআত আছে, যেগুলো অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর এবং তা ছোটো বা বড়ো পাপের পর্যায়ভুক্ত।

কুফর ও বিদআতের অভিযোগ : কর্ম ও বিশেষণের পার্থক্য

কুফর, ফিসক ও বিদআতের অভিযোগ আরোপের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কর্ম ও বিশেষণের মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। ধরুন, আমরা কোনো কর্ম বা কথাকে সাধারণভাবে কুফর হিসেবে জানি; কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যারা এ জাতীয় কোনো কথা বিশ্বাস করল, কিংবা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল কিংবা এ জাতীয় কোনো কাজ করল, তাদের প্রত্যেককেই এজন্য কালবিলম্ব না করে কাফির ফাতওয়া দিতে হবে। কারণ, কোনো কুফরী কাজ করা বা কথা বলা এবং কাফির ফাতওয়া দেওয়া এককথা নয়। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একটি হলো কর্ম, অপরটি বিশেষণ। নিছক কোনো কথা বা কাজের জন্য কাউকে ওই কথা বা কাজের বিশেষণ দ্বারা ভূষিত করা সংগত নয়, যদি উক্ত কথা বা কাজ তার স্বভাবসিদ্ধ কিংবা তার প্রকৃত চিন্তার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি না হয়ে থাকে। মানবজীবনে বিচ্ছিন্নভাবে কিংবা নানা পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কাজই সংঘটিত হয়, তাই বলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ওই কাজের বিশেষণ দ্বারা ভূষিত করা সমীচীন নয়।

আফসোসের বিষয় হলো– এক্ষেত্রে অনেকেই, এমনকি অনেক আলিম ও দাঈও কর্ম ও বিশেষণের মধ্যে পার্থক্য করেন না। তদুপরি সম্প্রতি তাকফীরের নিয়মনীতির কোনোরূপ তোয়াক্কা ছাড়াই একে অপরকে কাফির ও গুমরাহ ফাতওয়া দেওয়ার প্রবণতা যেভাবে ক্রমে বেড়েই চলছে, তাতে মনে হয়– বর্তমানে পরস্পরের ফাতওয়ায় দৃশ্যত সত্যিকার মুমিন বলতে কেউ নেই। বলা বাহুল্য, যখন-তখন যাকে-তাকে কাফির ফাতওয়া দেওয়া একটি মস্ত বড়ো ফিতনা ও অপরাধ।

https://nagorikpathagar.org

পবিত্র কুরআনে যেসব লোক আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না, তাদের কাফির বলা হয়েছে। কিন্তু আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কেউ তাদের কাফির বলে ফাতওয়া দেন না। অনুরূপ হাদীসে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ছেড়ে দেওয়াকেও কুফরী কর্ম বলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আহলুস সুন্নাতের কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত তরককারীকে কাফির ফাতওয়া দেন না। এ রকম আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এর কারণ হলো :

প্রথমত, এ জাতীয় কথা বা কর্মে হয়তো নানা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে অথবা যেকোনোরূপ সংশয় থাকতে পারে। আর ভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে কিংবা সংশয়যুক্ত অথবা যেসব বিষয়ে সত্যনিষ্ঠ ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে– এ জাতীয় কোনো কথা বা কাজের জন্য কাউকে কাফির ফাতওয়া দেওয়া সংগত নয়। কোনো মুসলিম যে যাবৎ-না এমন কোনো কুফরীতে লিপ্ত হবে– যা অকাট্য ও সুস্পষ্ট এবং কুফররূপে সকলের কাছে পরিচিত, তাকে কোনো পাপ কিংবা কোনো সন্দেহজনক কাজ বা বক্তব্য বা মতবিরোধপূর্ণ বিশ্বাসের কারণে কাফির আখ্যা দেওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

ثَلاَثَةٌ مِنْ أَصْلِ الإِيْمَانِ : اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ وَلاَ تُخْرِجْهُ مِنَ الإِسْلاَمِ بِعَمَلٍ

"তিনটি বিষয় মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত– ১. যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঘোষণা দেবে, তার (জানমাল ও ইজ্জতের ওপর যেকোনোরূপ অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে) বিরত থাকা, ২. তাকে আমরা কোনো পাপের কারণে কাফির বলব না, ৩. কোনো আমলের কারণে ইসলাম থেকেও বের করে দেবো না।"[৩৭]

ফকীহগণের মতে–

إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُهُ فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَمِيلَ إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ.

৩৭. আবূ দাউদ, সুলাইমান, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-জিহাদ, পরিচ্ছেদ : আল-গাযউ মাআ আয়িম্মাতিল জাওরি, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবী, তা. বি.), হা. নং : ২৫৩৪

https://nagorikpathagar.org

"কোনো বিষয়ে কাউকে কাফির বলার মতো বহু উপলক্ষ্য থাকলেও যদি তাতে এমন কোনো উপলক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায়– যার ওপর ভিত্তি করে তাকে কাফির বলা থেকে বিরত থাকা যায়, তাহলে মুফতির জন্য উচিত হবে, মুসলিমের প্রতি সুধারণা পোষণ করত সেই উপলক্ষ্যকেই গ্রহণ করা।"[৩৮]

রাসূলুল্লাহ সা. কোনো মুসলিমকে কাফির বলতে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন–

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا

"কোনো ব্যক্তি অপর কাউকে কাফির বলে আখ্যায়িত করলে তাদের দুজনের যেকোনো একজন এর সম্মুখীন হবে। যাকে কাফির ডাকা হয়েছে, সে যদি বাস্তবিকই কাফির হয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে সে যদি বাস্তবিকই কাফির না হয়, তাহলে কাফির আখ্যায়িতকারী নিজেই এ আখ্যার উপযোগী হবে।"[৩৯]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের প্রতি কুফরের অভিযোগ দিলো, সে প্রকারান্তরে যেন তাকে হত্যা করল।"[৪০]

দ্বিতীয়ত, এ জাতীয় ফাতওয়ার ফলে একদিকে পাপী মুসলিমদের সংশোধনের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়, অপরদিকে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়। এভাবে মুসলিম সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। আমরা জানি, পবিত্র মদীনার অনেক মুনাফিকই সাচ্চা কাফির ছিল এবং তাদের থেকে নানা সময়ে ইসলাম, মুসলিম ও রাসূলুল্লাহ সা. সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছিল, এরপরও রাসূলুল্লাহ সা. তাদের কাফির আখ্যা দিয়ে মুসলিম সমাজ থেকে বের করে দেননি; বরং তাদেরকে নিজেদের সাথে রেখে সংশোধনের সুযোগ দান করেন।

---

৩৮. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ১২, পৃ. ৭৭; ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়িক*, খ. ২, পৃ. ২৬৮; খ. ১৩, পৃ. ৪৮৮; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১৬, পৃ. ২৫৬

৩৯. বুখারী, *আস-সহীহ*, হা. নং : ৫৭৫২

৪০. বুখারী, *আস-সহীহ*, হা. নং : ৫৭৫৪, ৬২৬৭

https://nagorikpathagar.org

তৃতীয়ত, দ্বীনের আকীদাসংক্রান্ত এমন অনেক বিষয়ও রয়েছে, যেগুলোর বিস্তারিত জ্ঞান ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলো (যেমন– আল্লাহর নাম ও সিফাতসংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিষয়গুলো; কাদর, আল্লাহর দর্শন ও শাফাআত প্রভৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়) সাধারণ লোকেরা তো জানেই না; বরং অনেক আলিমেরও এসব বিষয়ে খুব বিস্তারিত ও স্পষ্ট জ্ঞান নেই। ফলে কখনও তাদের কেউ কেউ এরূপ কথাও উচ্চারণ করতে পারে– যা প্রকাশ্যত কুফর; কিন্তু এ ব্যাপারে তার কোনো হুঁশই নেই, অথবা কথাটি যে কুফর– সে তা প্রামাণ্য মনে করেনি অথবা সে তা জানেই না অথবা সে ভাষা চয়নের ক্ষেত্রে গভীরভাবে চিন্তা করেনি। এখন প্রশ্ন হলো, এরূপ ব্যক্তিকে কি শুরুতেই তার এ কথার জন্য কাফির ফাতওয়া দিতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, অবশ্যই নয়। অথচ আমাদের অনেকেই, বিশেষ করে নতুন শিক্ষার্থী ও অর্বাচীন কেউ কেউ অতি উৎসাহের সাথে প্রতিনিয়ত এরূপ ফাতওয়া দিয়ে চলছেন, যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং উম্মতের ঐক্য ও সংহতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আফসোসের বিষয় হলো, প্রত্যেক দলের এ নবীন ও অর্বাচীনরাই নিজেদেরকে দ্বীনের সবচেয়ে বড়ো বোদ্ধা লোক হিসেবে যাহির করে; অথচ তাদের অনেকেই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কুরআন-হাদীসের শিক্ষাও লাভ করেনি; বরং নিজেরা স্ব-উদ্যোগে কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করে কিছু ভাসাভাসা জ্ঞান লাভ করেছে। আবার অনেকেই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান লাভ করলেও তারা না দলীল উপস্থাপন ও সিদ্ধান্তদান-সংক্রান্ত নিয়মনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রাখে, না তারা ইমামগণের নির্দিষ্ট কোনো নিয়মনীতি মেনে চলে।

ইফতিরাক বনাম ইখতিলাফ

'ইফতিরাক' ও 'ইখতিলাফ' শব্দ দুটি আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায়ই কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইফতিরাক অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, বিভক্ত হওয়া; আর ইখতিলাফ অর্থ মতবিরোধ করা, কথা ও কাজে ভিন্নতা অবলম্বন করা। ব্যাবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটি শব্দের মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে আলিমদের যথার্থ জ্ঞান রাখা প্রয়োজন। কেননা, অনেকেই, বিশেষ করে কোনো কোনো অনভিজ্ঞ দাঈ ও আলিম এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে জানেন না। ফলে তারা অনেক সময় ইখতিলাফ করতে গিয়ে ইফতিরাকে জড়িয়ে পড়েন।

https://nagorikpathagar.org

নিম্নে আমরা ইফতিরাক ও ইখতিলাফের মধ্যকার প্রধান প্রধান পার্থক্যসমূহ তুলে ধরছি :

ক. ইফতিরাক হলো ইখতিলাফের জঘন্যতর রূপ এবং এর গর্হিত ফসল। কারণ, ইখতিলাফ কখনও ইফতিরাক পর্যন্ত পৌঁছে, আবার কখনও পৌঁছে না। কাজেই ইফতিরাক হলো– ইখতিলাফসহ অতিরিক্ত কিছু।

খ. সকল ইফতিরাক (বিচ্ছিন্নতা বা বিভক্তি)-ই ইখতিলাফ (মতবিরোধ); তবে সকল ইখতিলাফ ইফতিরাক নয়। ইখতিলাফ ব্যতীত ইফতিরাকের অস্তিত্ব নেই; তবে ইফতিরাক ব্যতীতও ইখতিলাফ হতে পারে। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে ইফতিরাকের জন্য ইখতিলাফ শব্দও ব্যবহার করা যায়; তবে নিরেট ইখতিলাফের জন্য ইফতিরাকের শব্দের ব্যবহার প্রযোজ্য নয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনেক জায়গায় 'ইফতিরাক' বোঝাতে 'ইখতিলাফ' শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে।[৪১]

গ. ইখতিলাফ যেকোনো বিষয়ে যেকোনো মুহূর্তে হতে পারে; কিন্তু ইফতিরাক থাকাটা কোনো সময়ের জন্য কাম্য নয়। সাহাবীগণের যুগ থেকে উম্মতের মুজতাহিদ ইমাম ও আলিমগণের মধ্যে বহু বিষয়ে ইখতিলাফ সংঘটিত হয়; তবে তা কখনোই ইফতিরাকে রূপ নেয়নি।

ঘ. শরীয়তের দৃষ্টিতে ইখতিলাফ মোটের ওপর নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা উম্মতের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে ইফতিরাক সর্বক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়।

ঙ. ইফতিরাক প্রায়ই এমনসব বিষয়ে সংঘটিত হয়, যেগুলো দ্বীনের প্রধান ও মৌলিক বিষয়, যেসব ব্যাপারে ইখতিলাফের কোনো সুযোগ নেই, যা অকাট্য নস দ্বারা সুপ্রমাণিত বা উম্মতের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত কিংবা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আমল দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। এ জাতীয় বিষয়ে যে ব্যক্তি ইখতিলাফ করে, সে প্রকৃতপক্ষে ইফতিরাককারীই। আর অন্য সব বিষয়ে যে মতবিরোধ সংঘটিত হয়, তা ইখতিলাফের পর্যায়ভুক্ত।

এ কথার মর্ম হলো, দ্বীনের ব্যাবহারিক যে সকল বিষয়ে গবেষণার ও নানা মত পোষণের অবকাশ রয়েছে কিংবা যেসব বিষয় সকলের জানা থাকার কথা নয় কিংবা নানা ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে ইখতিলাফ

---

৪১. দ্র. আল-কুরআন, ২ : ২১৩; ৩ : ১৯; ৪৫ : ১৭

https://nagorikpathagar.org

সংঘটিত হতে পারে। উপরন্তু, এমন কিছু আকীদাগত বিষয়েও ইখতিলাফ সংঘটিত হতে পারে– যা অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীনভাবে সুপ্রমাণিত নয় এবং সেসব প্রসঙ্গে সালাফদের মধ্যেও নানা মত প্রচলিত রয়েছে। যেমন– রাসূলুল্লাহ সা.-এর মিরাজের ব্যাপারে উম্মতের সকল আলিমই একমত; তবে মিরাজে রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন কি না? দেখে থাকলে তা কি চাক্ষুষ দর্শন ছিল, নাকি অন্তরের দর্শন ছিল? প্রভৃতি ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

চ. শরীয়তের যেসব বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে ইখতিলাফ সংঘটিত হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে ইখতিলাফকে কুফর, ফিসক কিংবা সুন্নাত ও জামাআত থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং ইখতিলাফকারীকে কাফির, ফাসিক, ভ্রান্ত কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেওয়া যাবে না। কিন্তু ইফতিরাককারীকে তার বিচ্ছিন্ন মত ও চিন্তার কারণে প্রযোজ্য অভিধায় (যেমন– কাফির, ফাসিক, ভ্রান্ত, বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রভৃতি) ভূষিত করা যাবে।

ছ. ইখতিলাফের ভিত্তি হলো ইলম বা দলীল এবং এর উদ্দেশ্য হলো সত্যের অন্বেষণ। পক্ষান্তরে ইফতিরাকের ভিত্তি হলো প্রায়ই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, আত্মম্ভরিতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অজ্ঞতা, জিদ ও চিরাচরিত রীতির অন্ধ অনুকরণ প্রভৃতি; আর এর উদ্দেশ্যে হলো ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ। আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবের বিভক্তি ও দলাদলি সম্পর্কে বলেন–

﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾

"তাদের কাছে (যথার্থ) ইলম আসার পরও তারা যে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছিল, তা (কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে ছিল না; বরং তা) ছিল তাদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও জিদের কারণে।"[৪২]

এ আয়াত থেকে জানা যায়, বিভক্তি ও দলাদলির পেছনে মূল কারণ হলো পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও জিদ।

জ. ইখতিলাফ কখনও ভালো নিয়তে ইজতিহাদের ভিত্তিতেও হতে পারে। এ কারণে ইখতিলাফকারী ব্যক্তি মোটের ওপর নিন্দিত হন না; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তিনি তাঁর আন্তরিক চেষ্টার জন্য পুরস্কৃতও হন, যদি তিনি

৪২. আল-কুরআন, ৪২ (সূরা আল-জাসিয়াহ) : ১৪

https://nagorikpathagar.org

ইখলাসের সাথে সত্যানুসন্ধানের মানসে ইজতিহাদ করেন। তবে এরূপ ইখতিলাফও যখন ইফতিরাকের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনি তা নিন্দনীয়রূপে পর্যবসিত হয়। পক্ষান্তরে ইফতিরাক না ইজতিহাদের ভিত্তিতে হয়, না ভালো নিয়তে হয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এর মূল কারণ হলো– ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বা হিংসা-বিদ্বেষ বা জিদ। এ কারণে ইফতিরাককারী সর্বক্ষেত্রে নিন্দিত এবং অবস্থাভেদে শাস্তিযোগ্যও।

ঝ. ইখতিলাফের ক্ষেত্রে আলিমগণ প্রত্যেকেই নিজের মতকে সঠিক ও অধিকতর বিশুদ্ধ বলে মনে করলেও অন্য মতগুলোকে ভ্রান্ত বলে মনে করেন না; বরং ওইগুলোকে দুর্বল বলে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে ইফতিরাকের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজের মতকে একমাত্র সত্য ও বিশুদ্ধ এবং ভিন্ন মতগুলোকে মিথ্যা ও ভ্রান্ত বলে গণ্য করেন।

ঞ. ইফতিরাককারী নিজের মতের অনুসারীদের 'আপন' ও 'নিজের সমর্থক গোষ্ঠী' এবং অন্য সব চিন্তা ও মতের অনুসারীদের 'পর' ও 'প্রতিপক্ষ' ভাবেন। পক্ষান্তরে ইখতিলাফকারী আলিম এরূপ মনে করেন না।

ট. ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও ঐক্যের সাথে ইখতিলাফ থাকতে পারে। অর্থাৎ, ইখতিলাফ সত্ত্বেও ইখতিলাফকারীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও ঐক্য পুরো মাত্রায় বিদ্যমান থাকতে পারে। এজন্য বলা হয়, الاختلاف مع الاتفاق বা 'মতপার্থক্যসহ ঐক্য'। কিন্তু ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও ঐক্যের সাথে ইফতিরাক থাকতে পারে না। উপরন্তু, যখনই এসব গুণের অভাব দেখা দেয়, তখনই ইফতিরাক জন্ম নেয়। এ কারণে ইফতিরাককারীরা পরস্পর হিংসাপরায়ণ হয়ে থাকে এবং একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়।

ঠ. ইখতিলাফ ক্ষেত্রবিশেষে রহমতরূপে প্রতীয়মান হয় এবং তা উম্মতের জন্য প্রশস্ততা নিয়ে আসে। এজন্য বলা হয়, اختلاف العلماء رحمة-'আলিমগণের ইখতিলাফ রহমতস্বরূপ।'[৪৩] পক্ষান্তরে ইফতিরাক সর্বক্ষেত্রে ধ্বংস ও আযাব ডেকে আনে।

---

৪৩. কেউ কেউ এ কথাটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসরূপেও প্রচার করে থাকে। কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়। বস্তুতপক্ষে এটি একটি জাল রিওয়ায়াত। (মুল্লা আল-কারী, *আল-মাওদূআতুল কুবরা*, পৃ. ৮৪, হা. নং : ১৭) আমার মনে হয়, খুব সম্ভব, এটি হয়তো কারও উক্তি– যা পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কথারূপে চালু হয়ে গেছে।

https://nagorikpathagar.org

আকীদাগত বিভক্ত জনগোষ্ঠীর স্বরূপ

আকীদাগত বিভক্ত জনগোষ্ঠীকে তাদের স্বরূপ বিচারে তিনটি শ্রেণিতে শ্রেণিকরণ করা যায় :

এক. যারা হক জানতে পেরেছে, হকের অনুসরণ করে এবং হক লাভ করার জন্য বিশুদ্ধ পথ (তথা কুরআন, হাদীস ও সালাফে সালিহীনের ইজমা) অবলম্বন করে। এ দলটি দ্বীনের সঠিক রাস্তার ওপর রয়েছে। এঁরা হলেন সালাফে সালিহীন ও তাঁদের একান্ত অনুসারীগণ। হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. এঁদের 'ফিরকাহ নাজিয়াহ' (মুক্তিপ্রাপ্ত দল) বলে অভিহিত করেছেন। এঁরা রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবীগণের পদাঙ্ক মেনে চলেন এবং তাঁদের আদর্শ ও নীতির ওপর অটল থাকেন।

দুই. যারা হক জানতে পেরেছে; কিন্তু তা অনুসরণ করে না। তারা না অন্তর দিয়ে তা বিশ্বাস করে এবং না তদনুসারে আমল করে। ইসলামের সকল ভ্রান্ত দল-উপদল এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তারা দ্বীনের মধ্যে নানা পথ রচনা করে এবং নতুন নতুন চিন্তাদর্শন সংযোজন করে। তার মধ্যে কিছু পথ ও চিন্তাদর্শন গুরুতর পাপ, আর কিছু পথ ও চিন্তাদর্শন কুফরের নামান্তর। এ কারণে তাদের মধ্যে কেউ হয় ফাসিক, ভ্রান্ত ও বিদআতী, আর কেউ হয় কাফির। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾

"নিঃসন্দেহে এটি আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথে চলো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না। নচেৎ সেসব পথ তোমাদের তাঁর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।"[৪৪]

এ আয়াতে 'অন্যান্য পথ' বলতে দ্বীনের সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত তথা বিদআতীদের নতুন উদ্ভাবিত সব পথকে বোঝানো হয়েছে।[৪৫] এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একদিন রাসূলুল্লাহ সা. একটি দীর্ঘ সোজা দাগ আঁকলেন।

---

৪৪. আল-কুরআন, ৬ (সূরা আল-আনআম) : ১৫৩

৪৫. প্রখ্যাত তাবিঈ মুজাহিদ রহ. বলেন, এখানে 'অন্যান্য পথ' বলে যাবতীয় বিদআত ও সন্দেহযুক্ত কাজগুলো (شبهات)-কে বোঝানো হয়েছে। (তাবারী, আবূ জাফর, *জামিউল বায়ান*.., খ. ১২, পৃ. ২২৯)

https://nagorikpathagar.org

এরপর এ দাগের ডানে-বামে আরও অনেক দাগ টানলেন। তারপর বললেন, এ সোজা দাগটাই হলো আল্লাহ তাআলার রাস্তা। আর ডানে-বামের অসংখ্য দাগ হলো শয়তানের বিভিন্ন রাস্তা, যেগুলোর দিকে সে আহ্বান জানায়। এরপর রাসূলুল্লাহ সা. উপর্যুক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।[৪৬]

তিন. যেসব বিজ্ঞ চিন্তাশীল লোক হক অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভুল করেন অর্থাৎ, তাঁরা হক লাভের জন্য আন্তরিকভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা চালান, অধ্যয়ন করেন, গবেষণা করেন; কিন্তু সকল বিষয়ে সঠিক মতে উপনীত হতে পারেন না; বরং ক্ষেত্রবিশেষে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন– এ শ্রেণির লোকদের ব্যাপারে নানা অভিমত রয়েছে। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে যাঁদের ভ্রান্তি চরম গুমরাহী বা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত, তাঁদের ব্যাপারে আলিমগণের অভিমত হলো :

ক. অনেকের মতে, এ জাতীয় ব্যক্তিদের তাদের ভ্রান্তির গুরুতরতার ভিত্তিতে ফাসিক ও ভ্রান্ত কিংবা কাফির অভিধায় অভিযুক্ত করা হবে। কারণ, আকীদার বিষয়গুলো অকাট্যভাবে সুপ্রমাণিত; এতে ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই। কাজেই এরূপ ব্যক্তিদের গবেষণাগত ভুল ওযররূপে বিবেচিত হবে না। তারা তাদের চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে যেমন পদ্ধতিগতভাবে ভুলে নিমজ্জিত, তেমনি গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত ও ফলাফলেও ভুলে নিপতিত। এ মতের একটি দলীল হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"আপনি তাদের বলুন, তাহলে তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আয়াতগুলোকে নিয়েই উপহাস করেছ? ছলনা করো না। এ কাজের মাধ্যমে তোমরা নিঃসন্দেহে ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছ।"[৪৭]

---

৪৬. ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং : ১১, আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং : ৪১৩১; হাকিম, *আল-মুসতাদরাক*, হা. নং : ৩২৪১; ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, হা. নং : ৬, দারিমী, *আস-সুনান*, হা. নং : ২০৬; হাদীসটি সহীহ।

عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فخط خطا. وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال (هذا سبيل الله). ثم تلا هذه الآية {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله}.

৪৭. আল-কুরআন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ) : ৬৫-৬

https://nagorikpathagar.org

এ আয়াত থেকে প্রকাশ্যত জানা যায়– যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল, কিতাব ও মুমিনগণ সম্পর্কে কোনোরূপ অশোভন মন্তব্য করবে; যদি তা তাদের অজ্ঞতার কারণেও হয়, তবুও তা কুফররূপে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে তাদের কোনো ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না।

খ. আবার অনেকেই মনে করেন, ব্যাবহারিক বিষয়সমূহের মতো আকীদার ক্ষেত্রেও কেউ চিন্তা-গবেষণা (ইজতিহাদ) করে কোনো ভুলে নিমজ্জিত হলে তা ওযররূপে বিবেচিত হবে। কাজেই এরূপ ব্যক্তি এ ভুলের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কোথাও শাস্তির সম্মুখীন হবে না। এ প্রসঙ্গে তাদের একটি দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"যদি শাসক চিন্তা-গবেষণা করে কোনো সিদ্ধান্ত দেন এবং তার সেই সিদ্ধান্ত সঠিক হয়, তবে সে দুটি প্রতিদান পাবে, আর ভুল হলে একটি প্রতিদান পাবে।"[৪৮]

রাসূলুল্লাহ সা.-এর এ বাণীটি যেমন ব্যাবহারিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি বিশ্বাসগত বিষয়াদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাজেই একজন গবেষক (মুজতাহিদ) যেমন ব্যাবহারিক বিষয়ে ভুলে নিপতিত হলে তাকে মাযুররূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে, তেমনি বিশ্বাসগত বিষয়ে তার ইজহিতাদে ভুল হলেও তাকে মাযুর হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তা ছাড়া ভুলত্রুটি সর্বক্ষেত্রে মার্জনীয়– চাই তা আমলের ক্ষেত্রে হোক কিংবা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হোক। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের ভুলত্রুটি, বিস্মৃতি ও যেসব কাজে তাদের বাধ্য করা হয়, তা ক্ষমা করে দেন।"[৪৯]

---

৪৮. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আকযিয়াহ, পরিচ্ছেদ : আল-কাযী ইয়ুখতিউ, হা. নং : ৩৫৭৬

৪৯. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তালাক, পরিচ্ছেদ : তালাকুল মুকরাহ .., হা. নং : ২০৪৩

https://nagorikpathagar.org

গ. অনেকেই মনে করেন, ইসলামের অকাট্য ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত মৌলিক বিশ্বাসসমূহের ক্ষেত্রে ভুলে নিপতিত ব্যক্তিকে দুনিয়ায় তার ভুলভ্রান্তির জন্য যথোচিত অভিধায় (যেমন– ফাসিক, বিদআতী, ভ্রান্ত, কাফির প্রভৃতি) অভিযুক্ত করা হবে এবং এ ভুলের জন্য সে প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট শাস্তিও ভোগ করবে। তবে পরকালের ব্যাপারটি একান্তই আল্লাহর ইখতিয়ার। তাঁরা প্রথম অভিমতের দলীলগুলো দুনিয়ার জন্য এবং দ্বিতীয় অভিমতের দলীলগুলো পরকালের জন্য প্রযোজ্য মনে করেন। আমরা মনে করি, এ মতটিই অধিকতর অগ্রগণ্য।

ইসলামে আকীদাগত ইফতিরাকের উৎপত্তি

রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে মুসলিম উম্মাহ সর্বতোভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল; তাঁদের মধ্যে কোনোরূপ বিভক্তি বা বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়নি। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সা. থেকে চিন্তা-বিশ্বাসসংক্রান্ত যা কিছু শুনতেন, তা কোনোরূপ প্রশ্ন ও দ্বিধা ছাড়াই সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন। আর তিনি যা কিছু বলতেন ও করতেন, তা তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যে মেনে চলতেন।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে যখন ইসলামের বাণী ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করে, তখন একদিকে ইসলামের মূল চেতনা ও বিশ্বাস ধারণ করার ক্ষেত্রে তাঁদের অনেকের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেয়, অপরদিকে তাঁদের পূর্ববর্তী ধর্মের বিভিন্ন চিন্তা ও মতামত এবং তাঁদের সমাজে প্রচলিত নানা যুক্তি ও দর্শন প্রভৃতি তাদের মন-মগজকে প্রভাবিত করে। এসব প্রতিষ্ঠিত চিন্তা ও যুক্তির ভিত্তিতে তাঁরা ইসলামী চিন্তা ও বিশ্বাসের নানা দিক নিয়ে পর্যালোচনা ও বিতর্ক শুরু করেন এবং নতুন নতুন মতামত প্রকাশ করতে থাকেন।

অন্যদিকে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিভেদও দলাদলির প্রেক্ষাপট তৈরি করে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর পূর্বে আরব দেশে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। আরবরা তখন বংশতান্ত্রিক কবীলা প্রথার অধীনে বসবাস করত। রাসূলুল্লাহ সা.-ই সর্বপ্রথম আরবে একটি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক শিক্ষা ও নির্দেশনা দান করেন। তবে অবস্থার নতুনত্ব ও জটিলতার কারণে এ ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মধ্যে কিছুটা ইখতিলাফ হলেও তা সর্বশেষ ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমাধান হয় এবং তা চিন্তাধারাগত দলাদলির পর্যায়ে পৌঁছেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে এ রাজনৈতিক মতভেদ বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টিকারীদের একটি প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়। এভাবে ধর্মীয়,

https://nagorikpathagar.org

দার্শনিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি কারণে উম্মাহর মধ্যে মতভেদ শুরু হয় এবং এ মতভেদ ক্রমশ বাড়তে বাড়তে তারা নানা দল-উপদল ও চিন্তাগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

উম্মতের সদস্য হিসেবে আমাদের জন্য ইফতিরাকের ইতিহাস জানা প্রয়োজনীয় ও উপকারী। এতে আমাদের জন্য শিক্ষালাভের নানা উপকরণ রয়েছে। তবে এ গ্রন্থে যেহেতু ইফতিরাকের বিশদ ইতিহাস বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, তাই এখানে আমরা এতৎসংক্রান্ত কেবল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরাতেই আলোচনা সংক্ষেপ করতে চাই। আশা করছি, এ আলোচনার ফলে বর্তমান যুগে এ সম্পর্কে আমাদের অনেকের মধ্যে যে কয়টি ভুল ধারণা রয়েছে, তার নিরসন হবে।

এক. শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে উম্মতের মধ্যে কোনোরূপ বিভক্তি বা বিচ্ছিন্নতা ছিল না; না আকীদাগত, না আমলগত। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সা. থেকে চিন্তা-বিশ্বাসসংক্রান্ত যা কিছু শুনতেন, তা কোনোরূপ প্রশ্ন ও দ্বিধা ছাড়াই সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন। আর তিনি যা কিছু বলতেন ও করতেন, তা তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যে মেনে চলতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে যখন ইসলামের বাণী ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করে, তখন একদিকে ইসলামের মূল বিশ্বাস ধারণ করার ক্ষেত্রে তাঁদের অনেকের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেয়, অপরদিকে তাঁদের পূর্ববর্তী ধর্মের বিভিন্ন চিন্তা ও মতামত এবং তাঁদের সমাজে প্রচলিত নানা যুক্তি ও দর্শন প্রভৃতি তাদের মন-মগজকে প্রভাবিত করে।

যতটুকু জানা যায়, উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আকীদাগত বিভক্তির বীজ বপন করে আবদুল্লাহ ইবনু সাবা। সে ছিল মূলত একজন চরম ইসলামবিদ্বেষী ইয়াহুদী। সাইয়িদুনা উসমান রা.-এর আমলে সে দৃশ্যত ইসলাম গ্রহণ করে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোপনে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। সে নিজেকে সাইয়িদুনা আলী রা.-এর একজন মহাভক্ত দাবি করে আলী রা.-এর অনুসারীদের সাথে মিশে যায় এবং অতি সুকৌশলে তাদের মধ্যে তার চিন্তাধারার[৫০] বিষবাষ্প ছড়াতে থাকে। তার ভ্রান্ত চিন্তাগুলোকে তার নামের

৫০. যেমন– রাসূলুল্লাহ সা.-এর পুনরাগমন (রাজআত); আলী রা.-এর উলূহিয়্যাত; তাঁর খিলাফত ও ইমামতের ন্যায্যতা; জন্মান্তরবাদ (তানাসুখ), সাহাবীদের প্রতি নানা মিথ্যা অভিযোগ আরোপ ও তাকফীর প্রভৃতি।

https://nagorikpathagar.org

দিকে সম্বন্ধ করে 'সাবাঈ আকীদা' বলা হয়। তবে সে সময় তার চিন্তাগুলো প্রকৃত মুসলমানদের নিকট খুব একটা সমাদর লাভ করেনি। অনেকেই তা জানতও না। অধিকন্তু, এগুলোর পক্ষে প্রকাশ্য কোনো প্রচারণাও ছিল না। সে অত্যন্ত গোপনে মুসলমানদের মধ্যে তার চিন্তাগুলো বলে বেড়াত। ছদ্মবেশী মুনাফিক ও মুসলিমবিদ্বেষীরা তার এ চিন্তাগুলো গ্রহণ করেছিল, আর সাধারণ অশিক্ষিত মুসলিম, নবদীক্ষিত অনারব ও বেদুঈনদের মধ্যেও অনেকেই তার এ চিন্তাগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়। এভাবে মুসলিম সমাজে নীরবে তার চিন্তাগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ক্রমে দানা বাঁধে, পরে একপর্যায়ে এসব চিন্তা থেকেই শীআ ও খারিজী চিন্তার উদ্ভব হয়।

মোটকথা, সাবাঈ আকীদাগুলোই ছিল মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট প্রথম ভ্রান্ত চিন্তা, যেগুলো প্রথমদিকে প্রায়ই প্রচ্ছন্ন ও আবছারূপে ছিল; আকীদা হিসেবে কোনোরূপ স্বীকৃতি বা প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। অধিকন্তু, এ চিন্তাধারার ওপর নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ও গড়ে ওঠেনি। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মুসলিম জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন দল হিসেবে উদ্ভূত হয় খারিজী সম্প্রদায়। এরা মূলত সাবাঈ ধারা থেকে উৎপন্ন। অনেকেই মনে করেন, সাবাঈরা ও খারিজীরা ভিন্ন। প্রকৃত ব্যাপার হলো, শীআরা যেমন সাবাঈদের থেকে উদ্ভূত একটি মারাত্মক প্রজন্ম, তেমনি খারিজীরাও হলো সাবাঈদের থেকে উদ্ভূত একটি নিকৃষ্ট প্রজন্ম। বস্তুতপক্ষে এ সাবাঈরাই পরবর্তীকালে প্রধান দু-দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল খারিজী নামে আর অপর দল শীআ নামে। এ দল দুটির মধ্যে যদিও আকীদাগত বহু পার্থক্য রয়েছে, তবে উৎস একটাই। এ দল দুটিই সাইয়িদুনা উসমান রা.-এর আমলে সৃষ্ট ফিতনা থেকে উৎপত্তি লাভ করে। আর এ ফিতনার মূলে ছিল আবদুল্লাহ ইবনু সাবা। সে তার ভ্রান্ত চিন্তা ও দুরভিসন্ধিমূলক কাজের মাধ্যমে এ ফিতনার আগুন প্রজ্বলিত করে। এর ফলে উম্মতের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয় এবং সেই পরিস্থিতিতেই এ দল দুটি জন্মলাভ করে। সময়ের আবর্তনে এ দল দুটির বিভক্তি ও বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

খারিজী ও শীআদের মধ্যকার যে পার্থক্য ও বিভেদ, তা ইসলামবিদ্বেষীরা উম্মতকে গভীরভাবে বিভক্ত করার মানসে করেছিল। অর্থাৎ, ইবনু সাবা ও তার অনুসারীরা নতুন অনেক বিষয়ই মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করে। তন্মধ্যে কিছু বিষয় একদলের মনমতো হয়, আর কিছু বিষয় অন্য দলের মনমতো হয়। এভাবে তারা দু-দলের মধ্যে শত্রুতা ও সংঘাত তৈরি করে, যাতে উম্মত পরস্পর বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানেও আমরা এ বীভৎস চিত্র দেখতে পাই।

https://nagorikpathagar.org

ইসলামবিদ্বেষী শক্তিগুলো সুকৌশলে মুসলমানদের নানা দলে বিভক্ত করে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করে। তারা মুসলমানদের কাউকে উদারপন্থি, কাউকে মৌলবাদী; কাউকে ওয়াহাবী, কাউকে সুন্নী; কাউকে মাযহাবী, কাউকে লা-মাযহাবী... প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করে একদলকে অপর দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রেখেছে। যারা এসবের কলকাঠি নাড়ে, তারা একজাতের লোক এবং তাদের উদ্দেশ্য একটাই, যদিও তারা নানা জায়গায় নানা রূপে ও নানা বক্তব্য নিয়ে আবির্ভূত হয়।

দুই. অনেকেই মনে করে যে, সাহাবীদের মধ্যেও বিভক্তি ছিল। এরূপ ধারণা মোটেও সঠিক নয়। তাঁদের মধ্যে কখনোই কোনো বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়নি। এটা সত্য যে, সাহাবীদের মধ্যে কিছু বিষয়ে মতভেদ ছিল; তবে তা অধিকাংশই ছিল ব্যাবহারিক কিংবা রাজনৈতিক। আকীদাগত বিষয়ে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো মতভেদ কিংবা বিভক্তি ছিল না। তদুপরি তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক যে কটি বিষয়ে মতভেদ ছিল, তাও পর্যায়ক্রমে নিরসন হয়ে যায়। এসব বিষয়ে সর্বশেষে হয় তাঁরা সকলেই ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজেদের মত ত্যাগ করেছিলেন। ব্যাবহারিক বিষয়সমূহে যে মতভেদ ছিল, তা কখনোই তাঁদের বিভক্তি ও দলাদলির দিকে নিয়ে যায়নি। সাহাবীগণ সকলেই উম্মতের জন্য অনুপম আদর্শ। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, নতুন কোনো ফিরকা তৈরি করেছিলেন, কোনো বিদআত প্রবর্তন করেছিলেন কিংবা দ্বীনের মধ্যে নতুন কোনো মত চালু করেছিলেন।

কতিপয় লোক কোনো কোনো সাহাবীর দিকে বিভক্তিমূলক কিছু কথার সম্বন্ধ তৈরি করে, আর কিছু লোক তাঁদের কারও কারও দিকে কোনো কোনো দলের সম্বন্ধ তৈরি করে। আমরা মনে করি, এ জাতীয় সম্বন্ধারোপ সঠিক নয়। এগুলো নির্জলা মিথ্যাচার ও অপবাদ। যেমন– বলা হয়, সাইয়িদুনা আলী রা. হলেন শীআ মতের উৎস; সাইয়িদুনা আবূ যার রা. হলেন সমাজতন্ত্রের উৎস; আহলুস সুফফা হলেন সূফীতত্ত্বের উৎস; আমীর মুআবিয়া রা. হলেন জবর তত্ত্বের উৎস, সাইয়িদুনা আবুদ দারদা রা. হলেন কাদরিয়া মতের উৎস ...। এসব কথা অমূলক ও অবান্তর।

উল্লেখ্য, মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাইয়িদুনা উসমান রা.-এর শাহাদাতের ঘটনার পরেই বিভক্তির রেখা ফুটে ওঠে। তাঁর জীবদ্দশায়ও তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট

https://nagorikpathagar.org

কোনো বিভক্তি দেখা যায়নি। সাইয়িদুনা আলী রা.-এর আমলে যখন মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা দেখা দেয়, তখনই খারিজী ও শীআ দল দুটি ময়দানে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়। ইতঃপূর্বে খলীফা আবূ বাকর রা. ও খলীফা উমার রা.-এর আমলে, এমনকি উসমান রা.-এর আমলেও প্রকৃত অর্থে উম্মতের মধ্যে কোনো বিভক্তি ছিল না। সাইয়িদুনা উসমান রা.-এর শাহাদাতের পরও সাহাবীগণ উম্মতের ঐক্য ধরে রাখতে এবং যেকোনোরূপ বিভক্তি রোধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এরূপ ধারণা সঠিক নয় যে, সাহাবা কিরাম রা. সে সময়কার ইফতিরাক সম্পর্কে বেখবর ছিলেন অথবা তাঁদের অজান্তেই উম্মত নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল; বরং তাঁরা তখনকার উম্মতের ইফতিরাক সম্পর্কে সম্পর্কে সদাসচেতন ছিলেন। সে সময় কোথাও যখন তাঁরা ইফতিরাকের কোনো আভাস দেখতে পেতেন, তখন তাঁরা সম্মিলিতভাবে এর মোকাবিলা করতেন এবং তাঁরা তাঁদের সাধ্যমতো তা রোধ করার চেষ্টা করতেন। তবে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাই সর্বক্ষেত্রে কার্যকর হয়।

বিভেদ সৃষ্টিকারী শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ

যুগে যুগে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক উম্মতের ঐক্য নষ্ট করে দলাদলি সৃষ্টির কাজে জঘন্য ভূমিকা রেখেছে। তাদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রে উম্মত নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একের পর এক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়। নিম্নে আমরা ইসলামের প্রাথমিক কালের বিভেদ সৃষ্টিকারী কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির নাম উল্লেখ করব এবং তাদের ভ্রান্তিসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরব।

১. আবদুল্লাহ ইবনু সাবা (মৃ. ৪০ হি.)

আবদুল্লাহ ইবনু সাবা মুসলিমদের মাঝে ভ্রান্তির বীজ বপনকারী প্রথম ব্যক্তি। সে ইবনুস সাওদা নামেও পরিচিত ছিল। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সে ছিল মূলত একজন চরম ইসলামবিদ্বেষী ইয়াহুদী। সাইয়িদুনা উসমান রা.-এর আমলে সে দৃশ্যত মুসলিম হয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোপনে নানা ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার শুরু করে। সে খুব সম্ভবত হিজরী ৩৫ সালে তার ভ্রান্ত চিন্তাগুলো মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করে। সে প্রচার করত– রাসূলুল্লাহ সা. দুনিয়াতে ঈসা আ.-এর মতো পুনরায় ফিরে আসবেন; আলী রা. হলেন তাঁর অসি, খলীফা ও ইমাম; সাহাবীগণ আলী রা.-এর প্রতি অবিচার করেছেন প্রভৃতি। সময়ের আবর্তনে তার ভ্রান্ত চিন্তাগুলো থেকে খারিজী ও শীআ মত দুটি জন্ম লাভ করে।

https://nagorikpathagar.org

২. মাবদ ইবনু আবদিল্লাহ আল-জুহানী (মৃ. ৮০ হি.)

আবদুল্লাহ ইবনু সাবার পর মাবদ আল-জুহানীই মুসলিমদের মাঝে নানা ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করে। কাদর (অদৃষ্টবাদ) সম্পর্কে সে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত। তার মতে, আল্লাহ তাআলার জ্ঞান চিরন্তন নয়। সে তাকদীর (ভাগ্য-নির্ধারণ)-কে অস্বীকার করত। খুব সম্ভবত সে হিজরী ৬৪ সালে সর্বপ্রথম বসরায় তার এ মত প্রকাশ করে। পরে মদীনায় গিয়ে সে তার এ মত ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। সে সময় মদীনায় যেসব সালাফে সালিহীন জীবিত ছিলেন, তাঁরা তার এ মতকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁকে তার এ মত প্রচারে বাধা দেন। ওই সময়ও সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা.-ও জীবিত ছিলেন। তিনি তার এ মতের জোরালো প্রতিবাদ জানান।

৩. গায়লান আদ-দিমাশকী (মৃ. ১০৫ হি.)

মাবদ আল-জুহানীর পর গায়লানের আবির্ভাব হয়। সেও কাদরের ব্যাপারে প্রায়ই মাবদের মত পোষণ করত। সে বিশ্বাস করত, ভালো-মন্দ সবকিছুই বান্দার পক্ষ থেকে হয়।[৫১] খুব সম্ভবত সে সর্বপ্রথম হিজরী ৯৮ সালে লোকদের মধ্যে তার এ মত প্রচার করে। সে আরও বলত, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার কোনো গুণ নেই। কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত আল্লাহর নাম ও গুণসমূহের নানা ব্যাখ্যা করত সে। মুরজিয়া চিন্তার একজন প্রবর্তকও ছিল সে। তার মতে, ঈমান কেবল বিশ্বাসের নাম; গুনাহ ঈমানের জন্য ক্ষতিকর নয়। সে সময়কার সালাফে সালিহীন তাঁর এ নতুন চিন্তাগুলো প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে বাধা দেন। বিশেষ করে ইসলামের পঞ্চম খলীফা উমার ইবনু আবদিল আযীয রহ. তার এই ভ্রান্ত চিন্তাগুলোর প্রতিবাদ করেন। এ সময় সে বাধ্য হয়ে নীরব হয়ে যায়। কিন্তু খলীফার মৃত্যুর পর সে আবার প্রকাশ্যে তার চিন্তাগুলো প্রচার করতে থাকে। ইমাম আওযায়ী রহ.-এর সাথে তার দীর্ঘ তর্ক-বিবাদও হয়; কিন্তু সে তার চিন্তা থেকে ফিরে আসেনি। অবশেষে তাকে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে হিজরী ১০৫ সালে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

৪. জাদ ইবনু দিরহাম (মৃ. ১২৪ হি.)

গায়লানের পর আবির্ভাব ঘটে জাদ ইবনু দিরহামের। সে তার পূর্বসূরি মাবদ ও গায়লানের একান্ত অনুসারী ছিল। সে আরও বিশ্বাস করত, কুরআন চিরন্তন নয়; মাখলূক (সৃষ্ট)। সে তার ভ্রান্ত চিন্তাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করত এবং

---

৫১. শাহরাস্তানী, *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*, খ. ১, পৃ. ১৪০

https://nagorikpathagar.org

নানা বিষয়ে সন্দেহ-সংশয় তৈরি করত। ফলে সে সময়কার সালাফে সালিহীনের মধ্যে অনেকেই তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন এবং তাকে তাওবা করতে বলেন। কিন্তু সে তাওবা করতে অস্বীকার করে। তাঁরা তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মুনাযারা করেন এবং তার বক্তব্য ও যুক্তিগুলো খণ্ডন করেন; কিন্তু সে জিদ ধরে যে, সে কোনোক্রমে তার মত থেকে ফিরে আসবে না। অবশেষে তখনকার আলিমগণ তার ফিতনা থেকে লোকদের রক্ষার জন্য তাকে হত্যা করতে ফাতওয়া দেন। অবশেষে শাসক খালিদ ইবনু আবদিল্লাহ আল-কাসরী হিজরী ১২৪ সালে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

৫. জাহম ইবনু সাফওয়ান (মৃ. ১২৮ হি.)

জাদ ইবনু দিরহামের পর কিছুদিনের জন্য এ ফিতনা বন্ধ ছিল; তবে অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই জাহম ইবনু সাফওয়ানের আবির্ভাব ঘটে। তার হাতে পুরাতন ফিতনা নতুন প্রাণ লাভ করে। সে একদিকে তার পূর্বসূরিদের সকল ভ্রান্তি প্রচার তো করতই; উপরন্তু, নতুন নতুন ভ্রান্তিও একের পর এক যোগ করেছে। তার এ ভ্রান্ত ও বিকৃত চিন্তাগুলো 'জাহমিয়্যাহ' নামে পরিচিতি পায়। সে পূর্ববর্তীদের তাতীল, তাবীল, ইরজা ও জাবর প্রভৃতি ভ্রান্ত চিন্তার পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার কালাম, ইস্তিওয়া, উলু ও দর্শন প্রভৃতি অস্বীকার করে। হিজরী ১২৮ সালে তাকে ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে বিচারকার্য শেষে মৃতুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

৬. ওয়াসিল ইবনু আতা (মৃ. ১৩১ হি.) ও আমর ইবনু উবাইদ (মৃ. ১৪৪ হি.)

জাহম ইবনু সাফওয়ানের আমলেই ওয়াসিল ইবনু আতা ও আমর ইবনু উবাইদ প্রমুখের প্রকাশ ঘটে। তারা দুজনেই ছিল মুতাযিলা চিন্তার শীর্ষ ব্যক্তি। তারা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার পরিপন্থি বহু নতুন নতুন চিন্তা প্রবর্তন করে।

অতঃপর ইসলামের ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসে বিভক্তির দ্বার সুপ্রশস্ত হয়। এ সময় নতুন নতুন ফিরকার উৎপত্তি ঘটে এবং পুরাতন ফিরকাগুলোও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। রাফিযীরা প্রকাশ্যে তাদের চিন্তাগুলো প্রচার শুরু করে এবং কালক্রমে তারা নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। রাফিযীদের থেকে মুশাব্বিহা (সাদৃশ্যবাদী)-দের উদ্ভব ঘটে। এ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেছিল দাউদ আল-জুওয়ারিবী, হিশাম ইবনুল হাকাম ও হিশাম আল-জুওয়ালিকী প্রমুখ। এরা সকলেই ছিল রাফিযী ও মুশাব্বিহাদের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ।

https://nagorikpathagar.org

এরপর ইসলামে কুল্লাবিয়াহ, আশআরিয়্যাহ ও মাতুরিদিয়্যাহ প্রভৃতি কালাম সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এরপর আসে সূফী ও দার্শনিকশ্রেণি। এভাবে ইসলামের ইতিহাসে বিভক্তির নানা ধারা জোরালো হয় এবং কালক্রমে প্রত্যেক ধারার মধ্যে কমবেশি নানা ভ্রান্তি ও বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটে। অধিকন্তু, বিভক্তির এ ধারা অদ্যাবধি চালু রয়েছে। বর্তমানেও ইসলামে দিনদিন নতুন নতুন বিদআত ও চিন্তা যুক্ত হতে চলেছে এবং মুসলমানগণ নিজেদের স্বার্থ ও ইচ্ছেমতো নতুন নতুন দল-উপদল তৈরি করে চলছে।

বর্তমানে– অজ্ঞতাবশত হোক কিংবা ছলনাবশত হোক– অনেক মুসলিমই, এমনকি অনেক আলিমও দাবি করে থাকেন, এখন আর প্রাচীন ফিরকাগুলোর অস্তিত্ব নেই; এগুলো কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। এরূপ ধারণা মোটের ওপর সঠিক নয়; বরং পূর্বের বড়ো ও মারাত্মক ফিরকাগুলোর চিন্তাধারা বর্তমানে বিদ্যমান তো আছেই; বরং দিনদিন এগুলো প্রসারিত হচ্ছে এবং সাথে সাথে এগুলোর ভ্রান্তি ও সংক্রমণও ভয়াবহ রূপ লাভ করছে। তবে এটা সত্য যে, বহু ফিরকা হয়তো নিজস্ব নামে ও পরিচয়ে বর্তমানে নেই; কিন্তু এসব ফিরকার (যেমন– খারিজী, জাহমিয়্যাহ, কাদরিয়্যাহ, মুতাযিলা, মুতাকাল্লিম, সূফী ও দার্শনিকশ্রেণি প্রভৃতির) বহু মারাত্মক চিন্তাধারা আমাদের মধ্যে নানাভাবে অনুপ্রবেশ করছে এবং কোনো না কোনো শ্রেণির মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছে।

ইফতিরাকের প্রধান প্রধান কারণ

১. জ্ঞানের উৎস নির্ধারণে মতভেদ

আকীদাগত ইফতিরাকের একটি প্রধান কারণ হলো, আকীদাগত জ্ঞান লাভের উৎসসংক্রান্ত মতভেদ। ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, আকীদার ক্ষেত্রে জ্ঞানলাভের একমাত্র প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য উৎস হলো ওহী তথা কুরআন ও হাদীস। কিন্তু কালক্রমে মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে কেউ কেউ কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি আকল অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন, আর কেউ কাশফ ও ইলহামের ওপর গুরুত্বারোপ করেন, কেউ আবার ব্যক্তিবিশেষের মত বা প্রচলিত ধ্যানধারণার ওপর নির্ভর করেন। ফলে আকীদাগত বহু বিষয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং ক্রমে এ মতপার্থক্য বাড়তে বাড়তে নানা দল ও চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে।

https://nagorikpathagar.org

২. কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যায় মতভেদ

রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তিকালের পর নানা কারণে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য শুরু হয় এবং কালক্রমে তা বাড়তে থাকে। কেউ কেউ কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্যকে গ্রহণ করে থাকে এবং তারা একে একটি বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা করে সেই ব্যাখ্যাকেই তাদের আকীদার মূলভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত করে আর এর ভিত্তিতে সুস্পষ্ট নির্দেশনাগুলোর ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা করে বাতিল করে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ আলিমগণ কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যগুলোকেই আকীদার মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এগুলোর আলোকে অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্যসমূহের ব্যাখ্যা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

"যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা ফিতনা-ফ্যাসাদ (সৃষ্টি করে) এবং (আল্লাহর কিতাবের অপ-)ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এসব (অস্পষ্ট) আয়াত থেকে কিছু অংশের অনুসরণ করে। (মূলত) এসব (অস্পষ্ট) বিষয়ের ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।..."[৫২]

সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি খারিজীদের প্রসঙ্গে বলেন, يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه-"তারা কুরআনের মুহকাম আয়াতের প্রতি ঈমান রাখে; কিন্তু তারা মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়।"[৫৩]

আবার অনেকেই নিজ নিজ চিন্তা ও মতকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও কুরআন ও হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করতে থাকে এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজের ব্যাখ্যাকেই অভ্রান্ত এবং প্রতিপক্ষের ব্যাখ্যকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে। এভাবে ইসলামে নানা চিন্তা ও মতের উদ্ভব ঘটে।

---

৫২. আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলে ইমরান) : ৭

৫৩. তাবারী, *জামিউল বায়ান*, খ. ৬. পৃ. ১৯৮

https://nagorikpathagar.org

৩. তাত্ত্বিক বিতর্ক

কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনাসমূহের অনুসরণই মুখ্য বিষয়; এসব নিয়ে বিজ্ঞজনদের মধ্যে মতবিনিময় ও আলোচনা হতে পারে; তবে বিতর্ক কাম্য নয়। কিন্তু মানবীয় প্রকৃতি কাজের চেয়ে বিতর্ককেই বেশি ভালোবাসে। আর এ বিতর্ক উম্মতের মধ্যে দ্রুত ও প্রবলভাবে বিভক্তি ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর উপলক্ষ্য হয়। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহ মূলত ঐশী নির্দেশনা, এক্ষেত্রে মানবীয় বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর বিতর্ক কোনো চূড়ান্ত সমাধান বয়ে আনতে পারে না। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, المنازعة في الدين بدعة.-"দ্বীনের বিষয়ে তর্ক-বিবাদ করা বিদআত।"[৫৪]

এ কথা সত্য যে, দলীল-প্রমাণভিত্তিক মতবিনিময় ও আলোচনা-পর্যালোচনা জ্ঞানের পথ সুগম করে। মতবিনিময়ের মাধ্যমে আলোচকদের অজ্ঞতা বা ভুল দূর হয় এবং নতুন অনেক বিষয় জানা যায়। কিন্তু বিতর্ক সেরূপ নয়। বিতর্কের সময় সাধারণত প্রত্যেকেই নিজে একটি মত গ্রহণ করে এবং যেকোনোভাবে তার মতটিই প্রমাণের চেষ্টা করে। নিজ মতের দুর্বলতা ধরা পড়লেও তা স্বীকার করতে রাজি হয় না। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সা. বিভিন্ন হাদীসে পবিত্র কুরআন নিয়ে কোনোরূপ বিতর্ক করতে নিষেধ করেছেন। যেমন– আবূ উমামাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

﴿مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾

"কোনো জাতি হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার পরে বিভ্রান্ত হওয়ার একটিই কারণ, তা হলো– তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়।" রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সা. এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন– "এরা কেবল বিতর্কের উদ্দেশ্যে এসব কথা উপস্থাপন করে। উপরন্তু, এরা তো কলহপরায়ণ সম্প্রদায়ই বটে।"[৫৫]

---

৫৪. মুল্লা আল-কারী, *শারহুল ফিকহিল আকবার*, পৃ. ১৭

৫৫. তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আত-তাফসীর, পরিচ্ছেদ : সূরাতুয যুখরুফ, হা. নং : ৩২৫৩

https://nagorikpathagar.org

৪. কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে থাকা

ইফতিরাকের অপর একটি প্রধান কারণ হলো– কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া। পূর্ববর্তী জাতিগুলো আল্লাহপ্রদত্ত ওহী থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে যেমন তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা, বিভক্তি ও দলাদলি তৈরি হয়েছিল, তেমনি মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার শত্রুতা, বিভক্তি ও দলাদলির পেছনেও এ কারণটিই বহুলাংশে দায়ী। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জনসাধারণ দূরে সরে থাকার ক্ষেত্রে ভ্রান্ত দলের বিদ্বানগণ সাধারণত যা করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

ক. সাধারণ জনগণের পক্ষে কুরআন ও হাদীস বোঝা সম্ভব নয় কিংবা ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারও কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করার অধিকার নেই– প্রভৃতি কথা বলে জনগণকে কুরআন ও হাদীসের অনুধাবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

খ. কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যাধর্মী বক্তব্যসমূহের ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের মতামত বা ব্যাখ্যাকে অভ্রান্ত বা একমাত্র ব্যাখ্যা বলে গণ্য করা এবং একে চেতনে বা অবচেতনে ওহীর সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া।

গ. বিভিন্ন কথা রচনা করে হাদীসের নামে চালানো কিংবা দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াতগুলোকে আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা।

ঘ. কুরআন ও হাদীসের বিপরীতে ব্যক্তিবিশেষের মতামত ও তার পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ. وَقَالَ عَمْرٌو « الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ».

"...অচিরেই আমার উম্মত থেকে এমন কিছু জনগোষ্ঠী বের হবে, যাদের মধ্যে ওসব প্রবৃত্তি (-তাড়িত চিন্তার) অনুসরণ এমনভাবে প্রবেশ করবে, যেমন কুকুরে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের প্রচণ্ড আতঙ্ক প্রবেশ করে।" রাবী আমর রহ. বলেন– "তার দেহের সকল শিরা-উপশিরা ও অস্থিসন্ধিতে তা প্রবেশ করে।"[৫৬]

---

৫৬. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আস-সুন্নাহ, পরিচ্ছেদ : শারহুস সুন্নাহ, হা. নং : ৪৫৯৯। হাদীসটি হাসান।

https://nagorikpathagar.org

ঙ. নিজের বা নিজের দলের মতামতকেই চূড়ান্ত মনে করা। যেমন– খারিজীরা কুরআন ও হাদীস বিশ্বাস করত বটে; কিন্তু এগুলোর নির্দেশনা বোঝার ক্ষেত্রে নিজেদের মতকেই একান্ত চূড়ান্ত মনে করত এবং তাদের বাইরের মত প্রকাশকারীকে ঢালাওভাবে অবজ্ঞা করত। এভাবে কুরআন ও হাদীসের যে মর্ম সাহাবীগণ অনুধাবন করেছিলেন, ক্ষেত্রবিশেষে তা থেকে তারা বিচ্যুত হয় এবং দলাদলিতে লিপ্ত হয়।

৫. বিদআত ও ভ্রান্তির ব্যাপারে নমনীয়তা

সমাজে প্রচলিত নানা বিদআত ও ভ্রান্তির ব্যাপারে নমনীয়তা প্রদর্শনও বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টির অন্যতম কারণ। অনেক সময় দেখা যায়, কোথাও একটি বিদআত বা ভ্রান্তি প্রকাশ পায়। কিন্তু সেখানকার আলিমগণ কখনও তা বুঝতে পেরেও সময়মতো তা গুরুত্ব দেন না, নীরবে সহ্য করে যান, কোনোরূপ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন না। ফলে সময়ের আবর্তনে সেই বিদআত ও ভ্রান্তি বাড়তে থাকে, দৃঢ় হতে থাকে এবং লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে সেখানে ক্রমশ একের পর এক বিদআত ও ভ্রান্তি শিকড় গেড়ে বসে এবং একপর্যায়ে এসব বিদআত ও ভ্রান্তির অনুবর্তীরা একত্রিত হয়ে জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কখনও আবার তারা পৃথক ফিরকায়ও পরিণত হয়। ইতিহাসে ইফতিরাকের বীজ প্রায়ই এ ক্রমধারায় উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করেছে।

৬. দ্বীনের ব্যাপারে অযাচিত কড়াকড়ি (التشدد)

দলাদলি ও বিভক্তির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো– দ্বীনের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ, কট্টরতা। এখানে কড়াকড়ি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– দ্বীনী বিধিনিষেধ পালনের ব্যাপারে নিজের ওপর কিংবা মানুষের ওপর অযাচিত চাপ তৈরি করা, কঠোরতা আরোপ করা কিংবা লোকদের সাথে রূঢ় আচরণ করা– যা শরীয়তের নীতিমালা ও উদ্দেশ্যাবলির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

আমরা শরীয়তের মূল বিধিনিষেধসমূহ যথানিয়মে সাধ্যানুযায়ী পালন করব; সাথে ক্ষেত্রবিশেষে প্রযোজ্য রুখসাত (ছাড়)গুলো মেনে চলব, শরীয়তের সহজীকরণ ও কষ্ট দূরীভূতকরণের নীতিগুলোর প্রতি লক্ষ রাখব, সন্দেহ-সংশয় থাকলে দণ্ডবিধি মওকুফ করব, উপরন্তু লোকদের প্রতি সুধারণা পোষণ করব, তাদের সাথে ন্যায়ানুগ আচরণ করব, তাদের প্রতি দরদি ও দয়াপরবশ হব,

https://nagorikpathagar.org

তাদের যথাসম্ভব ক্ষমা করব, তাদের সমস্যাগুলো জানতে চাইব প্রভৃতিই হলো আমাদের প্রতি দ্বীনের একান্ত দাবি। বড়ো ধরনের কোনো কল্যাণসাধন কিংবা জনস্বার্থ রক্ষা ব্যতীত দ্বীনের এ দাবি লঙ্ঘন করা কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির নামান্তর। কুরআন ও হাদীসে নানাভাবে দ্বীনের ব্যাপারে সহজতা অবলম্বন এবং বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা পরিহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাথে (তোমাদের কাজকর্মকে) সহজ করে দিতে চান। তিনি কখনোই তোমাদের (কাজকর্মকে) কঠোর করে দিতে চান না।"[৫৭]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا.

"নিশ্চয় দ্বীন হলো সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে, দ্বীন তার ওপর বিজয়ী হয়। (অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের সামর্থ্যের বাইরে কষ্ট করতে প্রবৃত্ত হয়, দ্বীন তাকে সহজ ও ভারসাম্যপূর্ণ পথে পরিচালিত করে।) কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং (মধ্যপন্থার) নিকটবর্তী থাকো (যদি মধ্যপন্থা অবলম্বন করা সম্ভব না হয়), আশান্বিত থাকো ...।"[৫৮]

কেউ এ প্রশ্ন করতে পারে, (নিন্দনীয়) কড়াকড়ি ও (রীতিসিদ্ধ) শরীয়াহ প্রতিপালনের মধ্যে আমরা কীভাবে পার্থক্য করব? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি– এক্ষেত্রে আমাদের জন্য একান্ত অনুসরণীয় হলো, রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুপম শিক্ষা। তিনিই হলেন আমাদের সকলের জন্য সর্বোচ্চ আদর্শ। সাহাবা কিরাম, তাবিউন ও ন্যায়নিষ্ঠ ইমামগণ সকলেই সর্বক্ষেত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। বর্তমানেও আমরা নিম্নোক্ত মানদণ্ডসমূহের মাধ্যমে আমাদের আমলের যথার্থতা নির্ধারণ করতে পারি; পরখ করতে পারি– আমরা কারা তাঁর সুন্নাতের ওপর বিদ্যমান আছি আর কারা কড়াকড়ি করছি?

---

৫৭. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) : ১৮৫

৫৮. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : আদদ্বীন ইয়ুসরুন, হা. নং : ৩৯

https://nagorikpathagar.org

ক. সালাফের অনুপস্থিতিতে বর্তমানে সামসময়িক ন্যায়নিষ্ঠ শুদ্ধাচারী আলিমগণ হলেন আমাদের জন্য জীবন্ত আদর্শ। আমাদের যথাসম্ভব সকল ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ করে চলতে হবে। কাজেই যেসব লোক শরীয়তের বিধিনিষেধ পালন এবং আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তাঁদের চেয়ে আগে বাড়ে কিংবা কমতি করে, তারা নীতিচ্যুত, ভারসাম্যহীন। হয়তো তারা কট্টর (متشدد), যদি তারা আগে বাড়ে; অথবা ত্রুটিকারী (مقصر), যদি তারা কমতি করে।

খ. কট্টরতার আরেকটি চিহ্ন হলো– দ্বীনের নানা বিষয়ে যথাসম্ভব সহজ নীতি অনুসরণ না করা এবং মুসলমানদের অযাচিত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পতিত করা। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই সেসব মুসলিম– যারা সুন্নাতের ওপর জীবনধারণ করেন; পাপাচারী ও বদদ্বীনরা উদ্দেশ্য নয়। কাজেই নিতান্ত জরুরতের সময়ও যারা দ্বীনের বিধিবিধান পালনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের কষ্টের মধ্যে ফেলে দেন কিংবা তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেন এবং সহজ পথে অগ্রসর হন না, তাঁরা বড্ড কট্টর, কড়াকড়িকারী (متشدد)।

গ. কট্টরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি হলো– ব্যক্তিবিশেষকে তার কথা বা কাজের জন্য দ্রুত ফাতওয়া দান করা। অনেক সময় দেখা যায়, কেউ কারও সম্পর্কে কোনো কথা শুনল বা কোনো সংবাদ জানল অথবা কোনো ঘটনা অবহিত হলো, তৎক্ষণাৎ সে যাচাই-বাছাই না করে কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণ ছাড়াই তার বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিয়ে দেয় যে, সে কাফির, ভ্রান্ত, বিদআতী প্রভৃতি। এভাবে যে কাউকে দ্রুত ফাতওয়াদানের প্রবণতা দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও কট্টরতার পরিচায়ক।

ঘ. কট্টরতার অপর একটি অভিব্যক্তি হলো– শরীয়তে যেসব বিষয়ে ইখতিলাফের অবকাশ রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে বিরোধী মতাবলম্বীদের খারাপ জানা, হিংসা করা এবং তাদের সাথে সুন্দর আচরণ না করা।

এরূপ কড়াকড়িই ইফতিরাকের একটি প্রধান কারণ। ইসলামের ইতিহাসে খারিজীরাই সর্বপ্রথম দ্বীনের ব্যাপারে এ কড়াকড়ি শুরু করে এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

https://nagorikpathagar.org

৭. নিজস্ব চিন্তা ও অধ্যয়নের ওপর একান্ত নির্ভরতা

দলাদলি ও বিভক্তির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো– ইমাম ও শাইখগণের স্বীকৃত ইজতিহাদ ও চিন্তাধারার পরিবর্তে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, গবেষণা ও অধ্যয়নের ওপর একান্ত নির্ভরতা। মুসলিমমাত্রই কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করবে এবং ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা করবে– এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় ও কাম্য। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ব্যক্তি নিজের চিন্তা-গবেষণা ও উপলব্ধিকে একান্ত হক ও চূড়ান্ত মনে করা এবং কেবল নিজের অধ্যয়ন ও উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা সমীচীন নয়। অথচ লক্ষ করা যায়, একশ্রেণির শিক্ষিত লোক বিজ্ঞ আলিমগণের সহায়তা ব্যতীত নিজস্ব উদ্যোগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে এবং এভাবে অনেক ইলমও অর্জন করে। কিন্তু তাদের কেউ কেউ ক্রমে এতই আত্মবিশ্বাসী ও অহংকারী হয়ে ওঠে যে, সত্যনিষ্ঠ শুদ্ধাচারী বিজ্ঞ আলিমগণের স্বীকৃত ইজতিহাদ ও চিন্তাধারার পরিবর্তে নিজস্ব অধ্যয়ন ও জ্ঞান-গবেষণাকে যথেষ্ট মনে করে; এমনকি তাদের কেউ কেউ নিজের চিন্তা ও উপলব্ধিকেই চূড়ান্ত মনে করে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ আলিমগণের চিন্তাধারা ও রীতিনীতির ইত্তিবা (অনুকরণ)-কে তাকলীদ (অন্ধ অনুকরণ) বলে হেয় করে, আর যারা এরূপ ইত্তিবা করে, তাদের তারা অনুদার, গোঁড়া কিংবা সংকীর্ণ প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করে। তাদের কথা হলো–

> "ইমাম ও শাইখগণের অনুকরণ হলো প্রকারান্তরে তাকলীদই। আর দ্বীনের ক্ষেত্রে কারও তাকলীদ করা জায়িয নয়। তাঁরাও মানুষ, আমরাও মানুষ। কাজেই তারা যেমন ইজতিহাদ করে আমল করেছেন, তেমনি আমাদেরও উচিত হলো ইজতিহাদ করে চলা। এখন আমরা নানা বইপুস্তক পাচ্ছি– যা আগে পাওয়া দুষ্কর ছিল। তা ছাড়া বর্তমানে জ্ঞানলাভের নানা উপায়-উপকরণও প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য। কাজেই আমাদের দ্বীনী ইলম কেবল আলিম ও শাইখদের নিকট থেকে সরাসরি শিখতে হবে কেন?! বরং আলিম ও শাইখদের নিকট থেকে ইলম অর্জনের মানে হলো তাদের তাকলীদ করা। আর তাকলীদ হলো একটি অবান্তর বিষয়।"

এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো– যদিও মেনে নিই যে তাকলীদ অবান্তর এবং ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নেই; কিন্তু অনেকেই জানে না, তাকলীদ বলতে আসলে কী বোঝায় এবং তাকলীদ ও ইত্তিবা-এর মধ্যে পার্থক্য কী? উল্লেখ্য যে, তাকলীদ ও ইত্তিবা-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে

https://nagorikpathagar.org

ইত্তিবা (বিজ্ঞ আলিমদের অনুসরণ) ওয়াজিব। কেননা, সর্বসাধারণ এমনকি অনেক আলিমও ইজতিহাদের নিয়ম ও পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা রাখেন না; আবার দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জনের বিশুদ্ধ পথ সম্পর্কেও অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই। এরূপ অবস্থায় তারা কাদের কাছ থেকে সঠিক ইলম অর্জন করবে? কীভাবে তারা সালাফে সালিহীন ও ইমামগণের অনুসৃত মানহাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে? তাদের পক্ষে দ্বীনের বিশুদ্ধ ইলম লাভ করা সম্ভব নয়, যে যাবৎ-না তারা বিজ্ঞ আলিমগণের ছাত্রত্ব, নির্দেশনা ও সান্নিধ্য লাভ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"অতএব, তোমরা জ্ঞানীদের নিকট থেকে জেনে নাও, যদি তোমরা না জানো।"[৫৯]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সর্বসাধারণ– যাদের ইলম নেই, তাদেরকে আলিমদের থেকে জেনে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। অধিকন্তু, প্রত্যেক ইত্তিবাই তাকলীদ নয়। যদি আলিমগণের কোনোরূপ ইত্তিবাই জায়িয না হয়, তবে অবস্থা দাঁড়াবে– প্রত্যেক লোক নিজেই নিজের ইমাম এবং এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই এক একটি ফিরকায় পরিণত হবে এবং যত লোক তত ফিরকা হবে। অতএব, কোনোরূপ ইত্তিবা জায়িয না হওয়ার কথাটি নিঃসন্দেহে অমূলক। কারণ, দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বুদ্ধি-বিবেচনার ভিত্তিতে ইমামগণের ইত্তিবা কোনোক্রমেই তাকলীদের পর্যায়ভুক্ত নয়। তাকলীদ হলো কারও কথা দলীল-প্রমাণ ছাড়াই কেবল সুধারণাবশত গ্রহণ করা ও আমল করা; অন্ধ অনুকরণ।

মারাত্মক ব্যাপার হলো– ইলম অর্জনের জন্য কেবল আধুনিক উপায়-উপকরণের শিষ্যত্বের ওপর সন্তুষ্ট থাকা এবং নিজেকে শাইখ হিসেবে জাহির করার প্রবণতা। অর্থাৎ, এ জাতীয় লোকদের অনেকেই কেবল বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য আধুনিক উপায়-উপকরণ থেকে ইলম অর্জন করে এবং এর ওপরই সন্তুষ্ট থাকে। এদের সাথে সমাজের অন্য লোকদের সংশ্রব থাকে খুবই কম, বিজ্ঞ আলিমগণ থেকেও তারা দূরে অবস্থান করে, শুদ্ধাচারী দাঈদের সাথেও তাদের বনিবনা থাকে না। তাদের কেউ কেউ এরূপ কথাও বলে, আমরা বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা ও অডিও-ভিডিও নানা উপকরণ থেকে ইলম

---

৫৯. আল-কুরআন, ১৬ (সূরা আন-নাহল) : ৪৩; ২১ (সূরা আল-আম্বিয়া) : ৭

https://nagorikpathagar.org

অর্জন করছি। এ প্রসঙ্গে আমাদের কথা হলো– এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জ্ঞানলাভের আধুনিক উপায়-উপকরণগুলো আমাদের জন্য অবশ্যই জ্ঞান আহরণের পথকে সুগম করেছে। এটি আমাদের জন্য বিরাট নিয়ামত; কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এসব উপায়-উপকরণ যেমন আমাদের জন্য উপকারী, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে অনেকের জন্য ক্ষতির কারণও হতে পারে। কেননা, দ্বীনের জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলিমগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ ব্যতীত কেবল বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা ও আধুনিক অন্যান্য উপায়-উপকরণের ওপর একান্ত নির্ভর করা নিরাপদ পথ নয়। এ পথে যেকোনো সময় পদস্খলন ঘটতে পারে। যেমন– কেউ যদি নিজে নিজে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইপুস্তক অধ্যয়ন করে, তাকে কেউ ডাক্তার বলে না এবং তার পক্ষে ডাক্তারি করাও নিরাপদ নয়। এরূপ ব্যক্তির চিকিৎসা অনেক ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনতে পারে। অধিকন্তু, নিজস্ব চিন্তা ও অধ্যয়নের ওপর একান্ত নির্ভরতা অনেক সময় উম্মতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি বাড়াতে পারে। এরূপ আশঙ্কাও রয়েছে যে, অনেক স্বার্থান্বেষী কিংবা বিকৃত চিন্তার লোক শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যাবলির জ্ঞান ছাড়াই কুরআন, হাদীস ও ইসলামী বইপুস্তক অধ্যয়ন করবে এবং তারা নিজেদের মনন, রুচি, প্রবৃত্তি ও স্বার্থানুসারে তা ব্যাখ্যা করবে। আর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তারা বিজ্ঞ আলিমগণের সাথে মতানৈক্যে লিপ্ত হবে, তাঁদের মতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করবে।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

يَرِثُ/يحمل هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ.

"এই ইলমের উত্তরাধিকারী হবে প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মের ন্যায়নিষ্ঠ বিশ্বস্ত লোকেরা। এঁরা এই ইলমকে জাহিলদের (অবিবেচনাপ্রসূত) ব্যাখ্যা, বাতিলপন্থি বিভ্রান্ত লোকদের মিথ্যাচার ও অমূলক বক্তব্য এবং সীমালঙ্ঘনকারী বিদআতীদের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করবে।"[৬০]

---

৬০. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং : ২১৪৩৯; তাবারানী, *মুসনাদুশ শামিয়ীন*, হা. নং : ৫৯৯; তাহাবী, *মুশকালুল আছার*, হা. নং : ৩২৬৯। হাদীসটি সহীহ (তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, তাহকীক : নাসিরুদ্দীন আলবানী, হা. নং : ২৪৮)

https://nagorikpathagar.org

মানুষ যতই মেধাবী, দক্ষ ও উপযুক্ত হোক না কেন, তার একজনের পক্ষে দ্বীনের অনেক বিষয়ে সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়– যতক্ষণ না সে সালাফ ও সামসময়িক বিজ্ঞ আলিমগণের মতামতকে বিবেচনায় না নেয়। অনুরূপভাবে একজনের পক্ষে জ্ঞানের জটিল বিষয়সমূহে এবং উম্মতের নানাবিধ সমস্যায় সুষ্ঠু শারঈ সমাধান দেওয়াও সম্ভব নয়।

আমরা এ কথা স্বীকার করি যে, কিছু কিছু বিদ্বান লোক বইপুস্তক অধ্যয়ন করে দ্বীনের প্রচুর জ্ঞান লাভ করে; এমনকি তাদের কারও কারও কাছে বিস্ময়কর ও হৃদয়গ্রাহী অনেক তথ্যও থাকে– যা অনেক সময় লোকদের বিস্ময়াভিভূত করে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, তাদের কাছে না থাকে শরীয়তের উসূল ও মূলনীতিসংক্রান্ত পর্যাপ্ত জ্ঞান, না থাকে দলীলসমূহের মধ্যে পরখ করার জ্ঞান, না থাকে দলীলসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও আমলের প্রকৃতি নিরূপণগত জ্ঞান এবং সালাফ ও সত্যনিষ্ঠ ইমামগণের অনুসৃত পদ্ধতিগত জ্ঞান। এতৎসত্ত্বেও তারা তাদের সীমিত অধ্যয়ন ও গবেষণার আলোকে দ্বীনের যেকোনো বিষয়ে কথা বলতে প্রবৃত্ত হয়, নতুন যেকোনো সমস্যা ও পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত পেশ করে। দুঃখের ব্যাপার হলো– এ জাতীয় লোকেরা সব জায়গায় কিছু সমর্থক ও সহযোগী পেয়ে যায়। ফলে ক্রমে তাদের দলবল ভারী হতে থাকে। এভাবে তারা সময়ের আবর্তনে জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পৃথক দল বা চিন্তাগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

৮. হিংসা-বিদ্বেষ ও জিদ

পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ ও জিদও বিভক্তির অন্যতম কারণ। আল্লাহ তাআলা কাউকে বিশেষ কোনো নিয়ামত দান করলে অনেকের মধ্যে তা নিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ দানা বাঁধে। সমকক্ষদের মধ্যে এ হিংসা-বিদ্বেষ বেশি লক্ষ করা যায়। এ কারণে একজন ডাক্তার অন্য ডাক্তারের বিরুদ্ধে, একজন প্রকৌশলী অন্য প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে, একজন লেখক অন্য লেখকের বিরুদ্ধে হিংসাপ্রবণ হতে দেখা যায়। একই কারণে কিছু কিছু আলিমদের মধ্যেও এ বদচরিত্র প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। তারা সাধারণত একে অপরের প্রতি খুবই হিংসুটে ও অসহিষ্ণু হয়ে থাকেন। এ কারণে অনেক বিশিষ্ট ফকীহর মতে, প্রতিযোগিতাপ্রবণ একই শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে অন্য জনের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন, ইমাম মালিক রহ.-এর বিশিষ্ট শিষ্য আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াহব [১২৫-১৯৭ হি.] রহ. বলেন–

https://nagorikpathagar.org

لا يجوز شهادة القارئ على القارئ يعنى العلماء لأنهم أشد الناس تحاسدا وتباغيا

"আলিমগণের একজনের বিরুদ্ধে অন্য জনের সাক্ষ্য বৈধ হবে না। কারণ, তারা চরম ঈর্ষাপরায়ণ হন, পরস্পর একে অপরের প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি হিংসা-বিদ্বেষ লালন করে থাকেন।"

মালিক ইবনু দীনার [মৃ. ১৩১ হি.] ও সুফইয়ান আস-সাওরী [৯৭-১৬১ হি.] রহ. প্রমুখ থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত রয়েছে।[৬১]

সাধারণত দেখা যায়, এ সকল হিংসাপরায়ণ আলিমদের কোনো বিষয়ে কোনোভাবেই পরিতৃপ্ত করা সম্ভব হয় না। তারা নিজেদের মতের বিপক্ষে কোনো যুক্তি বা প্রমাণ মেনে নিতে চায় না; বরং নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনড় অবস্থান গ্রহণ করে থাকে। কারও কথা মেনে নিতে তারা মোটেও অভ্যস্ত নয়। ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান আলিমদের চরিত্রও এরূপ ছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾

"অতঃপর যখন তাদের নিকট এলো– যা তারা চিনতেও পারল, তখন তারা অস্বীকার করল।"[৬২]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নানা বিষয়ে মতপার্থক্য থাকাটা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই অন্য সকল বিষয়ের মতো আকীদাগত বিষয়েও মতপার্থক্য হতে পারে। কিন্তু দুটি বৈশিষ্ট্য থাকলেই এরূপ মতপার্থক্য নিরসন হয়ে যেতে পারে অথবা মতপার্থক্যের তীব্রতা হ্রাস পেতে পারে এবং মতপার্থক্যসহ ঐক্যবদ্ধ থাকা যায়। এ দুটি বৈশিষ্ট্য হলো :

এক. কুরআন ও হাদীসের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। মতপার্থক্যকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যদি কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে সরাসরি যা জানা যায়,

---

৬১. সুবকী, তাজউদ্দীন, *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৯; ইবনু হাজার, *আত-তালখীসুল হাবীর...*, খ. ১, পৃ. ৩১

৬২. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) : ৮৯

https://nagorikpathagar.org

সেটুকুকে আসল ও প্রধান ধরে এগুলোর অতিরিক্ত বিষয়গুলোকে অমৌলিক ও মতভেদযোগ্য বিষয়রূপে গণ্য করেন, তবে মতপার্থক্যের তীব্রতা হ্রাস পেয়ে যায়।

দুই. পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। এ বৈশিষ্ট্যটি পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে।

আমাদের পূর্বসূরি সাহাবী ও তাবিঈগণ এবং সর্বসমাদৃত ইমামগণের মধ্যে এ দুটি বৈশিষ্ট্য প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকার কারণে তাঁরা তাঁদের মধ্যকার মতপার্থক্যগুলো সহজভাবে নিতেন এবং এ কারণে তাঁদের মতপার্থক্যগুলো কখনোই বিভক্তি ও দলাদলির পর্যায়ে পৌঁছেনি। পাশাপাশি তাঁরা বিচ্ছিন্ন ফিরকাসমূহের বিচ্ছিন্ন মতগুলোকেও যথাসম্ভব সহজ করে দেখতেন। তাঁরা তাদের 'ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত' ও 'বিভ্রান্তির শিকার' বললেও সাধারণত 'কাফির' অভিধায় ভূষিত করতেন না, যে যাবৎ-না তারা দ্বীনের অকাট্য ও সুস্পষ্ট কোনো বিষয় অস্বীকার করত।

কিন্তু আফসোসের বিষয়, পরবর্তীকালে অধিকাংশ মুসলিমই তাঁদের সেই বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে ফেলে। তারা ছুটতে থাকে খ্যাতির পেছনে এবং ধন-মান-পদপদবিতে একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্বলাভ তাদের মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। ফলে তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, অহমিকা ও জিদ প্রভৃতির মতো ঘৃণ্য চরিত্রগুলো প্রকাশ পায় এবং এ কারণে তারা তাদের মধ্যকার মতপার্থক্যগুলো সহজভাবে তো নিতেই পারে না; উপরন্তু এগুলো তাদের বিভক্তি ও দলাদলির পর্যায়ে নিয়ে যায়। অতীতে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরাও একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করত, একে অপরের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করত। এ কারণে তারাও আল্লাহর কিতাব নিয়ে পরস্পর মতপার্থক্যে লিপ্ত হয় এবং নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾

"যাদের (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা (এ কিতাব থেকে বিচ্যুত হয়ে) নিজেরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে (বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে) মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।"[৬৩]

৬৩. আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলে ইমরান) : ১৯

https://nagorikpathagar.org

অন্য আয়াতে তিনি বলেন–

﴿وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾

"দ্বীনসংক্রান্ত বিষয়গুলো আমি তাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। অতঃপর যে মতপার্থক্য তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে, তা (কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে নয়; বরং তা) ছিল তাদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও জিদের কারণে।"[৬৪]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট জানা যায়, আহলে কিতাবের আলিমরাও পরস্পর মতপার্থক্য করত, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হতো। এর কারণ এ ছিল না যে, তাদের মধ্যে ইলমের কমতি ছিল; বরং পারস্পরিক ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার নির্দেশনামূলক ইলম তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণেই মজুত ছিল। বস্তুতপক্ষে তাদের মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণ ছিল– পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, জিদ ও হঠকারিতা। অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার হলো, আমাদের আলিমগণের মধ্যকার অনেকেই আহলে কিতাবের আলিমদের মতোই একই ব্যাধিতে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। তাঁরাও পরস্পর মতপার্থক্য করতে গিয়ে একজন অপরজনের ওপর যে বাড়াবাড়ি করছেন, পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে, তা তাঁদের ইলমের কমতি কারণে নয়; তাঁদের মধ্যে বহু বড়ো বড়ো আলিম ও শায়খও রয়েছেন। বরং এর মূল কারণ তা-ই, যা আহলে কিতাবের আলিমদের মতপার্থক্যের পেছনে কার্যকর ছিল। অর্থাৎ, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, জিদ ও হঠকারিতা।

৯. নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব

রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তিকালের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সমগ্র আরব দেশ, শাম, উত্তর আফ্রিকা ও পারস্যের অধিকাংশ জনগণ ইসলাম গ্রহণ করে। এদের অনেকেরই সাহাবী ও তাবিঈগণের সুহবত লাভের সৌভাগ্য হয়নি। ফলে একদিকে ইসলামের মূল প্রেরণা ও বিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে, অপরদিকে তারা দীর্ঘদিন থেকে যে চিন্তা ও মতামত লালন করে আসছিল, তা তাদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ কারণে তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের অনেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি

৬৪. আল-কুরআন, ৪৫ (সূরা আল-জাসিয়া) : ১৭

https://nagorikpathagar.org

অনুসারে নিজেদের দীর্ঘদিনের লালিত চিন্তা-দর্শন, সংস্কৃতি ও লোকাচারের অনেক কিছুই ইসলামে একীভূত করার চেষ্টা করে এবং ইসলামী চিন্তা-বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিতর্ক শুরু করে। এভাবে তাদের মধ্যে নানা চিন্তা ও মতামত গড়ে ওঠে, যা নতুন নতুন দল-উপদল তৈরি করে।

তদুপরি প্রথমদিকে মুসলিমরা ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের ওপর একান্তই নির্ভর করত এবং এ দুটি উৎসে যা কিছু পেত, তা সহজভাবে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করত; কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে অনেকেই ইসলামকে নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে শুরু করে। তখন অনেকের মধ্যে এ প্রবণতাও প্রবলভাবে দেখা দেয়, ধর্ম হিসেবে ইসলামকে বুদ্ধিবিবেকসম্মত করা এবং একটি যৌক্তিক বিধানের ওপর দাঁড় করানো। এ পর্যায়ে তারা ইসলামের নানা চিন্তা-বিশ্বাসকে গ্রিক, পারসিক ও ভারতীয় দর্শনের আলোকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পায়। এভাবে নানা ধর্মদর্শনের প্রভাবে বিভিন্ন মহলে ইসলামকে যুক্তি ও বুদ্ধিসংগত করার যে মনোবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, তা-ই কালক্রমেই ইসলামে বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায় উদ্ভবের পথ প্রসারিত করে। সাইয়িদুনা আবূ সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ

"তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথগুলো এমনভাবে অনুসরণ করবে যে, এক বিঘত ও এক হাত পরিমাণও ব্যবধান থাকবে না। এমনকি তারা যদি কোনো গুইসাপের গর্তের মধ্যেও প্রবেশ করে, তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ করে সেখানে প্রবেশ করবে।"

আবূ সাঈদ আল-খুদরী রা. বলেন, قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟-"আমরা জিজ্ঞেস করলাম– ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কী পূর্ববর্তী লোক বলে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের বুঝিয়েছেন?" তিনি জবাবে বললেন, فمن؟-"তবে আর কারা?"[৬৫]

---

৬৫. বুখারী, *আস-সহীহ*, (কিতাবুল ইতিসাম), হা. নং : ৬৮৮৯; মুসলিম, *আস-সহীহ*, (কিতাবুল ইলম), হা. নং : ৬৯৫২। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা রা. থেকেও অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। ওই রিওয়ায়াতে 'ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান'-এর পরিবর্তে 'পারসিক ও রোমানদের' কথা এসেছে। (বুখারী, *আস-সহীহ*, [কিতাবুল ইতিসাম], হা. নং : ৬৮৮৮)

https://nagorikpathagar.org

এ হাদীস থেকে জানা যায়, একসময় মুসলিমদের মধ্যে অমুসলিমদের অনুকরণ-প্রবণতা চরমভাবে বৃদ্ধি পাবে। তাদের কথাবার্তা, চলাফেরা ও বেশভূষা হবে অমুসলিমদের মতো এবং চিন্তা-বিশ্বাসও গড়ে উঠবে তাদের মতোই। বলতে গেলে ইসলামের প্রতিটি ভ্রান্ত দলই তাদের চিন্তাগুলো কমবেশি বিজাতিদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছে। যেমন– রাফিযীরা ইয়াহুদী ও মাজূস থেকে, জাহমিয়্যা ও মুতাযিলীরা সাবিয়া ও গ্রিক দার্শনিকদের থেকে এবং কাদরিয়ারা খ্রিষ্টানদের থেকে তাদের অনেক চিন্তা গ্রহণ করেছে।

১০. রাজনৈতিক মতভেদ ও দলান্ধতা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলমানদের রাজনৈতিক বিভেদও দলাদলির প্রেক্ষাপট তৈরি করে। রাসূল সা.-এর ইন্তিকালের পর উম্মতের নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে সংকট দেখা দেয়। সাময়িকভাবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এর সমাধান হলেও অভ্যন্তরে তা বিভেদের বীজ বপন করে। আমীরুল মুমিনীন উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ড, সাইয়িদুনা আলী ও মুআবিয়া রা.-এর মধ্যস্থিত গৃহযুদ্ধ, কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি এ বিভেদের প্রকাশ। তা ছাড়া উমাইয়া-আব্বাসীয় শাসনের স্বার্থ রক্ষার জন্যও ক্রমে বিভিন্ন দলের উদ্ভব ঘটে। এ ধারায় গড়ে ওঠে খারিজী, শীআ ও নাসিবিয়্যা প্রভৃতি দল। এ দলগুলো শুরুতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও পরে ধর্মতাত্ত্বিক দলে পরিণত হয়।

দলান্ধতা একটি বড়ো শয়তানি অভ্যাস। এ অভ্যাস মানুষকে সত্যবিমুখ করে রাখে। নিজের অনুসৃত দল যত অন্যায়ই করুক না কেন, তা তার কাছে খারাপ অনুভূত হয় না, মূর্খতা তার ওপর সওয়ার হয়। সে তখন নিজ দলের স্বার্থ দেখতে গিয়ে প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত মত যতই ন্যায়নিষ্ঠ হোক না কেন, সে তাদের নিছক বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করতে গিয়ে মতভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করে। ইসলামে এ দলান্ধতা চরমভাবে নিন্দনীয়। রাসূল সা. বলেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ .

"সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আসাবিয়্যাত (দলীয় গোঁড়ামি)-এর দিকে আহ্বান জানায়; সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আসাবিয়্যাতের ওপর ভিত্তি করে অন্যদের সাথে যুদ্ধ করে; আর সে ব্যক্তিও আমাদের নয়, যে আসাবিয়্যাতের ওপর মৃত্যুবরণ করে।"[৬৬]

---

৬৬. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব হা. নং : ১২২/৫১২৩

https://nagorikpathagar.org

এ হাদীস থেকে জানা যায়, আসাবিয়্যাত এমন একটি গুরুতর পাপ– যা মানুষকে ন্যায় ও সত্য থেকে এত দূরে নিয়ে যায়, যা একজন মুসলিমকে একপর্যায়ে ইসলামের গণ্ডি থেকেও বের করে ছাড়ার উপক্রম করে; এমনকি সে উম্মত থেকে খারিজ হয়ে যায়।

১১. অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র

মুসলিমদের মধ্যকার বিভক্তি ও দলাদলির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র। ইসলামের শুরু থেকেই বর্তমান অবধি ইসলামবিদ্বেষী শক্তিগুলো কখনও প্রকাশ্যে, আবার কখনও অপ্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র ও কূটচাল চেলে আসছে। তাদের ষড়যন্ত্র ও কূটচালের একটি দিক হলো– মুসলিম উম্মাহকে নানা চিন্তা ও বিশ্বাসে বিভক্ত করে রাখা, তাদের মধ্যে বিভক্তির শক্ত প্রাচীর স্থাপন করে দেওয়া, যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শির উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবদ্দশায়ই মুনাফিক ও ইয়াহুদীরা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে হাজারো বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে; কিন্তু মহানবীর ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তার মোকাবিলায় তাদের ষড়যন্ত্র টিকে থাকতে পারেনি, তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর নতুন নতুন ষড়যন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রথমত, উমাইয়া শাসকবর্গ এবং পরবর্তীকালে আব্বাসীয়রা ইসলামের ঐতিহ্যগত শাসন নীতিমালার ধ্বংস সাধন করে উম্মাহর ঐক্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। আর এর সাথে যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদী কুফরী শক্তির নানা ষড়যন্ত্রও যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে তা আরও সর্বগ্রাসীরূপে বিস্তার লাভ করেছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ মুসলিমরা এমন এক যুগে বাস করছে, যখন ইসলাম কার্যত গরীব (অজ্ঞাত ও অখ্যাত) অবস্থায় রয়েছে। ইসলামের অকাট্য ও নিগূঢ় সত্যসমূহ আজ অপরিচিতির কবলে নিক্ষিপ্ত। তদুপরি কোনো মুসলিম জনপদই বর্তমানে সত্যিকারভাবে রাজনৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে পুরোপুরি স্বাধীন নয়। কোথাও তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করলেও নৈতিক ও মানসিক গোলামি থেকে আদৌ মুক্ত নয়। তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, হাট-বাজার, সভা-সমিতি, ঘরবাড়ি, এমনকি তাদের আপন দেহ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে– বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও জ্ঞানবিজ্ঞান তাদের ওপর পুরো মাত্রায় কর্তৃত্বশীল। ইঙ্গ-মার্কিন ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান চক্র মুসলমানদের অনৈক্য ও দুর্বলতার সুযোগে কোথাও সংঘবদ্ধভাবে,

https://nagorikpathagar.org

কোথাও স্বতন্ত্রভাবে হামলা করছে এবং মুসলিম দেশসমূহের ওপর একের পর এক আগ্রাসন চালিয়ে ওসব দেশকে পদানত করছে। অতঃপর টুকরো টুকরো ও ধ্বংস করছে। এর ফলে মুসলমানদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রায় পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে পড়েছে। বলতে গেলে বর্তমানে গোটা মুসলিম উম্মাহর শাসনক্ষমতা মূলত প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে তাদেরই হাতে। তাই তারা কিছুতেই এটা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় যে, সকল মুসলিম আবার কুরআনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবে। কারণ, তারা মুসলিম ঐক্যের মধ্যে নিজেদের শাসন-শোষণ ও মানবতা-বিধ্বংসী সভ্যতার চির অবসান দেখতে পায়। পাশ্চাত্যের একশ্রেণির পণ্ডিত ও রাজনীতিক ইতোমধ্যেই ইসলামকে পাশ্চাত্যের, আরও বিশেষ করে বললে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে ঘোষণা করছে। তাদের একজন বলেছে–

> "Today Islam and modern western world confront and challenge each other. No other major religion poses such challenge to the west."

কমিউনিজমের পতনের পর ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার বলেছিলেন– "এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো বিপদ হলো ইসলামী মৌলবাদ।" তারা ভালো করে বুঝতে পেরেছে যে, মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে একমাত্র খাঁটি ইসলাম, যাকে ওরা 'ইসলামী মৌলবাদ' বলে আখ্যায়িত করছে। তাই তারা প্রকৃত ইসলামকে নির্মূল করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা তৈরির উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী মৌলবাদের ধূম্রজাল ছড়াচ্ছে। মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ বলেন–

> "পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়া ও নাস্তিক্যবাদী কমিউনিজমের পতনের পর পশ্চিমা জগৎ এখন মুসলিম জাতিপুঞ্জের জাগরণকে তাদের প্রতিপক্ষ মনে করে এবং তাকে নির্মূল করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা তৈরির উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী মৌলবাদের ধোঁয়া তুলেছে।"

অপরদিকে মুসলিমরা এতই আত্মভোলা ও গাফিল হয়ে পড়েছে যে, তাদের শত্রুরা তাদেরকে নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করছে। তারা মুসলিমদের সম্পদ নিয়ে উদরপূর্তি করছে, আর মুসলিমরা ক্ষুধার অগ্নিজঠর নিয়ে কালক্ষেপণ করছে। তারা মুসলিমদের সকল সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা লুটে নিচ্ছে এবং তাদের তা থেকে কিছুই দিচ্ছে না; অতি অল্প কিছু দিলেও তা এমনভাবে দিচ্ছে, যেন তারা তা আমাদের খয়রাত দিচ্ছে। তারা মুসলিমদের তাদের

https://nagorikpathagar.org

ধর্মীয় মৌল নীতিমালা একের পর এক পরিত্যাগ করতে বাধ্য করছে। তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও উম্মাহর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আন্দোলন থেকে তাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাদের অন্তর থেকে এ গুরুকাজের দায়িত্ববোধকে ধুয়ে-মুছে বিদায় করে দিয়েছে এবং এর পরিবর্তে তাদের মধ্যে হীনতা-নীচতা ও তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের মোহ প্রবিষ্ট করিয়েছে। তারা তাদের মধ্যে বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতারণার মাধ্যমে নিজেদের সেবাদাসে পরিণত করে এসব হীনকর্ম সম্পাদন করছে, যার পরিণতিতে মুসলিম উম্মাহ বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার কবলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, মুসলিম সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে এবং মুসলিমদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ধর্মবিমুখ লোকদের হাতে চলে গিয়েছে।

বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি

বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর মধ্যে সাধারণত নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো কমবেশি লক্ষ করা যায় :

ক. জ্ঞানলাভের নানা মাধ্যমের ব্যবহার

ভ্রান্ত ফিরকাগুলো সাধারণত তাদের চিন্তা-বিশ্বাস প্রমাণের জন্য কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি জ্ঞানলাভের অন্যান্য মাধ্যম যেমন– যুক্তি-বুদ্ধি, কাশফ, ব্যক্তিবিশেষের অভিমত, প্রচলিত ধ্যানধারণা প্রভৃতির ওপরও নির্ভর করে।

খ. ওহীর ব্যাখ্যাকে ওহীর সমতুল্য মনে করা

ভ্রান্ত ফিরকাগুলো সাধারণত ওহীর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকে ওহীর সমপর্যায়ের বা সম্পূরক বিষয় হিসেবে আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ওহী ও ওহীর তাবীল (ব্যাখ্যা) এক নয়। উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ওহী হলো অকাট্য ও নির্ভুল; কিন্তু ওহীর তাবীল অকাট্য নয়, এটি ওহীর একটি ব্যাখ্যা মাত্র– যা সঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে।

গ. সুন্নাত ও সাহাবীগণের মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়া

ভ্রান্ত ফিরকাগুলো সাধারণত তাদের চিন্তা-বিশ্বাসগুলো প্রমাণের ক্ষেত্রে সুন্নাত ও সাহাবীগণের মতামতের চেয়ে নিজেদের মনগড়া যুক্তিকেই অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে। উপরন্তু, তারা নিজেদের মতের পরিপন্থি হাদীস ও আছারগুলোর ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে কিংবা সেগুলো অস্বীকার করে।

https://nagorikpathagar.org

ঘ. নতুন নতুন আকীদা সংযোজন করা

পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই– এরূপ অনেক বিষয়কেও ভ্রান্ত ফিরকাগুলো আকীদার বিষয়বস্তুতে পরিণত করে। অনুরূপভাবে অত্যন্ত দুর্বল কিংবা ভিত্তিহীন রিওয়ায়াতের ওপর ভিত্তি করেও অনেক বিষয় আকীদার অন্তর্ভুক্ত করে।

ঙ. নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে ওহীর যাচাই-বাছাই

ভ্রান্ত ফিরকাগুলো সাধারণত ওহীকে তাদের যুক্তি-বুদ্ধি ও নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে। ওহীর যেসব বিষয় তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়, সেসব ওহীর ওপর ভিত্তি করে ওহীর অন্যান্য বক্তব্য ব্যাখ্যা করে কার্যত বাতিল করে দেয়।

চ. হাদীসের নামে মিথ্যা কথা রচনা এবং দুর্বল রিওয়ায়াতের ওপর নির্ভরতা

ভ্রান্ত ফিরকাগুলো সাধারণত নিজেদের মতের সমর্থনে হাদীসের নামে বহু মিথ্যা কথা রচনা করে এবং এগুলো প্রচার করে। অনুরূপভাবে তারা অত্যন্ত দুর্বল ও বিরল রিওয়ায়াতগুলোকে– যদি ওগুলো তাদের মতের সমর্থনকারী হয়– দলীল হিসেবে জোরালোভাবে উপস্থাপন করে।

জ. নিজের মতকে চূড়ান্ত হক মনে করা

ভ্রান্ত ফিরকাগুলো সাধারণত নিজেদের প্রত্যেকটি মতকেই চূড়ান্ত সত্য আর বিপরীত সব মতকেই বাতিল বলে বিশ্বাস করে এবং তাদের বাইরের কোনো মতকে সহজেই স্বীকার করতে চায় না।

ঝ. তাকফীর

ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর মধ্যে এ প্রবণতা প্রবলভাবে লক্ষ করা যায়, তারা মতবিরোধের সময় প্রতিপক্ষকে সহজেই কাফির ফাতওয়া দেয়। তারা নিরন্তর চেষ্টা করে– কীভাবে ব্যাখ্যা ও যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে কাফির বা বাতিল ও ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করা যায়।

ইফতিরাক থেকে বাঁচার উপায়

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমরা নীতিগতভাবে কেউ ইফতিরাককে পছন্দ করি না; সকলেই বিভক্তি ও দলাদলি থেকে বেঁচে থাকতে চাই; কিন্তু কার্যত আমরা প্রায় সকলেই কোনো না কোনোভাবে ইফতিরাকে জড়িয়ে পড়ি।

https://nagorikpathagar.org

কাজেই এ প্রশ্ন দেখা দেয়– আমরা যদি সত্যিই ইফতিরাক থেকে বেঁচে থাকতে চাই, আমাদের করণীয় কী কী? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমরা সকলেই এ কথায় একমত হই যে, ইফতিরাকে জড়িত হয়ে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করার চেয়ে আগেভাগে তার পথ রুদ্ধ করাই হলো শ্রেয় ও সুবিবেচকের কাজ। এ উদ্দেশ্যে ইফতিরাক থেকে বেঁচে থাকতে হলে ইতঃপূর্বে বর্ণিত ইফতিরাকের কারণগুলো থেকে আমাদের নিজেদের সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আরও কিছু বিষয় আছে, যেগুলো ইফতিরাক থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে সহায়ক হবে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো– জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা (الاعتصام بالكتاب والسنة)। এ বিষয়টি দ্বীনের একটি বৃহত্তম মূলনীতি এবং এটি এতই ব্যাপক বিষয় যে, এর মধ্যে অন্য সকল নির্দেশনা ও বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিম্নে আমরা ইফতিরাক থেকে বেঁচে থাকার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় তুলে ধরছি–

১. রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবনাদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং তা অনুসরণ করা।

২. সালাফে সালিহীন ও সত্যনিষ্ঠ প্রধান ইমামগণের অনুসৃত পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা।

৩. বিশুদ্ধ তরীকায় এবং বিদগ্ধ আলিমগণ থেকে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করা।

৪. সব সময় উম্মতের ন্যায়নিষ্ঠ, বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ আলিমগণের সান্নিধ্যে থাকা। আলহামদুলিল্লাহ! এঁদের সংখ্যা আজও কম নয়। অনেকেই মনে করে, এরূপ আলিম বর্তমানে নেই। তাদের এ কথার মর্ম দাঁড়ায়– বর্তমানে সত্যিকার দ্বীন বলতে কিছু নেই; তা শেষ হয়ে গেছে। তাদের এরূপ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত অবধি এ দ্বীনের হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। এর মর্মার্থ হলো– তিনি সকল যুগেই কমবেশি সত্যিকার আলিম সৃষ্টি করবেন, যাঁরা একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর দ্বীনের হিফাযতের কাজে রত থাকবেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে– হাদীসে রয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের কিছু লোক প্রকাশ্যে হকের ওপর বিদ্যমান থাকবে।

৫. বিজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ আলিমগণের চেয়ে কোনোভাবেই নিজেদের শ্রেষ্ঠ না ভাবা এবং তাঁদের মতের বাইরে কোনো বিচ্ছিন্ন মত পোষণ না করা, যা ফিতনা কিংবা দলাদলির পর্যায়ে নিয়ে যায়।

https://nagorikpathagar.org

৬. যেকোনো বিচ্ছিন্নতামূলক উদ্যোগ, বিশেষ করে নবীন, অর্বাচীন ও অত্যুৎসাহীদের বিচ্ছিন্ন কার্যকলাপে সহযোগিতা না করা।

৭. সব সময় একনিষ্ঠভাবে উম্মতের ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি ও সংশোধন কামনা করা এবং ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করে– এরূপ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা।

৮. সব সময় উম্মাহদরদী সত্যপরায়ণ আলিম ও শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান মুত্তাকী লোকদের সংস্পর্শে থাকা।

৯. যেকোনোরূপ দলাদলি ও পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

১০. সকল মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করা। এতে অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়ে যায়।

ব্যাবহারিক বিষয়ে ইখতিলাফ এবং ইসলামে এর বিধান

ব্যাবহারিক বিষয়ে 'ইখতিলাফ' বলতে দ্বীনের যেকোনো ব্যাবহারিক বিষয়ে শারঈ দলীলের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণের পরস্পর ভিন্নমত পোষণ করাকে বোঝানো হয়। সেই ভিন্নমত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে হতে পারে কিংবা দলীলের দ্ব্যর্থকতা বা প্রচ্ছন্নতার কারণে হতে পারে অথবা দলীলসংক্রান্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেও হতে পারে।

আরবীতে خِلَاف (খিলাফ) শব্দটি সাধারণত 'ইখতিলাফ' শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে কেউ কেউ এ দুটি শব্দের ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যেমন– 'ইখতিলাফ' শব্দটি বিশুদ্ধ দলীলনির্ভর মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে এবং 'খিলাফ' শব্দটি দলীলবিহীন কিংবা দুর্বল দলীলনির্ভর মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। মুহাম্মাদ ইবনু আলী থানবী [মৃ. ১১৫৮ হি.] রহ. বলেন, অগ্রগণ্য (الرَّاجِح) মতের বিপরীতে দুর্বল অভিমত (المَرْجُوح)-কে 'খিলাফ' বলা হয়; 'ইখতিলাফ' বলা হয় না। মোটকথা, 'খিলাফ'-এর ক্ষেত্রে মতভেদকারীর কথা দুর্বল হয়ে থাকে। যেমন– বলা হয় যে, সে ইজমার খিলাফ করেছে। পক্ষান্তরে 'ইখতিলাফ'-এর ক্ষেত্রে মতভেদকারীর কথা দুর্বল হয় না। আবার কারও কারও মতে, 'খিলাফ' শব্দটি 'ইখতিলাফ'-এর চেয়ে ব্যাপকতাজ্ঞাপক। এটি ইজমার বিরোধিতার ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি ব্যক্তিবিশেষের মতের বিরোধিতার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।[৬৭]

---

৬৭. *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ২৯১-২

https://nagorikpathagar.org

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআনের বহু আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসে সকল মুমিনকে একত্রিত থাকতে এবং পরস্পর মতপার্থক্য না করতে দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো আয়াত ও হাদীসে মতপার্থক্যে লিপ্ত হওয়ার কঠিন পরিণতি সম্পর্কেও লোকদের সতর্ক করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾

"যারা এ কিতাব নিয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছে, তারা সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।"[৬৮]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

وَلاَتَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ .

"তোমরা মতবিরোধ করো না। কেননা, এতে তোমাদের অন্তরগুলোর মধ্যেও দূরত্ব তৈরি হবে।"[৬৯]

অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন–

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ فِي الْكِتَابِ.

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো কেবল এ জন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা (আল্লাহর) কিতাব নিয়ে মতবিরোধ করত।"[৭০]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, ইসলামে যেকোনো বিষয়ে– চাই তা আকীদাসংক্রান্ত ব্যাপার হোক কিংবা আমলসংক্রান্ত ব্যাপার– মতবিরোধ করার কোনো নীতিগত ভিত্তি নেই। বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা এবং স্বার্থপ্রণোদিত বা প্রবৃত্তিতাড়িত যেকোনো বিরোধিতা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, মানুষে মানুষে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকা স্বভাবগত ব্যাপার। সকলের মূল্যায়নক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ, যোগ্যতা ও

---

৬৮. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) : ১৭৬

৬৯. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : সালাত, পরিচ্ছেদ : তাসবিয়াতুস সুফূফ, খ. ২, পৃ. ৩০, হা. নং : ১০০০

৭০. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ইলম, পরিচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আন মুতাশাবিহিল কুরআন, খ. ৮, পৃ. ৬৯৪৭, হা. নং : ৬৯৪৭

https://nagorikpathagar.org

বুদ্ধি-বিবেচনাও এক নয়। কাজেই ক্ষেত্রবিশেষে যে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেবে– তা বলাই বাহুল্য। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَايَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾

"আর তোমার রব চাইলে দুনিয়ার সব মানুষকে একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন। (অথচ তিনি তাতে মানুষকে বাধ্য করেননি।) ফলে এভাবে তারা হামেশাই নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করতে থাকবে। তবে তোমার রব যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা আলাদা।"[৭১]

উক্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ও বুদ্ধি-বিবেচনাগত তারতম্যের কারণে বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে যে মতভিন্নতা দেখা দেয়, তা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিনৈপুণ্যের একটি নিদর্শন এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তা তৈরি হয়। এরূপ মতভিন্নতা অবশ্যই দোষণীয় নয়, যদি তা বিশুদ্ধ দলীল ও যুক্তিনির্ভর হয় এবং শিষ্টাচার ও নীতিবিবর্জিত না হয়। ক্ষেত্রেবিশেষে তা উপকারীও বটে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম [৬৯১-৭৫১ হি.] রহ. বলেন–

ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم؛ ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف؛ فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية.

"লোকদের মধ্যে মতপার্থক্য সংঘটিত হওয়া একটি অনিবার্য বিষয়। কারণ, তাদের ইচ্ছা ও বুদ্ধি-বিবেচনাশক্তি এক নয়। তবে নিন্দনীয় হলো, একজন অপরজনের ওপর চড়াও হওয়া ও বাড়াবাড়ি করা। যদি মতপার্থক্যের কারণে কোনোরূপ বিভাজন বা দলাদলি তৈরি না হয় এবং প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা হয়, তবে এ মতপার্থক্য ক্ষতিকর নয়। কারণ, তা মানুষের সৃষ্টিগত অপরিহার্য বিষয়।"[৭২]

---

৭১. আল-কুরআন, ১১ (সূরা হুদ) : ১১৮

৭২. ইবনুল কাইয়িম, *আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালাহ..*, (রিয়াদ : দারুল আসিমাহ, ১৯৯৮), খ. ২, পৃ. ৫১৯

https://nagorikpathagar.org

আমাদের সালাফে সালিহীন (পূর্বসূরিগণ)-ও দ্বীনের গবেষণাধর্মী নানা উপজাত বিষয়ে (فروع) মতপার্থক্য করেছেন। তবে তাঁদের সে মতপার্থক্যে কোনো প্রকারের জিদ, হঠকারিতা ও গোঁড়ামির স্থান ছিল না। তাঁরা মতবিরোধ করেছেন তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনার স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে এবং তা ছিল অতি ক্ষণস্থায়ী। ইচ্ছাকৃত কিংবা জিদের বশবর্তী হয়ে তাঁরা কখনও মতবিরোধ করেননি। যতটুকু করেছেন, তা প্রয়োজনের তাগিদে একান্ত বাধ্য হয়েই করেছেন। তাঁরা যথাসাধ্য মতবিরোধ থেকে বাঁচার চেষ্টা করতেন এবং যখনই তাঁরা কোনো সঠিক দলীল পেতেন, তখন সাথে সাথে তাঁরা সকলেই প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ করে নিতেন। তাঁদের মতবিরোধের পেছনে সকলের একান্ত উদ্দেশ্য ছিল– নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের ওপর নিজেদের ও উম্মতের আমল প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাঁদের মতবিরোধ তাঁদের মধ্যে অন্তরের দূরত্ব তৈরি করেনি, তাঁদের নানা দলে-উপদলে বিভক্তও করেনি; বরং এ মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। পরমতসহিষ্ণুতা ছিল তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁদের এরূপ ইজতিহাদভিত্তিক উদারনৈতিক মতপার্থক্য বহু ক্ষেত্রে উম্মতকে প্রশস্ততা দান করেছে। এ কারণে অনেকেই তাঁদের এ মতপার্থক্যকে উম্মতের জন্য রহমতরূপেও বিবেচনা করেছেন।[৭৩] ইসলামের পঞ্চম খলীফা সাইয়িদুনা উমার ইবনু আবদিল আযীয [৬১-১০১ হি.] রহ. সাহাবা কিরাম রা.-এর মতবিরোধ সম্পর্কে বলেন–

مايسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة .

"রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণের মধ্যে মতভিন্নতা না থাকাটা আমার কাছে আনন্দের বিষয় নয়। কেননা, যদি তাঁরা কোনো বিষয়ে মতানৈক্য না করতেন, তাহলে (পরবর্তীদের জন্য) কোনো ছাড়ই থাকত না।"[৭৪]

---

৭৩. শাতিবী, আবূ ইসহাক ইবরাহীম, *আল-মুওয়াফাকাত*, (দারু ইবনি আফফান, ১৯৯৭), খ. ৫, পৃ. ৭৫

৭৪. খতীব বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ১, পৃ. ৪০৪; ইবনু তাইমিয়াহ, আহমাদ, *মাজমূউল ফাতাওয়া*, (রিয়াদ : দারুল ওয়াফা, ২০০৫), খ. ৩০, পৃ. ৮০

https://nagorikpathagar.org

অর্থাৎ, এরূপ অবস্থায় উত্তরসূরিরা অনেক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ অবস্থায় পড়ে যেত। কেননা, যদি তাঁরা সব বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করতেন, তাহলে যে কেউ কোনো বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করলে সে পথভ্রষ্ট গণ্য হতো। এখন যেসব বিষয়ে তাঁরা মতানৈক্য করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে– যেহেতু তাঁরা প্রত্যেকেই অনুসরণীয় ইমাম, তাই প্রত্যেকের জন্য এ অবকাশ রয়েছে যে, তিনি যে কারও অনুসরণ করতে পারেন। এজন্য অন্ততপক্ষে কাউকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে না। বিশিষ্ট ফকীহ তাবিঈ আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ [৩৭-১০৭ হি.] রহ. বলেন–

كان اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نفع الله به , فما عملت منه من عمل لم يدخل نفسك منه شيء.

"রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণের মতপার্থক্য আল্লাহ তাআলার কল্যাণকর বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। তুমি (তাঁদের মধ্যে) যাঁর মতানুযায়ী যে আমলই করো না কেন, এতে তোমার মনের মধ্যে কোনো অপ্রসন্ন ভাব সঞ্চার হবে না।"[৭৫]

উল্লেখ্য যে, সাহাবা কিরামের ইজতিহাদভিত্তিক মতপার্থক্যের মধ্যে উম্মতের জন্য প্রশস্ততা রয়েছে; তা উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ– যদিও ক্ষেত্রবিশেষে কথাটি সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু এরূপ সাধারণ সমীকরণ সকলেই মেনে নিতে চান না। যেমন, ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] রহ. বলেন–

لَيْسَ فِي اخْتِلاَفِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَةٌ، وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي وَاحِدٍ....لايكون قولان مختلفان صوابين..

"রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণের মতপার্থক্যের মধ্যে কোনোরূপ প্রশস্ততা নেই। হক কেবল যেকোনো একজনের পক্ষেই থাকবে। ... পরস্পর ভিন্ন দুটি মত সঠিক হতে পারে না।"[৭৬]

ইমাম লাইস ইবনু সাদ [৯৪-১৭৫ হি.] থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে।[৭৭]

---

৭৫. খতীব বাগদাদী, *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ১, পৃ. ৪০৪

৭৬. শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, খ. ৫, পৃ. ৭৫

৭৭. ইবনু হাযম, *আল-ইহকাম*, খ. ৬, পৃ. ৩১৭; ইবনু আবদিল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলম ও ফাদলিহি*, খ. ২, পৃ. ১৬৪

قال ابن القاسم: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس فيه توسعة ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب .

https://nagorikpathagar.org

কাজী ইসমাঈল [২০০-২৮২ হি.] রহ. বলেন–

إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا.

"রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণের মতপার্থক্যের মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে– এ কথার একান্ত তাৎপর্য হলো, চিন্তা-গবেষণা করে রায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা। প্রশস্ততার অর্থ এ নয় যে, লোকেরা তাঁদের যে কারও মত গ্রহণ করবেন– যদিও তাঁর কথায় হক নিহিত না থাকে।"[৭৮]

ইবনু আবদিল বার [৩৬৮-৪৬৩ হি.] বলেন, كلام إسماعيل هذا حسن جدا– "ইসমাঈলের এ কথা অত্যন্ত সুন্দর।"[৭৯] একবার আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক [১১৮-১৮১ হি.] রহ.-কে সাহাবীগণের মতপার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তাঁদের প্রত্যেকের কথাই কি সঠিক? তখন তিনি জবাব দেন, الصواب واحد، والخطأ موضوع عن القوم،أرجو– "সঠিক মত একটিই। তবে আশা করি, ভুল মতটি তাঁদের নিকট বিবেচ্য হয়নি।"[৮০]

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ [৬৬১-৭২৮ হি.] রহ. এ দুই ধরনের বক্তব্যের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, মতানৈক্য যেমন কখনও রহমতের উপলক্ষ্য হতে পারে, তেমনি কখনও তা আযাবেরও উপলক্ষ্য হতে পারে। তিনি বলেন–

النِّزَاعُ فِي الأَحْكَامِ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً إِذَا لَمْ يُفْضِ إِلَى شَرٍّ عَظِيمٍ مِنْ خَفَاءِ الْحُكْمِ. وَالْحَقُّ فِي نَفْسِ الأَمْرِ وَاحِدٌ، وَقَدْ يَكُونُ خَفَاؤُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ – لِمَا فِي ظُهُورِهِ مِنَ الشِّدَّةِ عَلَيْهِ – مِنْ رَحْمَةِ اللهِ بِهِ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ { لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ }. وَهَكَذَا مَا يُوجَدُ فِي الأَسْوَاقِ مِنَ الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ قَدْ يَكُونُ

---

৭৮. ইবনু আবদিল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলম ও ফাদলিহি*, খ. ২, পৃ. ১৬৪; শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, খ. ৫, পৃ. ৭৫

৭৯. ইবনু আবদিল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলম ও ফাদলিহি*, খ. ২, পৃ. ১৬৪

৮০. খতীব বাগদাদী, *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ১, পৃ. ৪০৩

https://nagorikpathagar.org

فِي نَفْسِ الأَمْرِ مَغْفُوبًا، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمِ الإِنْسَانُ بِذَلِكَ كَانَ كُلُّهُ حَلاَلاً لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ بِحَالٍ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا عَلِمَ . فَخَفَاءُ الْعِلْمِ بِمَا يُوجِبُ الشِّدَّةَ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً، كَمَا أَنَّ خَفَاءَ الْعِلْمِ بِمَا يُوجِبُ الرُّخْصَةَ قَدْ يَكُونُ عُقُوبَةً، كَمَا أَنَّ رَفْعَ الشَّكِّ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً وَقَدْ يَكُونُ عُقُوبَةً.

"বিধিবিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে পরস্পর মতানৈক্য কখনও রহমত হতে পারে, যদি সঠিক হুকুমটি প্রচ্ছন্ন থাকার কারণে তা বড়ো ধরনের কোনো অনিষ্টের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। বস্তুতপক্ষে হক একটিই। কখনও এ হক প্রচ্ছন্ন থাকার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি রহমত হয়ে থাকে। কেননা, এ হক সুস্পষ্ট হলে কখনও তাদের কষ্টে নিপতিত হতে হতো। এটা আল্লাহ তাআলার বাণী– "তোমরা এমন সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যদি তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হয়, তাহলে তোমাদের খারাপ লাগবে।"-এর পর্যায়ভুক্ত। যেমন– বাজারে অনেক খাদ্য ও পোশাক পাওয়া যায়। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এগুলো বাজারে কারও থেকে অপহরণ করে নিয়ে আসা হয়েছে। কোনো মানুষ যদি এটা জানতে না পারে, তাহলে তার জন্য এগুলো হালাল এবং এতে তার ওপর তাৎক্ষণিকভাবে কোনো কিছু বর্তাবে না। কিন্তু সে যদি জানতে পারে যে এগুলো অপহৃত সম্পদ, তাহলে তার জন্য এগুলো ক্রয় করা জায়িয হবে না। কাজেই যে জ্ঞান জটিলতা তৈরি করে, তা জানা না থাকলে কখনও রহমত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যে জ্ঞান সহজ অবস্থা তৈরি করে, তা জানা না থাকলে কখনও শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে সন্দেহ দূরীকরণও কখনও রহমতের উপলক্ষ্য হয়ে থাকে, আবার কখনও শাস্তির উপলক্ষ্য হয়ে থাকে।"[৮১]

আমরা নিম্নে ইসলামে ফিকহী মতপার্থক্যের উৎপত্তি এবং এর স্বরূপ ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনা করব।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে ইখতিলাফ ও এর স্বরূপ

রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে কোনোরূপ মতপার্থক্য দানা বাঁধতে পারেনি। এ সময় যদিও ক্ষেত্রবিশেষে সাহাবা কিরাম রা.-এর মধ্যেও

৮১. ইবনু তাইমিয়াহ, *মাজমূউল ফাতাওয়া*, খ. ১৪, পৃ. ১৫৯

https://nagorikpathagar.org

কিছুটা মতপার্থক্য তৈরি হতো, তবে তাঁর উপস্থিতির সুবাদে এ মতপার্থক্য সহজেই নিরসন হয়ে যেত; বেশি দূর এগোতে পারত না। তাঁরা যখনই কোনো সমস্যা বা মতপার্থক্যের সম্মুখীন হতেন, তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর শরণাপন্ন হতেন। তিনি তাঁদের সঠিক ফয়সালাটি জানিয়ে দিতেন। তবে তখনকার এরূপ কিছু ঘটনার কথাও জানা যায় যে, সাহাবা কিরাম রা. কোনো অভিযানে মদীনা থেকে বেশ দূরে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তাঁরা এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে রীতিমতো মতপার্থক্য তৈরি হয়। এ মতপার্থক্য নিরসনের জন্য তাঁদের পক্ষে মদীনায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট আসাও সম্ভব হতো না। ফলে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের মতো ইজতিহাদ করে আমল করতেন। পরে যখন তাঁরা মদীনায় ফিরে আসতেন, তখন তাঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহ সা.-কে ঘটনাটি জানাতেন এবং সেইসাথে তাঁদের নিজেদের ইজতিহাদগুলোও পেশ করতেন। রাসূলুল্লাহ সা. ঘটনাটির পুরো বৃত্তান্ত শুনে হয়তো তাঁদের ইজতিহাদগুলো বহাল রাখতেন অথবা সঠিক ফয়সালাটি জানিয়ে দিতেন। সাহাবা কিরাম রা. সঠিক ফয়সালাটি জেনে খুশি হতেন এবং এভাবে তাঁদের মধ্যকার মতপার্থক্যও নিরসন হয়ে যেত। নিম্নে এরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা আলোচনা করা হলো–

ক. আবদুল্লাহ ইবনু উমার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় রাসূল সা. সাহাবীদের বললেন– لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ- "তোমাদের কেউ যেন বনু কুরাইযায় পৌঁছার পূর্বে সালাত আদায় না করে।" পথে সালাতুল আসরের সময় শেষ হওয়ার উপক্রম হলে একদল সাহাবী বললেন– সময় পার হয়ে গেলেও বনু কুরাইযায় পৌঁছার পূর্বে আমরা সালাত আদায় করব না। অপর একদল সাহাবী বললেন– আমরা পথমধ্যেই সময়মতো সালাত আদায় করব। কেননা, সালাত কাযা করানো রাসূলুল্লাহ সা.-এর উদ্দেশ্য ছিল না; বরং আমাদের গতি দ্রুত করাই ছিল তাঁর একান্ত উদ্দেশ্য, যাতে সালাতুল আসরের পূর্বে সেখানে পৌঁছা যায়। ঘটনাটি শুনে রাসূলুল্লাহ সা. কোনো দলকেই তিরস্কার করেননি।[৮২]

---

৮২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, পরিচ্ছেদ : মারজিউন্নাবী সা. মিনাল আহযাব, খ. ৪, পৃ. ১৫১০, হা. নং : ৩৮৯৩

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: " لَايُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ "، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

https://nagorikpathagar.org

হাফিয আবদুর রহমান আস-সুহাইলী [৫০৮-৫৮১ হি.] রহ. ও অন্য বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ বলেন, এ হাদীস থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়–

এক. আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ওপর আমল করা যেমন দোষণীয় নয়, তেমনি ইজতিহাদের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করাও নিন্দনীয় নয়।

দুই. শরীয়তের অপ্রধান বিষয়সমূহে মুজতাহিদগণের সকলেই সঠিক। তাঁদের কাউকেই ভ্রান্ত বলা যাবে না।[৮৩]

কাজেই মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে পরস্পরের বিভাজন কিংবা দোষারোপকে রাসূল সা. ভালো চোখে দেখেননি। তিনি এরূপ আচরণের নিন্দা করেছেন।

খ. সাইয়িদুনা আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– যাতুস সালাসিল যুদ্ধে এক প্রচণ্ড ঠান্ডা রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। এ সময় আমার আশঙ্কা হয়েছিল– যদি আমি গোসল করি, তাহলে আমি মরে যাব। ফলে আমি তায়াম্মুম করে সাথিদের নিয়ে ফজরের নামায আদায় করি। অভিযান থেকে ফিরে এসে তাঁরা ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সা.-কে অবহিত করেন। তিনি এটা শুনে বললেন– "হে আমর, তুমি অপবিত্র অবস্থায় সাথিদের নিয়ে নামায পড়লে?!" তখন আমি তাঁকে গোসল না করার কারণ জানিয়ে বললাম, আল্লাহ তাআলা বলেছেন– ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾- "তোমাদের নিজেদের মেরে ফেলো না। আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা. হাসলেন; কিছু বললেন না।[৮৪]

---

৮৩. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ. ৭, পৃ. ৪০৯

৮৪. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : তাহারাত, পরিচ্ছেদ : ইযা খাফাল জুনুবু আল-বারদা.., খ. ১, পৃ. ৩৩৪, হা. নং : ৩৩৪

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «يَاعَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ». فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

https://nagorikpathagar.org

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যদিও আমর ইবনুল আস রা.-এর উক্ত ইজতিহাদ সাহাবীগণের নিকট পছন্দনীয় হয়নি এবং এ কারণে তাঁরা মদীনায় ফিরে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা.-কে অবহিত করেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা. আমর ইবনুল আস রা.-এর বক্তব্য শুনে তাঁর ইজতিহাদ অনুমোদন করলেন। এ থেকে অনেক উসূলবিদই মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে তাঁর অনুপস্থিতিতে সাহাবীগণের ইজতিহাদ করে আমল করা জায়িয ছিল।[৮৫]

গ. সাইয়িদুনা আবূ কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত, এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি মক্কার কোনো এক রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ পেছনে পড়ে গেলেন। তাঁর সাথিরা ছিলেন ইহরাম বাঁধা অবস্থায়। আর তিনি ছিলেন ইহরাম ছাড়া অবস্থায়। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে (শিকারের উদ্দেশ্যে) তাঁর ঘোড়ার ওপর আরোহণ করলেন। তারপর তিনি তাঁর সাথিদের তাঁর হাতে তাঁর চাবুকটি তুলে দিতে অনুরোধ জানালেন। তাঁরা তা করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের তাঁর বর্শাটি তুলে দিতে অনুরোধ জানালেন। তাঁরা তাও করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। অবশেষে তিনি নিজেই নেমে সেটি তুলে নিলেন এবং গাধাটির পেছনে দ্রুত বেগে ছুটলেন এবং সেটিকে হত্যা করলেন। রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ তা খেলেন, আবার কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে পৌঁছলেন, তখন তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন– إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ-"এটি তো এমন খাদ্য– যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের খাওয়ার জন্য দিয়েছেন।"[৮৬]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে তাঁর অনুপস্থিতিতে সাহাবীগণ ক্ষেত্রবিশেষে ইজতিহাদ করে আমল করতেন এবং তা নিয়ে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্যও দেখা দিত। পরে রাসূলুল্লাহ সা. এরূপ কোনো কোনো আমল জানতে পেরে অনুমোদনও করেছেন।

---

৮৫. বাদরুদ্দীন আল-আইনী, মাহমূদ, *শারহু সুনানি আবী দাউদ*, (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৯), খ. ২, পৃ. ১৫০; ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ. ১, পৃ. ৪৫৪

৮৬. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সাইদ ওয়ায যাবায়িহ, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফিত তাসাইউদ, খ. ৫, পৃ. ২০৯১, হা. নং : ৫১৭২; মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : হজ, পরিচ্ছেদ : তাহরীমুস সাইদ লিল মুহরিম, খ. ৪, পৃ. ১৫, হা. নং : ২৯০৯

https://nagorikpathagar.org

কাজী আবূ বাকর ইবনুল আরাবী [৪৬৮-৫৪৩ হি.] রহ. বলেন–

وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد، ولو تضاد المجتهدان لا يعاب واحد منهما على ذلك.

"এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ইজতিহাদমতো আমল করা যাবে, যদিও দুজন মুজতাহিদ বিপরীত মত প্রকাশ করেন। এ দুজনের কাউকে তাঁদের ইজতিহাদের জন্য দোষারোপও করা যাবে না।"[৮৭]

ঘ. সাইয়িদুনা আবূ সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার দুজন ব্যক্তি সফরে বের হন। পথমধ্যে তাঁদের নামাযের সময় হয়। কিন্তু তাঁদের সাথে অজু করার মতো কোনো পানি ছিল না। ফলে তাঁরা দুজনেই পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেন। এরপর নামাযের সময়ের মধ্যে তাঁরা দুজনেই পানি পেলেন। ফলে তাঁদের একজন অজু করে পুনরায় নামায আদায় করলেন; কিন্তু অপর ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়লেন না। পরে তাঁরা দুজনেই রাসূলুল্লাহ সা.-এর খিদমতে এসে তাঁকে তাঁদের উক্ত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ সা. যিনি নামায পুনরায় পড়েননি, তাঁকে বললেন– أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ-"তুমি সঠিক নিয়মই পালন করেছ। তোমার ওই নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" আর যিনি অজু করে পুনরায় নামায পড়ে নেন, রাসূলুল্লাহ সা. তাকে লক্ষ করে বললেন– لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ-"তোমার জন্য দুবারই পুরস্কার রয়েছে।"[৮৮]

---

৮৭. বাদরুদ্দীন আল-আইনী, মাহমূদ, *উমদাতুল কারী*, (বৈরুত : দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), খ. ১৬, পৃ. ৩২; ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ. ৪, পৃ. ৩১

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ».

৮৮. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : তাহারাত, পরিচ্ছেদ : আল-মুতায়াম্মিম ইয়াজিদুল মাআ.., খ. ১, পৃ. ১৩৩, হা. নং : ৩৩৮

https://nagorikpathagar.org

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাঁরা দুজনেই নিজে নিজে ইজতিহাদ করে আমল করেন এবং তা নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে মতভিন্নতাও দেখা দেয়। কিন্তু পরে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁদের মতপার্থক্যের কথা জানতে পেরে তাঁদের কাউকে তিরস্কার তো করলেনই না; বরং তাঁদের প্রত্যেকের আমল অনুমোদন করলেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে তাঁর অনুপস্থিতিতে সাহাবীগণ ক্ষেত্রবিশেষে ইজতিহাদ করে আমল করতেন এবং তা নিয়ে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্যও দেখা দিত। পরে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁদের মতপার্থক্যের কথা জানতে পেরে তাঁদের প্রত্যেকের আমল অনুমোদনও করতেন।

৬. সাইয়িদুনা জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– এক সফরে আমাদের জনৈক সাথির মাথা ফেটে যায়। পরে তার গোসল ফরয হলে তিনি এ অবস্থায় তায়াম্মুম করার কোনো সুযোগ আছে কি না জানতে চাইলেন। সাথিরা বলল– "যেহেতু তুমি পানি ব্যবহার করতে পারছ, তাই তোমার তায়াম্মুম করার কোনো সুযোগ নেই।" তখন তিনি বাধ্য হয়ে গোসল করলেন। এতে তাঁর মৃত্যু হলো। আমরা মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সা.-কে ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি তাঁর সাথিদের কঠোরভাবে তিরস্কার করে বললেন– "তারা তাকে খুন করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করুন! জানা না থাকলে তারা জিজ্ঞাসা করে নিল না কেন? জিজ্ঞাসাই তো হলো অজ্ঞতার নিরাময়। তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, সে তায়াম্মুম করবে অথবা ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধবে এবং তার ওপর মাসেহ করবে আর শরীরের অন্যান্য অংশ ধুয়ে ফেলবে।"[৮৯]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ». وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ».

৮৯. দারা কুতনী, আলী ইবনু উমার, *আস-সুনান*, (বৈরুত : দারুল মারিফাহ, ১৯৬৬), খ. ১, পৃ. ১৮৯; হা. নং : ৬৪/৩, বাইহাকী, *আস-সুনানুস সুগরা*, অধ্যায় : তাহারাত, পরিচ্ছেদ : আত-তায়াম্মুম, (http://www.alsunnah.com), খ, ১, পৃ. ১৯৯, হা. নং : ১৮১

https://nagorikpathagar.org

এ হাদীস থেকেও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে তাঁর অনুপস্থিতিতে সাহাবীগণ ক্ষেত্রবিশেষে ইজতিহাদ করে আমল করতেন। তবে তিনি এরূপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের ইজতিহাদকে অনুমোদন দেননি। বিশেষ করে যাঁদের ইজতিহাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই, তাঁরা নিজেরা ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত দেবেন– এটা তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না; বরং তাঁদের একান্ত কর্তব্য হলো– বিজ্ঞজনদের শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁদের কথা মেনে চলা।[৯০]

রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে মতপার্থক্যের যে অবস্থা আমরা দেখতে পাই, তার আলোকে আমরা তাঁর সময়কার মতপার্থক্যের কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে তুলে ধরতে পারি।

ক. সাহাবা কিরাম রা. যথাসাধ্য মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতেন। এ কারণে তাঁরা ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে পারে– এমন সব বিষয় ও খুঁটিনাটি ব্যাপার এড়িয়ে যেতেন। তাঁরা কেবল বাধ্য হয়েই সময়ে সময়ে আপতিত বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনাতে নিজেদের করণীয় জানতে চেষ্টা করতেন। এর ফলে আপতিত ঘটনার তাৎক্ষণিক সমাধান বের করার প্রয়োজনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তো দূরের কথা, পরস্পর মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ার সুযোগও তাঁদের বেশি ছিল না।

খ. মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি তাঁদের মধ্যে ঘটনাক্রমে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিত, তখন তাঁরা দেরি না করে দ্রুত আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর শরণাপন্ন হতেন। এভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের মতবিরোধ নিরসন হয়ে যেত।

গ. যেকোনো বিরোধের সময় তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতেন এবং পরিপূর্ণরূপে তা মেনে চলতেন।

عن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السوال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده

৯০. খতীব বাগদাদী, *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ২, পৃ. ৩৫৩

https://nagorikpathagar.org

ঘ. অনেক ব্যাখ্যানির্ভর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সা. মতবিরোধকারীদের পরস্পর ভিন্ন সব মতকেই সঠিক বলে অনুমোদন দান করেছেন। এতে প্রত্যেকেরই এ ধারণা হতো যে, তিনি যে মত পোষণ করেছেন তা যেমন সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তেমনি তাঁর অপর ভাইয়ের মতও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। বস্তুতপক্ষে এ ধারণা মতবিরোধকারীদের প্রত্যেককে একে অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শিক্ষা দেয় এবং নিজের মতের পক্ষে গোঁড়ামি করা থেকে বিরত রাখে।

ঙ. সাহাবীগণের মতবিরোধের পেছনে সকলের একান্ত উদ্দেশ্য ছিল, নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে সত্য বের করা এবং তার ওপর আমল করা। তাঁদের সে মতবিরোধে কোনো প্রকারের স্বার্থপরতা, আত্মপ্রীতি, হঠকারিতা কিংবা গোঁড়ামির স্থান ছিল না।

চ. সাহাবীগণ মতবিরোধের ক্ষেত্রে কখনও ইসলামের সাধারণ শিষ্টাচার লঙ্ঘন করতেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের অভিমত যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতেন, একে অপরের মত গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন, সুন্দর ও মার্জিত ভাষা ব্যবহার করতেন এবং যেকোনোভাবে কটাক্ষ করা থেকে বিরত থাকতেন।

মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসৃত ইখতিলাফের নিয়ম ও শিষ্টাচার

যেমন রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে ফিকহী বিষয়ে ক্ষেত্রবিশেষে ইজতিহাদী মতপার্থক্য দেখা গিয়েছিল, তেমনি তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবা কিরামের আমলেও এরূপ মতপার্থক্য দেখা গিয়েছিল। তদুপরি এ সময়কার অনেক বিষয়ের মতপার্থক্য অমীমাংসিতও থেকে যায়। যেমন– সালাত তরককারীর কাফির হওয়া বা না-হওয়া, গোসলের সময় মহিলাদের মাথার খোঁপা খোলা বা না-খোলা, গর্ভবতী নারী বিধবা হলে ইদ্দতের সময়কাল কতটুকু হবে প্রভৃতি বিষয় সাহাবা কিরামের আমলেও অমীমাংসিত ছিল। সাহাবা কিরাম রা.-এর পর মুজতাহিদ ইমামগণও কুরআন-হাদীস এবং নিজস্ব কতিপয় মূলনীতি অনুসরণ করে নানা বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন এবং তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্যও দেখা দেয়। কিন্তু সাহাবা কিরাম রা. ও মুজতাহিদ ইমামগণের এ মতপার্থক্যের মধ্যে আমরা কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও শিষ্টাচার দেখতে পাই। যেমন–

https://nagorikpathagar.org

ক. নিজের মতকে একমাত্র সঠিক মনে না করা

মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও শরীয়তের অপ্রধান বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন; কিন্তু তাঁদের কেউ নিজের মতকে একমাত্র সঠিক মত এবং অন্যদের মতকে ভ্রান্ত বলে জানতেন না। বরং তাঁদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি হতো এই যে, তাঁর মতটি তাঁর গবেষণা ও চিন্তা অনুযায়ী সঠিক; কিন্তু প্রকৃত বিচারে তা ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। অপরদিকে অন্যের মতটি তাঁর গবেষণা ও চিন্তা অনুযায়ী ভুল; কিন্তু প্রকৃত বিচারে তা সঠিক হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে।

এ কারণে মুজতাহিদ ইমামগণ তাঁদের মতামত খুব কমই দৃঢ়তাসূচক ভাষায় ব্যক্ত করে থাকেন; বরং আমরা তাঁদের প্রায়শ নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে এ কথা বলতে দেখতে পাই যে, هذا أحوط (এটা অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা), هذا أصحّ (এটা অধিকতর বিশুদ্ধ), هذا أحسن (এটা অধিকতর উত্তম), هذا أولى (এটা অধিকতর উপযোগী), هذا ما ينبغي (এটা সমীচীন), نكره هذا (এটা আমরা অপছন্দ করি), لا يعجبني (এটা আমার পছন্দনীয় নয়) প্রভৃতি।

বিশিষ্ট সাহাবীগণের নিয়ম ছিল যে, তাঁরা যখনই কোনো বিষয়ে নিজের রায় ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোনো ফাতওয়া দিতেন, তখন বলতেন–

إن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمنّي ومن الشّيطان؛ والله ورسوله منه بريء.

"যদি তা সঠিক হয়, তবেই তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল হয়, তবে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে এবং তা থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দায়মুক্ত।"[৯১]

---

৯১. সাইয়িদুনা আবূ বকর (দারিমী, *আস-সুনান*, হা. নং : ২৯৭২; বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং : ১২৬২৯), উমার (বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং : ২০৮৪৫; হাকিম, *আল-মুসতাদরাক*, হা. নং : ২৭৩৭) ও আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হা. নং : ২১১৮; দারাকুতনী, *আস-সুনান*, হা. নং : ১৬৫; তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, হা. নং : ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫) থেকে অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

একবার ইমাম মালিক রহ.-কে সাহাবা কিরাম রহ.-এর মতপার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি জবাব দেন–

خطأ وصواب. فانظر في ذلك.

"তাঁদের ইজতিহাদ ভুলও হতে পারে এবং সঠিকও হতে পারে। কাজেই তাঁদের (ইজতিহাদভিত্তিক) মত নিয়ে চিন্তা-ফিকির করো।"[৯২]

ইমাম মালিক রহ. নিজের ইজতিহাদ সম্পর্কেও অকুণ্ঠচিত্তে বলেন–

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيبُ، فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي؛ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ.

"আমি নিছক একজন মানুষ। ভুলও করতে পারি, ঠিকও করতে পারি। অতএব, তোমরা আমার মত নিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখবে। যদি দেখো যে আমার কোনো মত কুরআন ও হাদীসের সাথে পুরো সংগতিপূর্ণ, তবেই তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যদি দেখো যে আমার কোনো মত কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, তাহলে তোমরা তা ছেড়ে দেবে।"[৯৩]

ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফী আল-হানাফী [মৃ. ৭১০ হি.] রহ. বলেন–

إِذَا سُئِلْنَا عَنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ مُخَالِفِنَا قُلْنَا وُجُوبًا: مَذْهَبُنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَمَذْهَبُ مُخَالِفِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ. وَإِذَا سُئِلْنَا عَنْ مُعْتَقَدِنَا وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا. قُلْنَا وُجُوبًا الْحَقُّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَالْبَاطِلُ مَا عَلَيْهِ خُصُومُنَا.

"আমাদের ও আমাদের প্রতিপক্ষের ফিকহী মাযহাব সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হলে আমরা অবশ্যম্ভাবীরূপে বলব– আমাদের মাযহাবই সঠিক, তবে ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর আমাদের প্রতিপক্ষের মাযহাব ভুল, তবে তাও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

---

৯২. হাফিয হুমাইদী, মুহাম্মদ ইবনু ফাতূহ, *জাযওয়াতুল মুকতাবাসফী যিকর উলাতিল আন্দালুস*, (http://www.alwarraq.com), পৃ. ২৯; ইবনু হাযম, *আল-ইহকাম*, খ. ৬, পৃ. ৩১৭

৯৩. ইবনু হাযম, *আল-আহকাম*, খ. ৬, পৃ.৭৯০; বাদরুদ্দীন আয-যারকাশী, *আল-বাহরুল মুহীত*, খ. ৮, পৃ.২০০

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু আমাদের ও আমাদের প্রতিপক্ষের আকীদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অবশ্যম্ভাবীরূপে বলব যে, আমাদের আকীদাই সঠিক এবং প্রতিপক্ষের আকীদা ভ্রান্ত।"[৯৪]

অর্থাৎ, ফিকহী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার সুনিশ্চিত দাবি করা সম্ভব নয়। কেননা, সেক্ষেত্রে অনেক সময় প্রমাণাদি হয় প্রচ্ছন্ন, দ্ব্যর্থবোধক কিংবা দুর্বল। পক্ষান্তরে আকীদার ক্ষেত্রে প্রমাণাদি হচ্ছে স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ও শক্তিশালী। সুতরাং এতে ভিন্নমতের কোনোই অবকাশ নেই। ইমাম নাসাফী রহ.-এর উপর্যুক্ত কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবনু আবিদীন [১১৯৮-১২৫২ হি.] রহ. বলেন–

فَلَا نَجْزِمُ بِأَنَّ مَذْهَبَنَا صَوَابٌ ألْبَتَّةَ وَلَا بِأَنَّ مَذْهَبَ مُخَالِفِنَا خَطَأٌ ألْبَتَّةَ، بِنَاءً عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَنَّ حُكْمَ اللهِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ طَلَبُهُ. فَمَنْ أَصَابَهُ فَهُوَ الْمُصِيبُ وَمَنْ لَا فَهُوَ الْمُخْطِئُ .

"আমরা এ কথা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি না যে, আমাদের মাযহাবই অবশ্যম্ভাবীরূপে সঠিক এবং আমাদের প্রতিপক্ষের মাযহাব অবশ্যম্ভাবীরূপে ভুল। কেননা, পছন্দনীয় মত হলো– প্রতিটি মাসআলায় আল্লাহ তাআলার বিধান একটিই এবং তা সুনির্দিষ্ট– যা অনুসন্ধান করে বের করা ওয়াজিব। কাজেই যিনি উক্ত একক ও সুনির্দিষ্ট বিধানটি সঠিকভাবে আহরণ করতে সমর্থ হবেন, তিনিই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত। পক্ষান্তরে যিনি উক্ত একক ও সুনির্দিষ্ট বিধানটি সঠিকভাবে আহরণ করতে সমর্থ হননি, তিনি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত।"[৯৫]

মুফতি ইবনু মুল্লা ফাররূখ আল-হানাফী [মৃ. ১০৫২ হি.] রহ. বলেন–

الكل كانوا في طلب الحق على حد متساو، واجتهاد كل واحد منهم يحتمل الخطأ كغيره بعد تسليم بلوغهم درجة الاجتهاد وإن تفاوتوا فيه.

---

৯৪. ইবনু নুজাইম, যায়নুদ্দীন, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির*, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০), পৃ. ৩৮১; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১, পৃ. ১১৫

৯৫. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১, পৃ. ১১৬

https://nagorikpathagar.org

"সকলেই তাঁরা সমানভাবে সত্যানুসন্ধানে রত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের ইজতিহাদ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এটা স্বীকার্য যে, তাঁরা প্রত্যেকেই ইজতিহাদের মর্যাদা লাভ করেছেন; যদিও তাঁদের মধ্যে যোগ্যতাগত তারতম্য বিদ্যমান রয়েছে।"[৯৬]

ইমাম ইবনু আমীরিল হাজ আল-হানাফী [মৃ. ৬৬৯-৭৩৩ হি.] রহ. বলেন–

إن رأيه يحتمل الخطأ وإن كان الظاهر عنده أنه الصواب، ورأي غيره يحتمل الصواب وإن كان الظاهر عنده خطأه.

"তাঁর (আবূ হানীফা রহ.-এর) অভিমতও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, যদিও তা বাহ্যত তাঁর নিকট সঠিক এবং অপরদিকে অন্যের মত সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে; যদিও তা বাহ্যত তাঁর নিকট ভুল।"[৯৭]

খলীফা হারুনুর রশীদ [১৪৯-১৯৩ হি.] ইমাম মালিক রহ.-এর নিকট থেকে 'মুওয়াত্তা' শোনে আরয করলেন– 'আমি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।' ইমাম মালিক রহ. বললেন– 'সিদ্ধান্তটি কী?' খলীফা বললেন– 'আমি মুওয়াত্তাটি কাবার দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেবো এবং প্রত্যেক দেশেই এর এক একটি কপি পাঠিয়ে দেবো। উম্মতের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে সকলকে এটা মেনে চলতে এবং এ ছাড়া অন্য মাযহাব ত্যাগ করতে নির্দেশ দেবো।'

খলীফা হারুনুর রশীদের এ আরযের জবাবে ইমাম মালিক রহ. কী বললেন! তিনি জবাব দিলেন– 'না, আমীরুল মুমিনীন। এ জাতীয় কোনো কাজ করবেন না।' খলীফা জানতে চাইলেন– 'কেন?' ইমাম মালিক রহ. বললেন–

إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار، وحدث كل بما سمع من رسول الله، واستقر عمل كل مصر على ما بلغهم عن رسول الله، فلا تغير على الناس ما هم عليه.

"রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গেছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট থেকে যা শুনেছেন, তা-ই বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু, প্রত্যেকে দেশের আমল সেই অবস্থার

---

৯৬. ইবনু মুল্লা ফাররূখ, মুহাম্মদ, *আল-কাওলুস সাদীদ ফী বাদি মাসায়িলিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ*, (কুয়েত : দারুদ দাওয়াহ, ১৯৮৮), পৃ. ৫০-৫১

৯৭. ইবনু আমীরিল হাজ, *আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর ফী ইলমিল উসূল*, খ. ৩, পৃ. ৪৪২

https://nagorikpathagar.org

ওপরই স্থিতিশীলতা লাভ করেছে, যা রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট থেকে তাদের কাছে পৌঁছেছে। কাজেই আপনি লোকদের তাদের স্ব-স্ব অবস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করবেন না।"[৯৮]

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে অনেক বিষয়ে অন্যান্য ইমামের মতানৈক্য রয়েছে; কিন্তু খলীফা যখন তাঁর মাযহাবটি রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বত্র চালু করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তাতে সম্মত হলেন না; বরং তিনি লোকদের তাদের স্ব-স্ব অবস্থানের ওপর বহাল রাখতে নির্দেশ দিলেন।

খ. অপরের মতকে শ্রদ্ধা করা

কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি– এরূপ ইজতিহাদ ও গবেষণাধর্মী বিষয়গুলো নিয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ পরস্পর মতবিরোধ করেছেন ঠিক; কিন্তু এ মতবিরোধের কারণে তাঁদের মধ্যে কখনও দেখা দেয়নি দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও বিভাজন; বরং তাঁরা একে অপরের মত ও ইজতিহাদকে সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন করতেন। সাহাবী, তাবিঈ ও তাঁদের পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে অনেকেই নামাযের মধ্যে বিসমিল্লাহ পড়তেন, আবার অনেকেই পড়তেন না; কেউ তা উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন, আবার কেউ অনুচ্চস্বরে পড়তেন; কেউ ফজরের নামাযের মধ্যে কুনূত পড়তেন, আবার কেউ পড়তেন না; কেউ রক্তমোক্ষণ ও নাক থেকে রক্তক্ষরণের কারণে অজু করতেন, আবার কেউ অজু করতেন না; কেউ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা ও কামভাব সহকারে নারীকে স্পর্শ করার কারণে অজু করতেন, আবার কেউ অজু করতেন না; কেউ আগুনে সিদ্ধ খাবার খেলে অজু করতেন, আবার কেউ অজু করতেন না; কেউ উটের গোশত খেলে অজু করতেন, আবার কেউ করতেন না। এতৎসত্ত্বেও তাঁরা একজন অপরজনের পেছনে নামায পড়তেন। যেমন– ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর শিষ্যগণ, অনুরূপভাবে ইমাম শাফিয়ী ও তাঁর অনুসারী ফকীহগণ মদীনাবাসী মালিকী মতাবলম্বী ও অন্য ইমামগণের পেছনে নামায পড়তেন, যদিও-বা তাঁরা আদপেই নামাযে বিসমিল্লাহ পড়তেন না; না অনুচ্চস্বরে, না উচ্চৈঃস্বরে।[৯৯]

---

৯৮. আতিয়্যাহ, ইবনু মুহাম্মদ সালিম, *শারহুল আরবাঈন লিন-নববী*, (http://www.islamweb.net), পৃ. ৭

৯৯. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ*, (বৈরুত : দারুন নাফায়িস, ১৪০৪ হি.), পৃ. ১১০ ও *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, (কায়রো : দারুল কুতুবিল হাদীসাহ, তা. বি.), পৃ.৩৩৫; ইবনু মুল্লা ফাররূখ, *আল-কাওলুস সাদীদ ফী বাদি মাসায়িলিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ*, পৃ. ১৪০-২

https://nagorikpathagar.org

নিম্নে উদাহরণস্বরূপ এরূপ কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করা হলো–

খ.১. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর মতে, নাক থেকে রক্তক্ষরণ হলে কিংবা রক্তমোক্ষণ করলে অজু ভেঙে যায়। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো– যাদের মাযহাবে এরূপ অবস্থায় অজু ভাঙে না, তাদের পেছনে কি আপনি নামায পড়বেন? তিনি বললেন, كيف لا أصلي خلف الامام مالك وسعيد بن المسيب-"কেন নয়? ইমাম মালিক ও ইমাম সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহ. প্রমুখের পেছনে কেন নামায পড়ব না?!"[১০০] উল্লেখ্য যে, তাঁদের মাযহাবমতে, এরূপ অবস্থায় অজু ভঙ্গ হয় না।

খ. ২. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর মতে, উটের গোশত খেলে অজু ভেঙে যায়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কি ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর পেছনে নামায পড়বেন, যদি তিনি উটের গোশত খেয়ে নামাযে দাঁড়ান?' তিনি বললেন, وكيف لا أصلي خلف الشافعي وخلف مالك بن أنس وخلف فلان وفلان؟!-"কেন নয়? ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম মালিক এবং অন্যান্য ইমামের পেছনে কেন নামায পড়ব না?!"[১০১]

ইমাম আহমাদ রহ.-এর উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো থেকে দুটি বিষয় জানা যায় :

এক. কোনো মাযহাবই ভ্রান্ত নয়। কেননা, সকল মুজতাহিদের মাযহাব ও ইজতিহাদের মূল দলীল হচ্ছে কুরআন, হাদীস ও কিয়াস।

দুই. পরস্পরের মতামত ও ইজতিহাদের প্রতি ইমামগণের পুরো মাত্রায় শ্রদ্ধাবোধ ছিল এবং প্রত্যেকেই একে অপরকে সত্যের একনিষ্ঠ অনুসারী মনে করতেন।

খ.৩. একবার খলীফা হারুনুর রশীদ রক্তমোক্ষণ শেষে নামাযের ইমামত করলেন। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. তাঁর পেছনে নামাযের ইকতিদা করেন এবং

---

১০০. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-ইনসাফ*, পৃ. ১১০ ও *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, পৃ.৩৩৫; ইবনু মুল্লা ফাররূখ, *আল-কাওলুস সাদীদ ফী বাদি মাসায়িলিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ*, পৃ. ১৪২

১০১. আতিয়্যাহ, *শারহুল আরবাঈন লিন-নববী*, পৃ. ৬, ১২

https://nagorikpathagar.org

তিনি তাঁর নামায পুনরায় পড়েননি। অথচ তাঁর মতে, রক্তমোক্ষণের কারণে অজু ভেঙে যায়। উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক রহ.-এর মতে, রক্তমোক্ষণের কারণে অজু ভাঙে না।[১০২]

খ.৪. একবার ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. হাম্মামখানায় গোসল করে জুমুআর নামাযের ইমামত করলেন। নামাযের অনেক পরে জানা গেল যে, হাম্মামখানার কূপের মধ্যে একটি ইঁদুর মৃতাবস্থায় পড়ে আছে। হানাফী মাযহাবমতে, এ অবস্থায় পানি অপবিত্র বিধায় নামায পুনরাবৃত্তি করা দরকার; কিন্তু লোকজন চলে যাওয়ায় তা সম্ভব ছিল না। তখন তিনি বললেন, إذا نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا-"এ মুহূর্তে আমরা আমাদের মাদানী ভাইদের মত অনুসরণ করব। তাঁদের মতে, দু-মটকা পরিমাণ পানিতে নাপাক পড়লে তা অপবিত্র হয় না।"[১০৩]

লক্ষ করার বিষয় হলো, ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. মদীনার ইমাম মালিক রহ. ও তাঁর অনুসারীগণকে 'ভাই' বলে বোঝাতে চাইলেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা উভয় পক্ষই কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করেছি এবং নিজ নিজ চিন্তা ও ইজতিহাদ মোতাবেক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। সুতরাং আমরা সকলেই হকের ওপর রয়েছি। যেহেতু আমাদের উভয় পক্ষের উৎস কুরআন ও হাদীস, তাই আমরা একই মায়ের দুটি সন্তানতুল্য। আরও লক্ষ করার ব্যাপার হলো– সংকটাপন্ন অবস্থায় একজন মুজতাহিদের জন্য অন্য ইমামের মতের ওপর আমল করার যে সুযোগ রয়েছে, আলোচ্য ঘটনা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তা ছাড়া একাধিক মাযহাবের উপস্থিতি সংকটকালে শরীয়তের ওপর আমল করার ক্ষেত্রে যে প্রশস্ততা ও সহজতা এনে দেয়, তাও এ ঘটনা থেকে জানা যায়।

---

১০২. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, আল-ইনসাফ, পৃ. ১০৯ ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃ.৩৩৫; উলুওয়ানী, ড. তোয়াহা জাবির, *আদাবুল ইখতিলাফ ফিল ইসলাম*, কিতাবুল উম্মাহ, (কাতার : ওয়াযারাতুল আওকাফ...), পৃ. ২৯

১০৩. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১, পৃ. ১৮৯; আবূ সাঈদ আল-খাদিমী, মুহাম্মদ, *বারীকাতুন মাহমূদিয়াতুন...*, (http://www.al-islam.com), খ. ৬, পৃ. ৩৩৪-৫; শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-ইনসাফ*, পৃ. ১০৯; ইবনু মুল্লা ফাররূখ, *আল-কাওলুস সাদীদ ফী বাদি মাসায়িলিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ*, পৃ. ১০৪

https://nagorikpathagar.org

খ.৫. ইমাম শাফিয়ী রহ. একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কবরের নিকট ফজরের নামায আদায় করেন। তাঁর মতে, ফজরের নামাযে দুআ কুনূত পড়া আবশ্যক হলেও তিনি এই বলে কুনূত পড়া বাদ দেন যে, এই কবরবাসী ইমাম ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না। তাই আমি আজ তাঁর প্রতি আদব রক্ষা করতে চাই।[১০৪] তিনি আরও বলেন, ربما انحدرنا الى مذهب أهل العراق-"কখনও আমরা ইরাকবাসীদের অনুসৃত মাযহাবের দিকে নেমে আসি।"[১০৫] অনেকের মতে, সেদিন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ পড়েননি। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা রহ. অনুচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন।[১০৬]

গ. দলীল পাওয়া গেলে নিজের অবস্থান প্রত্যাহার করা

মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও নানা বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধ করেছেন; কিন্তু তাঁদের এ মতবিরোধের পেছনে তাঁদের একান্ত উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে খুঁজে বের করা। এক্ষেত্রে কোনোরূপ স্বার্থপরতা ও হঠকারিতা তাঁদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁরা যখনই তাঁদের মতের বিপরীত কোনো সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ দলীল পেতেন, তখনই তাঁরা প্রসন্নচিত্তে নিজের মত পরিত্যাগ করে উক্ত দলীল অনুযায়ী মত পরিবর্তন করে নিতেন। বিশিষ্ট তাবিঈ তাউস [৩৩-১০৬ হি.] রহ. বলেন, رُبَّمَا رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ الرَّأْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ-"ইবনু আব্বাস অনেক সময় (ক্ষেত্রবিশেষে) একটি মত পোষণ করতেন। কিছুদিন পর দেখা যেত, তিনি ওই মতটি ত্যাগ করেছেন।"[১০৭] *হিদায়াহ* গ্রন্থের বিশিষ্ট ভাষ্যকার ইবনুশ শিহনাহ আল-হালাবী আল-হানাফী [৭৪৯-৮১৫ হি.] রহ. বলেন–

إِذَاصَحَّ الْحَدِيثُ وَكَانَ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ عُمِلَ بِالْحَدِيثِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ وَلَايَخْرُجُ مُقَلِّدُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَنَفِيًّا بِالْعَمَلِ بِهِ.

---

১০৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *আল-ইনসাফ*, পৃ. ১১০ ও *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, পৃ. ৩৩৫

১০৫. *তদেক*

১০৬. মুহাম্মদ যাকারিয়া, ইবনু ইয়াহয়া আল-হিন্দী, *আওজাযুল মাসালিকি আলা মুওয়াত্তাল ইমাম মালিক*, খ. ১, পৃ. ১০৩

১০৭. দারিমী, *আস-সুনান*, আল-মুকাদ্দামাহ, পরিচ্ছেদ : ইখতিলাফুল ফুকাহা, খ. ১, পৃ. ১৫৯, হা. নং : ৬৩০

https://nagorikpathagar.org

"যদি মাযহাবের বিপরীত কোনো বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায়, তবে হাদীস অনুযায়ীই আমল করা হবে। অধিকন্তু, ওই হাদীসই হবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মাযহাব এবং ওই হাদীসের মর্মানুযায়ী আমলকারী ব্যক্তি হানাফী মাযহাব থেকে বহির্ভূত হবে না।"[১০৮]

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতেও, যদি কোনো বিষয়ে তাঁর ফয়সালার বিপরীত কোনো বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর মত ছেড়ে হাদীসের মর্মানুযায়ী আমল করতে হবে। তিনি বলেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي-"যদি হাদীস বিশুদ্ধ হয়, তবে তা-ই হবে আমার মাযহাব।"[১০৯] ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন, إِذَا صَحَّ الحَدِيثُ، فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الحَائِطَ-"যদি হাদীস সহীহ হয়, তাহলে তোমরা আমার কথাকে দেওয়ালে নিক্ষেপ করো।"[১১০] নিম্নে উদাহরণস্বরূপ ইমামগণের নিজের মত থেকে ফিরে আসার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো–

গ. ১. ওয়াকফ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ফাতওয়া হলো, কোনো জিনিস ওয়াকফ করার পর সেটা তার ওপর আবশ্যক হয়ে যায় না; বরং সে যেকোনো সময় ওয়াকফকৃত জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারে। অবশ্য যদি সেটা অসিয়তের পর্যায়ের হয় কিংবা শারঈ কাজীর পক্ষ থেকে ফয়সালাকৃত হয়, তখন আর ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে না। আবূ হানীফা রহ.-এর এ ফাতওয়া ছিল জুমহুর ইমামগণের পরিপন্থি এবং সহীহ হাদীসের[১১১] বিপরীত।

---

১০৮. ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.১, পৃ. ১৬৬

১০৯. *তদেক*

১১০. যাহাবী, আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ, *তাযকিরাতুল হুফফায*, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮), পৃ. ১৬৫; ইবনুল ইমাদ, আবদুল হাই, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাবা*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), খ. ৪, পৃ. ৯৯

১১১. হাদীসটি হলো–

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدق بأصله، لا يباع، ولايوهب، ولايورث؛ ولكن ينفق ثمره) . فتصدق به عمر، فتصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو أن يؤكل صديقه غير متمول به.

https://nagorikpathagar.org

এর কারণ, হয়তো তাঁর নিকট এতৎসংক্রান্ত হাদীসটি পৌঁছেনি। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-ও প্রথমদিকে তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ন্যায় মত পোষণ করতেন। কিন্তু যখন তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত হলেন এবং মদীনায় লোকদের তাঁদের জায়গা-সম্পত্তি ওয়াকফ করতে দেখলেন, তখন তিনি নিজের মত থেকে ফিরে আসেন এবং বলেন– "এমন স্পষ্ট ও সহীহ হাদীসের বিপরীত মত পেশ করার অধিকার কারও নেই। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এ হাদীস পেলে বিপরীত মত পোষণ করতেন না।"[১১২]

গ.২. একবার ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. খলীফা হারুনুর রশীদের সাথে মদীনায় আসেন এবং ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় সা-এর পরিমাণ নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. ইমাম মালিক রহ.-কে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'সা-এর পরিমাণ কত?' তিনি জবাব দেন– 'আমাদের নিকট সা-এর পরিমাণ হলো পাঁচ সমস্ত তিন ভাগের এক রিতল।' ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন– 'কিন্তু আমাদের নিকট সা হলো আট রিতল। আমাদের ইমাম আবূ হানীফা রহ. এরূপ মতই ব্যক্ত করেছেন।' তখন ইমাম মালিক রহ. সভায় উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'তোমাদের মধ্যে যার যার কাছে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময় থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে– এরূপ কোনো সা বিদ্যমান থাকলে তা আগামীকাল নিয়ে আসবে।'

"ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময় উমার রা. নিজের কিছু সম্পত্তি সদাকা করেছিলেন। তা ছিল ছামগ নামে একটি খেজুর বাগান। উমার রা. বলেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি একটি সম্পদ পেয়েছি, যা আমার নিকট খুবই পছন্দনীয়। আমি এটা সদাকা করতে চাই।' রাসূলুল্লাহ সা. বলেন– 'মূল সম্পত্তিটি এ শর্তে সদাকা করো যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং কেউ ওয়ারিশও হবে না; বরং তার ফল (আল্লাহর পথে) দান করা হবে।' তারপর উমার সে সম্পত্তিটি সেভাবে সদাকা করলেন। তাঁর এ সদাকা ব্যয় হবে আল্লাহর রাস্তায়, দাসমুক্তির ব্যাপারে, মিসকীন, মেহমান, মুসাফির ও আত্মীয়দের জন্য। এর যে মুতাওয়াল্লী হবে, সে তা থেকে সংগত পরিমাণ আহার করলে কিংবা বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ালে তাতে কোনো দোষ নেই। তবে সে তা সঞ্চয় করতে পারবে না।" (বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ওসায়া, পরিচ্ছেদ : মা লিল ওয়াসি আন ইয়ামালা.., খ. ৩, পৃ. ১০১৭, হা. নং : ২৬১৩)

১১২. তাকী উসমানী, *মাওলানা, মাযহাব কি ও কেন?* (ঢাকা : মোহাম্মদী বুক হাউস, তা. বি.), পৃ.১৭৫-৬

https://nagorikpathagar.org

পরদিন প্রত্যেকেই নিজের চাদরের নিচে একেকটি সা নিয়ে এসে হাজির হলো। তাদের কেউ বলল– আমার মা তার নানি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা এ সা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগে সদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। আবার কেউ বলল, আমার পিতা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ বলল, আমার চাচা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ বলল, আমার মামা অমুক থেকে বর্ণনা করেছেন।... এভাবে সেদিন ইমাম মালিক রহ.-এর নিকট প্রায় ৫০টি সা জমা পড়ল।

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন– আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম, সা-গুলো প্রায় একই মাপের। আমি তন্মধ্য থেকে একটি সা নিয়ে বাজারে গেলাম এবং তা মেপে তার পরিমাণ পাঁচ সমস্ত তিন ভাগের এক রিতল পেলাম। এরপর আমি ইরাকে ফিরে আসি এবং ইরাকবাসীকে লক্ষ্য করে বললাম– 'আমি তোমাদের নিকট একটি নতুন তথ্য নিয়ে এসেছি।' লোকেরা বলল– 'কী সেই নতুন তথ্য?' তিনি বললেন– 'মদীনাতুর রাসূলে সা-এর পরিমাণ হলো পাঁচ সমস্ত তিনভাগের এক রিতল।' লোকেরা বলল– 'তাহলে তো আপনি জনপদের শাইখ অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিরোধিতা করলেন?!' ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বললেন– 'মদীনায় আমি এমন বিষয় দেখতে পেলাম, যার বিরোধিতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' বর্তমান অবধি এ সংক্রান্ত হানাফীগণের মত হলো– ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর দৃষ্টিতে সা-এর পরিমাণ হলো পাঁচ সমস্ত তিন ভাগের এক রিতল, আর ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার রহ. প্রমুখের মতে আট রিতল।[১১৩]

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর এ ঘটনা দুটিতে লক্ষ করার ব্যাপার হলো, ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. নিজের ইমামের মতের অন্ধ অনুকরণ করে বসে থাকেননি; বরং সহীহ হাদীস ও দলীল পাওয়ামাত্রই নিজ ইমামের মত প্রত্যাখ্যান করে সহীহ হাদীসের ওপরই আমল করেছেন। শুধু তা-ই নয়; বরং স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, ইমামের মতের কারণে হাদীস ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজেও শিক্ষা দিয়ে গেছেন– আমার কোনো মত যদি কোনো সহীহ হাদীসের পরিপন্থি বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমরা হাদীসকে গ্রহণ করে আমার মতকে উপেক্ষা করবে।

---

১১৩. আতিয়্যাহ. *শারহুল আরবাঈন লিন-নববী*, পৃ. ৭

https://nagorikpathagar.org

গ.৩. ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর দুটি মাযহাব রয়েছে। একটি হলো– 'কাদীম' (পুরাতন)। এটি তাঁর পুরাতন মাযহাব, যা তিনি বাগদাদে অবস্থানকালে পোষণ করতেন এবং এ মাযহাবের মতগুলো তিনি হিজরী ১৯৫ সালে তাঁর কিতাব *আল-হুজ্জাত*-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি এ মাযহাবের অধিকাংশ মত থেকে ফিরে আসেন এবং এগুলো দ্বারা ফাতওয়া দেওয়া বন্ধ করে দেন। তাঁর এ মাযহাবের মধ্যে সাধারণত মালিকী মাযহাবের মতগুলোর ছাপই বেশি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর অপর মাযহাবটি হলো– 'জাদীদ' (নতুন)। এটি তিনি মিশরে অবস্থানকালে তাঁর পুরাতন মাযহাবের বিপরীতে প্রবর্তন করেন এবং এ মাযহাবের মতগুলো তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব *আল-উম্ম*-এ লিপিবদ্ধ করেন। উত্তরকালে এটিই তাঁর মাযহাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

শাফিয়ী মতাবলম্বী ইমামগণ সকলেই এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন, যদি কোনো মাসআলায় ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর দুটি অভিমত পাওয়া যায়; একটি পুরাতন ও অপরটি নতুন, তাহলে তাঁর নতুন অভিমতটিই গৃহীত হবে। তাঁর পুরাতন মতটি গ্রহণ করা যাবে না। এটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।[১১৪] ইমাম শাফিয়ী রহ. নিজেও বলেন, لَيس فِي حِلٍّ من رَوَى عَنِّي الْقَدِيمَ-"আমার নিকট থেকে 'কাদীম' মত বর্ণনাকারীগণ স্বাধীন নন।"[১১৫] অর্থাৎ, তাঁদের জন্য এটা বর্ণনা করা বৈধ নয়।

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর এ মাযহাব পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো, তিনি জীবনের শেষ অধ্যায়ে এমন অনেক হাদীস অবগত হন– যা তাঁর পক্ষে জীবনের প্রথমদিকে অর্জন করা সম্ভব হয়নি।[১১৬] তা ছাড়া তিনি আরব,

---

১১৪. তবে ১৭টি মাসআলা এর ব্যতিক্রম। এ মাসআলাগুলোতে তাঁর শিষ্যগণ তাঁর কাদীম মতানুসারে ফাতওয়া দিয়েছেন।

১১৫. যারকাশী, *আল-বাহরুল মুহীত*, খ. ৪, পৃ. ৫৭৪

১১৬. যেমন– মোজার ওপর মাসহের সময়সীমা নির্ধারণসংক্রান্ত হাদীসগুলো। ইমাম শাফিয়ী রহ. ইরাকে থাকাকালে ইমাম মালিক রহ.-এর মতো মোজার ওপর মাসেহের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকার পক্ষে ফাতওয়া দেন। পরে তিনি মিশরে এসে এতৎসংক্রান্ত হাদীসগুলো পাওয়ার পর তাঁর পুরাতন মত ত্যাগ করেন এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত সময় নির্ধারণ করে ফাতওয়া দেন। (ইবনু আবদিল বার, *আল-ইস্তিযকারুল জামি*.., বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০, খ. ১, পৃ. ২২১; নববী, আবূ যাকারিয়া ইয়াহয়া, *আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৫৪৫)

https://nagorikpathagar.org

মিশর ও বাগদাদের সার্বিক অবস্থার মধ্যেও বহু পার্থক্য দেখতে পান। বলা বাহুল্য, ক্ষেত্রবিশেষে সময়, স্থান ও অবস্থাভেদে হুকুমের মধ্যেও ভিন্নতা তৈরি হয়।[১১৭] ফলে তাঁর নিকট যে মতগুলো তাঁর পরবর্তীকালে অর্জিত হাদীসের পরিপন্থি বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং তাঁর যে ইজতিহাদগুলো অবস্থা ও সময়োপযোগী মনে হয়নি, তিনি সে মতগুলো অবলীলায় ত্যাগ করেন এবং হাদীসের মর্ম, অবস্থা ও সময়ের দাবি অনুযায়ী নতুন মত গ্রহণ করেন।

ঘ. গবেষণাধর্মী বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বীকে খারাপ মনে না করা

মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব চিন্তা ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে মতপার্থক্য করেছেন; কিন্তু তাঁরা ভিন্নরূপ আমলকারীকে খারাপ জানতেন না। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস সুফইয়ান আস-সাওরী [৯৭-১৬১ হি.] রহ. বলেন, إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه- "মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে কাউকে তোমার মতের বিপরীত কোনো আমল করতে দেখলে তাকে বাধা দিয়ো না।"[১১৮] সুফইয়ান আস-সাওরী রহ. আরও বলেছেন, ما اختلف فيه الفقهاء، فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به- "ফকীহদের মতবিরোধ রয়েছে– এমন ক্ষেত্রে কোনো ভাইকে আমি যেকোনো মত গ্রহণে বাধা দিই না।"[১১৯]

সুফইয়ান আস-সাওরী রহ.-এর উপর্যুক্ত দুটি মন্তব্য থেকে তাঁর এ কর্মনীতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তিনি নিজে একজন উঁচুমাপের মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য মুজতাহিদের মতকে না-হক মনে করতেন না। তদুপরি তাঁর 'ভাই' শব্দটি এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এতে আমাদের জন্য শিক্ষালাভের বহু উপকরণ নিহিত রয়েছে।

---

১১৭. যেমন– ইমাম শাফিয়ী রহ. মিশরে এসে দেখতে পেলেন যে, এখানকার চামড়াশিল্প অনেক উন্নত এবং এটি মিশরের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রেখে চলেছে, যা তিনি হিজাযে দেখতে পাননি। ফলে তিনি এতৎসংক্রান্ত তাঁর পুরাতন মত ত্যাগ করে প্রক্রিয়াজাত চামড়া বিক্রির পক্ষে নতুন ফাতওয়া দেন। (মুরাশালী, ড. মুহাম্মদ, *ইখতিলাফুল ইজতিহাদ ওয়া তাগাইয়ুরুহু ওয়া আছরু যালিকা ফিল ফুতয়া*, বৈরুত : মাজদুল মুওয়াসসাসাহ.., ১৪২৪ হি., পৃ. ৩৮৪)

১১৮. আবূ নুআইম, আহমাদ, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৪০৫ হি.), খ. ৬, পৃ. ৩৬৮; খতীব বাগদাদী, *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ২, পৃ. ৩৫৫

১১৯. খতীব বাগদাদী, *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ২, পৃ. ৩৫৪

https://nagorikpathagar.org

শরীয়তের সাধারণ মূলনীতি হলো, لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه- "মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে বাধা দেওয়া যাবে না। কেবল সর্বসম্মত বিষয়ে বাধা দেওয়া যাবে।"[১২০]

ইমাম আবূ যাকারিয়া আন-নববী [৬৩১-৬৭৬ হি.] রহ. বলেন–

... ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب.

"আলিমগণ কেবল এমন সব ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ করবেন, যেসব কাজ অন্যায় হওয়ার ব্যাপারে উলামা কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে বাধা দান করা বৈধ নয়। কেননা, প্রত্যেক মাযহাবের মুজতাহিদই সঠিক।"[১২১]

ইমাম আবূ হামিদ আল-গাযালী [৪৫০-৫০৫ হি.] রহ. বলেন–

الشرط الرابع أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد، فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر....

"(অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানোর ক্ষেত্রে) চতুর্থ শর্ত হলো– কাজটি সর্বজনপরিচিত মন্দ কাজ হতে হবে এবং এর মন্দ হওয়াটা ইজতিহাদনির্ভর হবে না। কাজেই যেকোনো কাজ মন্দ হওয়াটা ইজতিহাদনির্ভর হলে তাতে বাধা দেওয়া যাবে না। যেমন– কোনো হানাফী মতাবলম্বী ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, সে কোনো শাফিয়ী মতাবলম্বীকে গুইসাপ, হায়েনা ও বিসমিল্লাহ ব্যতীত জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে বাধা দেবে। (কেননা, এগুলো হানাফী মাযহাবে জায়িয না হলেও শাফিয়ী মাযহাবমতে জায়িয।)

---

১২০. সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির*, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.), পৃ. ১৫৮ (কায়িদা নং : ৩৫)

১২১. নববী, *আল-মিনহাজু শারহু সাহীহি মুসলিম*, (বৈরূত : দারু ইহয়াতিত তুরাসিল আরাবী, ১৩৯২ হি.), খ. ২, পৃ. ২৩

https://nagorikpathagar.org

> অনুরূপভাবে শাফিয়ী মতাবলম্বী ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, সে কোনো হানাফী মতাবলম্বীকে নেশা উদ্রেক করে না– এরূপ নাবীয[১২২] পান করার ব্যাপারে বাধা দেবে। (কেননা, নাবীয শাফিয়ী মাযহাবে জায়িয না হলেও হানাফী মাযহাবমতে জায়িয।)[১২৩]

বিজ্ঞ ইমামগণের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, অন্যায় কাজের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে প্রতিবাদকারীকে অবশ্যই এ কথা জানতে হবে, তিনি যে বিষয় থেকে লোকদের বারণ করছেন, তা নিঃসন্দেহে ইমামগণের নিকট সর্বসম্মতভাবে হারাম বা মাকরূহ। ইমামগণ যেসব বিষয়ে হালাল-হারাম কিংবা জায়িয-নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন, সেসব বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কাউকে নিজের মাযহাবের পরিপন্থি কাজ করতে দেখলে তাকে বাধা প্রদান করা সমীচীন নয়।

যেমন ধরুন, আপনি মসজিদে নববীতে বসে দ্বীনী ইলম চর্চা করছেন। এ সময় আপনি দেখতে পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি সালাতুল আসরের পরে মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়ছেন। আর আপনি মনে করেন যে, সালাতুল আসরের পর কোনো নামায নেই। এ অবস্থায় যদি আপনি লোকটিকে কার্যত বাধা দিতে চান, তাহলে আপনাকে জানতে হবে– এ বিষয়ে সকল ইমামের মত কী? যদি আপনি জানতে পারেন যে, ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর মতে, সালাতুল আসরের পর নামায পড়া জায়িয, তাহলে আপনার জন্য নামাযরত লোকটিকে বাধা প্রদান করা সমীচীন হবে না। কেননা, সে তো এ কথা বলতে পারে যে, কী কারণে আমি নামায পড়ব না?! হয়তো তখন আপনি বলবেন যে, তিনজন ইমামের মতে এ সময় কোনো নামায নেই। আপনার এ কথা শুনে লোকটি আপনাকে বলতে পারে যে, আমি তো শাফিয়ী মতাবলম্বী। তাঁর মতে, সালাতুল আসরের পরেও নামায পড়া যায়। আর তোমাদের মাযহাবগুলো আমার মাযহাবের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়। তখন হয়তো আপনি তাকে এতৎসংক্রান্ত হাদীসটি বলবেন। কিন্তু সেও আপনাকে বলতে পারে, এ সম্পর্কে অপর একটি হাদীস রয়েছে যে, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي-"যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন নামায পড়া ব্যতীত বসে না যায়।" এভাবে আপনি হয়তো এমন এক ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যাবেন– যা বাঞ্ছনীয় নয়।

---

১২২. নাবীয : খেজুর বা আঙুরের নির্যাস, যা মদ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে গণ্য হয়।

১২৩. গাযালী, *ইহয়াউ উলূমিদ্দীন*, খ. ২, পৃ. ৩২৫

https://nagorikpathagar.org

৬. ইমামগণের একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও একে অপরের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন এবং যে কারণে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাব গড়ে উঠেছে; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। তাঁরা একে অপরকে সম্মান করতেন এবং প্রত্যেকেই অপরের যোগ্যতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতেন। কেউ কাউকে নিজের মত গ্রহণ করার জন্য চেষ্টাও চালাননি এবং একে অপরের জ্ঞান ও দ্বীনদারীর ওপর কোনোরূপ অভিযোগও আরোপ করেননি। অধিকন্তু, প্রত্যেকেই একে অপরের সশ্রদ্ধ প্রশংসা করেছেন। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ তাঁদের এরূপ কয়েকটি প্রসিদ্ধ মন্তব্য ও ঘটনা তুলে ধরছি।

৬.১. ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তাঁর শিষ্যদের সাথে ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর মতপার্থক্যের কথা সর্বজনবিদিত। এ মতপার্থক্যের কারণে আলাদা দুটি মাযহাবের উদ্ভব হয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্মান ও সম্পর্ক কেমন মধুর ছিল, নিম্নে উল্লেখিত ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর কয়েকটি মন্তব্য থেকে তা পরিস্ফুট হবে। তিনি ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শ্রেষ্ঠত্বের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة رحمه الله-"কেউ ফিকহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চাইলে তাকে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শিষ্যত্ব বরণ করতেই হবে।"[১২৪] তিনি আরও বলেন, الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه.-"লোকেরা ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কাছে শিষ্যস্বরূপ।"[১২৫] তিনি আরও বলেন, ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة. يعني ما علمت-" ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর চাইতে বিজ্ঞ কোনো ফকীহ আমি দেখতে পাইনি।"[১২৬] তিনি আরও বলেন, كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه-"আবূ হানীফা ছিলেন স্বভাবজাত ফকীহদের অন্যতম।"[১২৭]

---

১২৪. খতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ১৩, পৃ. ৩৪৬; আবদুল আযীয আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, খ. ১, পৃ. ৩০

১২৫. খতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৬

১২৬. *তদেক*

১২৭. *তদেক*

https://nagorikpathagar.org

এমনকি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শিষ্যদের প্রতিও তিনি ছিলেন একান্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি বলেন–

من أراد الفقه فليلزم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله والله، ما صرت فقيها إلا باطلاعي في كتب أبي حنيفة، لو لحقته قد لازمت مجلسه.

"কেউ ফিকহ অর্জন করতে চাইলে সে যেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শিষ্যদের সাহচর্য গ্রহণ করে। আল্লাহর কসম! আবূ হানীফা রহ. (অর্থাৎ তাঁর শিষ্যদের) গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেই আমি ফকীহ হতে পেরেছি। যদি আমি তাঁর সাক্ষাৎ পেতাম, তাহলে আমি সর্বক্ষণ তাঁর মজলিসে বসে থাকতাম!"[১২৮]

৬.২. ইমাম মালিক রহ. নিজে একজন বড়ো মুজতাহিদ। এতৎসত্ত্বেও তিনি ফিকহ ও ইজতিহাদে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অসামান্য যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته– "আমি এমন এক অসাধারণ ব্যক্তি (আবূ হানীফা রহ.)-কে দেখলাম, যাকে যদি তুমি বলো যে, (গাছের) এ স্তম্ভকে স্বর্ণরূপে প্রমাণিত করো, তাহলে তিনি দলীল-প্রমাণ দ্বারা (গাছের) এ স্তম্ভকে স্বর্ণরূপে প্রমাণিত করে ছাড়বেন।"[১২৯]

ইমাম লাইস ইবনু সাদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মদীনায় ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। আমি তাঁকে বললাম, আমি তো আপনার কপালে ঘাম মাসেহ করার গন্ধ পাচ্ছি! ইমাম মালিক রহ. বললেন, عرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري.–"আবূ হানীফা রহ.-এর কারণে আমার গলদঘর্ম হয়ে গেছে। হে মিশরীয় আলিম, তিনি অবশ্যই একজন ফকীহ।" লাইস রহ. বলেন, পরে আমি আবূ হানীফা রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে বললাম, আপনার ব্যাপারে ইমাম মালিকের মন্তব্য কতই-না উত্তম! তখন তিনি বললেন, ما رأيت أسرع منه بجواب صادق وزهد تام–"আমি ইমাম মালিক রহ.-এর চেয়ে দ্রুত সঠিক জবাব দিতে পারেন এবং পূর্ণ নির্মোহ এমন কাউকে দেখতে পাইনি।"[১৩০]

---

১২৮. আবদুল আযীয আল-বুখারী, *কাশফুল আসরার*, খ. ১, পৃ. ৩০

১২৯. খতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৮; যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯৯; ইবনু খল্লিকান, *ওয়াফাইয়াতু আইয়ান*, খ. ৫, পৃ. ৪০৯

১৩০. কাদী ইয়াদ, *তারতীবুল মাদারিক ওয়া তাকরীবুল মাসালিক*, (http://www.alwarraq.com), খ. ১, পৃ. ৩৬

https://nagorikpathagar.org

লক্ষ করার ব্যাপার হলো, তিনজনই বড়ো বড়ো মুজতাহিদ এবং আলাদা তিনটি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা; এতৎসত্ত্বেও তাঁরা যেভাবে একে অপরকে দারুণ মর্যাদাপূর্ণ মূল্যায়ন করলেন, তাতে আমাদের জন্য শিক্ষালাভের অনেক উপকরণ বিদ্যমান।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর একজন প্রধান শিষ্য। তিনি মদীনায় গিয়ে ইমাম মালিক রহ.-এর সাথে মিলিত হন এবং তিন বছর তাঁর সাহচর্যে অতিবাহিত করেন এবং মুওয়াত্তা শোনেন। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর এক প্রশ্নের জবাবে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন যে, ইমাম মালিক রহ. রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাতসংক্রান্ত বিষয়ে সবার চেয়ে বড়ো জ্ঞানী।[১৩১]

৬.৩. ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. দুজনেই দুটি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর একে অপরকে শ্রদ্ধা করতেন। একদিন ইমাম শাফিয়ী রহ. ইমাম আহমাদ রহ.-কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

> إذا صح عندكم الحديث، فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالاخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا.
>
> "যেহেতু হাদীস ও রিজালশাস্ত্রে আপনারা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেহেতু আমাদের অজানা কোনো সহীহ হাদীস আপনাদের সংগ্রহে থাকলে অবশ্যই আমাদের জানাবেন। সেজন্য প্রয়োজন হলে আমি সুদূর কূফা বা বসরা বা শাম সফর করতেও তৈরি আছি।[১৩২]

অন্য মাযহাবের ইমামের সামনে একজন বরেণ্য ইমামের এমন অতুলনীয় বিনয় প্রকাশ নিঃসন্দেহে তাঁদের ইখলাস, আন্তরিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। অপরদিকে ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর প্রতি ইমাম আহমাদ রহ.-এর সশ্রদ্ধ অনুভূতিও লক্ষ করার মতো। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

---

১৩১. কাদী ইয়াদ, *তারতীবুল মাদারিক...*, খ. ১, পৃ. ২১, ৩৬; আবূ নুআইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, খ. ৯, পৃ. ৭৪

১৩২. যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১১, পৃ. ২১৩

https://nagorikpathagar.org

إن الله يقيض في رأس كل مائة سنة من يعلم الناس دينهم-"প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় আল্লাহ তাআলা এমন এক ব্যক্তি পাঠান, যিনি মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দান করেন।" এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, فكان في المائة الأولى عمر بن عبد العزيز، وفي المائة الثانية الشافعي-"প্রথম শতাব্দীতে সেই মানুষটি ছিলেন উমার ইবনু আবদিল আযীয। আর দ্বিতীয় শতাব্দীতে হলেন ইমাম শাফিয়ী রহ.।"[১৩৩] ইমাম আহম রহ. আরও বলেছেন, ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي "আমি চল্লিশ বছর ধরে প্রত্যেক নামাযে তাঁর জন্য দুআ করে আসছি।"[১৩৪] একবার ইমাম আহমাদ রহ.-এর পুত্র আবদুল্লাহ রহ. তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেন ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর কথা বেশি বেশি আলোচনা করেন এবং তাঁর জন্য দুআ করেন। তখন তিনি বলেন, يا بني كان الشافعي كالعافية للناس وكالشمس للدنيا-"প্রিয় পুত্র! ইমাম শাফিয়ী হলেন মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির আরোগ্য; তিনি হলেন পৃথিবীর জন্য সূর্যতুল্য।"[১৩৫] ইমাম আহমাদ রহ. আরও বলেন, مارأيت أحدا أتبع للحديث من الشافعي-"সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণেও তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"[১৩৬]

ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, كان الفقه قفلاً على أهله حتى فتحه الله بالشافعي.-"ফিকহ তালাবদ্ধ ছিল। ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর মাধ্যমে আল্লাহ সে তালা খুলেছেন।"[১৩৭] আরও বলেন, ما أحد يعلم في الفقه كان أحرى بأن يصيب السنة لا يخطئ إلا الشافعي-"ফিকহের আলোচনায় তাঁর চেয়ে কম ভুল আর কারও নেই।"[১৩৮]

---

১৩৩. আযীমাবাদী, মুহাম্মদ শামসুল হক, *আউনুল মাবুদ আলা সুনানি আবী দাউদ*, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.), খ. ১১, পৃ. ২৬১

১৩৪. ইবনু আসাকির, আবুল কাসিম আলী, *তারীখু দিমাশক*, (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.), খ. ৫১, পৃ. ৩৪৬

১৩৫. ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ. ৫১, পৃ. ৩৪৯

১৩৬. আবূ নুআইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, খ. ৯, পৃ. ১০৭

১৩৭. ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ. ৫১, পৃ. ৩৪৫; নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, পৃ. ৮৬

১৩৮. ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ. ৫১, পৃ. ৩৫০

https://nagorikpathagar.org

৬.৪. ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম মালিক রহ. দুজনেই বড়ো মুজতাহিদ ছিলেন। এতৎসত্ত্বেও তাঁদের দুজনের পরস্পরের মূল্যায়ন দেখুন, ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন, عنه أخذنا العلم، وإنما أنا غلام من غلمان مالك-"আমি তাঁর খিদমতে থেকে ইলম হাসিল করেছি। আমি তাঁর একজন গোলামমাত্র।"[১৩৯]

মুহাম্মাদ ইবনুল হাকাম রহ. বলেন, ইমাম শাফিয়ী রহ. ইমাম মালিক রহ.-এর কোনো উদ্ধৃতি এভাবে দিতেন যে, هذا قول الأستاذ-"এটা উস্তাদের (অর্থাৎ ইমাম মালিকের) বক্তব্য।"[১৪০] ইমাম শাফিয়ী রহ. বলতেন, ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك-"জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক রহ.-এর সংকলিত কিতাবের চেয়ে বিশুদ্ধ কোনো কিতাব পৃথিবীতে নেই।"[১৪১] তিনি আরও বলেন, إذا ذكر العلماء فمالك النجم-"আলিমগণের আলোচনা হলে সকলের মাঝে ইমাম মালিক রহ.-এর অবস্থান হবে নক্ষত্রতুল্য।"[১৪২] তিনি আরও বলেন, لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. -"ইমাম মালিক ও সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহ. না হলে হিজাযের ইলম বিলুপ্ত হয়ে যেত।"[১৪৩] অপরদিকে ইমাম মালিক রহ. ইমাম শাফিয়ী রহ. সম্পর্কে বলেন, "শাফিয়ী রহ.-এর চেয়ে মেধাবী কোনো কুরাইশী তরুণ আমার কাছে আসেনি।"[১৪৪]

---

১৩৯. কাদী ইয়াদ, *তারতীবুল মাদারিক...*, খ. ১, পৃ. ৩৬, ১৩৮

১৪০. *তদেক*

১৪১. ইবনু আবী হাতিম আর-রাযী, আবদুর রহমান, *আল-জারহু ওয়াত তাদীল*, (হায়দরাবাদ : মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯৫২), খ. ১, পৃ. ১২; যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ১৫৪

১৪২. যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ১৫৪। কোথাও কোথাও ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর বক্তব্যটি এভাবে এসেছে, إذا جاء الأثر، فمالك النجم.-"হাদীসের আলোচনা এলে সকলের মধ্যে ইমাম মালিকের অবস্থান হলো নক্ষত্রের মতো।" (নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, পৃ. ৬০০)

১৪৩. ইবনু আবী হাতিম আর-রাযী, *আল-জারহু ওয়াত তাদীল*, খ. ১, পৃ. ১২; খতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ৯, পৃ. ১৭৯; যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ১, পৃ. ১৫৪

১৪৪. ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, *মানাকিবুশ শাফিয়ী*, (কায়রো : মাকতাবাতুল কুল্লিয়াত আল-আযহারিয়্যাহ, ১৪০৬ হি.), পৃ. ৫৮

https://nagorikpathagar.org

চ. নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত মতপার্থক্য না করা

আমরা আমাদের সালাফে সালিহীন (পূর্বসূরি) ও মুজতাহিদ ইমামগণকে দেখতে পাই যে, তাঁরা যেকোনো বিষয়ে ফাতওয়াদানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতেন না। কারও কোনো প্রশ্নের জবাব দৃঢ়ভাবে জানা না থাকলে তিনি সরাসরি 'জানি না' বলে উত্তর দিতেন; আন্দাজ-অনুমানের ওপর ভিত্তি করে খামাখা ইখতিলাফে জড়িয়ে পড়তেন না। বর্ণিত আছে, একবার কিছু লোক আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা.-এর জনৈক পুত্র থেকে এমন একটি মাসআলা সম্পর্কে জানতে চাইল, যে ব্যাপারে তাঁর যথাযথ জ্ঞান ছিল না। এ সময় ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ তাঁকে বললেন–

وَاللهِ! إِنَّ لأُعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَيِ الْهُدَى – يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ – تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ.

"আপনি হলেন হিদায়াতের দুজন ইমাম অর্থাৎ সাইয়িদুনা উমার ও তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর সন্তান! আপনার নিকট একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অথচ আপনার নিকট এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। আল্লাহর কসম! তা কেমন করে হতে পারে? এটা তো রীতিমতো আশ্চর্যের ব্যাপার!"

তিনি জবাব দিলেন–

أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَاللهِ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ.

"আল্লাহর কসম! আল্লাহর নিকট এবং তাঁর জ্ঞানী বান্দাদের নিকট এরচেয়েও বড়ো জঘন্য ব্যাপার হলো– আমি যথার্থ ইলম ছাড়া কোনো মত প্রকাশ করব কিংবা অবিশ্বস্ত লোকদের নিকট শুনে কিছু বর্ণনা করব।"[১৪৫]

বিশিষ্ট তাবিঈ আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী [৬৬-১৩১ হি.] রহ. বলেন–

أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء.

---

১৪৫. মুসলিম, *আস-সহীহ, আল-মুকাদ্দামাহ*, খ. ১, পৃ. ১২, হা. নং : ৩৭

https://nagorikpathagar.org

"বস্তুত সে সকল লোকই ফাতওয়া দেওয়ার ব্যাপারে অতি উৎসাহী হয়ে ওঠেন, যারা ইমামগণের মতপার্থক্য সম্পর্কে খুব কম জ্ঞানই রাখেন। অপরদিকে যারা ইমামগণের মতপার্থক্য সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন, তাঁরা ফাতওয়া দেওয়া থেকে সর্বাধিক বিরত থাকেন।"[১৪৬]

বিশিষ্ট তাবিঈ আলকামাহ ইবনু কাইস [মৃ. ৬২ হি.][১৪৭] ও ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ [১০৭-১৯৮ হি.][১৪৮] রহ. প্রমুখ থেকেও অনুরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন–

لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا، يكون له المهنأ وعلي الوزر.

"যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইলম বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না হতো, তাহলে আমি ফাতওয়া প্রদান করতাম না। কেননা, প্রশ্নকারী বিনা পরিশ্রমে উত্তর পেয়ে গেলেও উত্তর প্রদানের দায়ভার আমার ওপরই রয়ে যায়।"[১৪৯]

হায়সাম ইবনু জামীল [মৃ. ২১৩ হি.] রহ. বলেন, আমি দেখেছি যে, একবার ইমাম মালিক রহ. থেকে চল্লিশটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি মাত্র চারটি বিষয়ের জবাব দেন, বাকি ছত্রিশটি বিষয় সম্পর্কে বলেন, لا أدري-'আমি জানি না।'[১৫০] ইমাম মালিক রহ. সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, একবার তাঁকে পঞ্চাশটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি একটি মাসআলারও জবাব দেননি; বরং বললেন–

---

১৪৬. ইবনুল মুবারক, *আয-যুহদ*, পৃ. ১২৫, হা.নং : ৪১৩; ইবনু আবদিল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলম*, খ. ২, পৃ. ১০২-৩, হা. নং : ৮০০

১৪৭. খতীব বাগদাদী, *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ২, পৃ. ২০৮, হা. নং : ৬৩৪

১৪৮. ইবনু আবদিল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলম*, খ. ২, পৃ. ১০৩, হা. নং : ৮০১

১৪৯. খতীব বাগদাদী, *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ২, পৃ. ৫০; নববী, *আদাবুল ফাতওয়া*, (দিমাশক : দারুল ফিকর, ১৪০৮ হি.), পৃ. ১৬

১৫০. নববী, *আদাবুল ফাতওয়া*, পৃ. ১৬; নুমান আল-আলূসী, ইবনু মাহমূদ, *জালাউল আইনাইন ফী মুহাকামাতিল আহমাদাইন*, (মাতবাআতুল মাদানী, ১৯৮১), খ. ১, পৃ. ১৮৩; ইবনু আবিল ওয়াফা, আবদুল কাদির, *আল-জাওয়াহিরুল মুদিয়্যাতু ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ*, (করাচি : মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ৪৫৮

https://nagorikpathagar.org

من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب.

"যে কোনো মাসআলার উত্তর দিতে চায়, সে যেন প্রথমে নিজেকে জান্নাত ও জাহান্নামের সামনে পেশ করে এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের পথ বের করে নেয়, অতঃপর উত্তর প্রদান করে।"[১৫১]

আরেক দিন ইমাম মালিক রহ.-কে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি 'আমি জানি না' বললেন। বলা হলো, هي مسألة خفيفة سهلة. -"এ তো একটি অতি সহজ মাসআলা।" তখন তিনি রেগে গিয়ে বললেন, ليس في العلم شيء خفيف.-"ইলমের মধ্যে সহজ বলতে কিছুই নেই।"[১৫২]

ইমাম শাফিয়ী রহ.-কে একটি মাসআলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার উত্তর দেননি। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন, حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب.-"আমি যখন জানব, চুপ থাকার মধ্যে নাকি উত্তর দেওয়ার মধ্যে সওয়াব হয়, তখনই আমি উত্তর দেবো।"[১৫৩] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. সম্পর্কেও জানা যায় যে, তিনি অধিকাংশ সময় প্রশ্নের উত্তরে 'আমি জানি না' বলতেন। ইমাম আল-আসরাম [মৃ. ২৭৩ হি.] রহ. বলেন, سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري.-"আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ.-কে অধিকাংশ সময় মাসআলাসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে 'আমি জানি না' বলতে শুনেছি।"[১৫৪]

ছ. অভিজ্ঞজনের ওপর ফাতওয়ার ভার ন্যস্ত করা

ইসলামের একটি মহান শিক্ষা হলো– জ্ঞানে, গুণে ও বয়সে বড়োজনকে শ্রদ্ধা করা। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا.-"যে আমাদের ছোটোজনকে দয়া করবে না এবং বড়োজনকে শ্রদ্ধা-সম্মান করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।"[১৫৫]

---

১৫১. নববী, *আদাবুল ফাতওয়া*, পৃ. ১৬

১৫২. *তদেক*

১৫৩. নববী, *আদাবুল ফাতওয়া*, পৃ. ১৫

১৫৪. *তদেক*

১৫৫. তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির্‌র.., পরিচ্ছেদ : রাহমাতুস সিবয়ান, খ. ৪, পৃ. ৩২১, হা. নং : ১৯১৯

https://nagorikpathagar.org

কাজেই বড়োজনদের সামনে নিজের পান্ডিত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চেষ্টা করা এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে খামাখা মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নয়। কখনও কোথাও নিজের অভিমত পেশ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা আমাদের সালাফে সালিহীন ও মুজতাহিদ ইমামগণকে দেখতে পাই যে, তাঁরা যেকোনো বিষয়ে ফাতওয়াদানের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতেন না। তাঁরা নিজেরা পারতপক্ষে ফাতওয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকতেন এবং আন্তরিকভাবে কামনা করতেন যে, তাঁদের পক্ষ থেকে অপর কেউ ফাতওয়া দান করুক। আবার অনেকেই নিজে মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও গুরু ও অভিজ্ঞজনের নিকট ফাতওয়ার ভার ন্যস্ত করতে চাইতেন। ইমাম শাবী, আল-হাসান আল-বাসরী ও আবূ হাসীন আল-আসাদী রহ. প্রমুখ তাবিঈগণ বলেন–

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُفْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَوْ وَرَدَتْ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه جَمَعَ لَهَا أَهْلَ بَدْرٍ.

"তোমাদের যে কেউ তো যেকোনো মাসআলায় ফাতওয়া দিতে চাও। অথচ সাইয়িদুনা উমার রা.-এর নিকট যখন কোনো মাসআলা উত্থাপিত হতো, তখন তিনি নিজে উত্তর না দিয়ে এর জন্য বদরী সাহাবীগণকে একত্রিত করতেন, যেন তাঁরাই মাসআলাটির উত্তর প্রদান করেন।"[১৫৬]

বিশিষ্ট তাবিঈ আবদুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা রহ. বলেন–

أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم – فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه قد كفاه الحديث، ولا مفتٍ إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.

কোনো কোনো সূত্রে وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا-এর পরিবর্তে وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا এসেছে। এর অর্থ হলো– যে আমাদের বড়োজনের অধিকার জানল না...। (আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : আর-রহমাত, খ. ৪, পৃ. ৪৪১, হা. নং : ৪৯৪৫)

১৫৬. নববী, *আদাবুল ফাতওয়া*, পৃ. ১৬; ইবনুস সালাহ, *আদাবুল মুফতী ওয়াল মুস্তাফতী*, পৃ. ১০

https://nagorikpathagar.org

"আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর ১২০ জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছি; কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ হাদীস বর্ণনা করতে চাইতেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই কামনা করতেন যে, তাঁর অপর ভাইদের হাদীস বর্ণনা তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে তাঁদের মধ্যে কেউ ফাতওয়া দিতে চাইতেন না। তবে তাঁরা প্রত্যেকেই কামনা করতেন যে, তাঁর অপর ভাইদের ফাতওয়াই তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে।"[১৫৭]

মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আল-মুরাদী রহ. থেকে বর্ণিত, মদীনার বিশিষ্ট শাইখ আবূ ইসহাক রহ. বলেন–

"আমি ওই যুগে লোকদের দেখতাম যে, যখন তাদের নিকট কেউ কোনো প্রশ্ন নিয়ে আসত, তখন তারা তাকে এক মজলিস থেকে অন্য মজলিসে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে তাকে মদীনার বিশিষ্ট ফকীহ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহ.-এর নিকট পাঠানো হতো। এর কারণ ছিল, তারা নিজেরা ফাতওয়া দিতে পছন্দ করতেন না এবং তাঁরা সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যাবকে এজন্য الجريء (দুঃসাহসী) নামে অভিহিত করতেন।"[১৫৮]

সুফইয়ান আস-সাওরী [৯৫-১৬১ হি.] রহ. নিজে একজন মুজতাহিদ ও ইমাম ছিলেন এবং ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সাথে তাঁর অনেক মতপার্থক্যও ছিল; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর মতামতের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি তাঁকে যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহরূপে জানতেন।[১৫৯] বর্ণিত আছে যে, একসাথে হজ আদায়ের সময় সুফইয়ান আস-সাওরী রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর পেছনে চলতেন। আর কোনো মাসআলা পেশ হলে তিনি নীরব থাকতেন; ইমাম আবূ হানীফা রহ.-ই জবাব দিতেন।

আমাদের চারজন প্রধান মুজতাহিদ ইমামের প্রত্যেকের বিশিষ্ট সাথিগণ 'মুজতাহিদে মুতলাক'-এর পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র 'মাদরাসাতুল ফিকহ' পত্তন করার মতো যোগ্যতা ছিল। কিন্তু তাঁরা তাঁদের

---

১৫৭. ইবনু সাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ১১০; ইবনুল মুবারক, *আয-যুহদ*, হা. নং : ৫৮; বাইহাকী, *আল-মাদখাল..*, খ. ২, পৃ. ১৭৪-৫, হা. নং : ৬৫৪, ৬৫৫; ইবনু আবদিল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলম*, খ. ২, পৃ. ৩১৫, হা. নং : ১১৩৭

১৫৮. ইবনু আবদিল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলম*, খ. ২, পৃ. ৩১৭, হা. নং : ১১৪৩

১৫৯. খতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৪৪

https://nagorikpathagar.org

উস্তাযের জীবদ্দশায় তাঁদের অধীনেই কাজ করে গেছেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেন–

> "আমি দশ বছর পর্যন্ত আমার উস্তায হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলাইমান [মৃ. ১২০ হি.] রহ.-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছি। একসময় নিজের মনের মধ্যে আলাদা মজলিস প্রতিষ্ঠা করার ভাবনা তৈরি হয়। এ উদ্দেশ্যে একদিন সন্ধ্যায় মসজিদেও গিয়েছিলাম, কিন্তু মনকে মানাতে পারলাম না। পুনরায় উস্তাযের মজলিসেই ফিরে এলাম। এদিকে ঘটনাক্রমে বসরায় তাঁর এক আত্মীয় ইন্তিকাল করেন। তিনি আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে বসরা চলে যান। তাঁর প্রস্থানের পর মজলিসে নতুন নতুন প্রশ্ন আসতে লাগল, যেগুলোর উত্তর আমি হাম্মাদ রহ.-এর কাছ থেকে ইতঃপূর্বে শুনিনি। আমি উত্তর দিতাম এবং সেগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখতাম। দুই মাস পর হাম্মাদ রহ. ফিরে এলেন। আমি উত্তরগুলো তাঁকে দেখালাম। প্রায় ষাটটি উত্তর ছিল। তিনি বিশটি উত্তরে দ্বিমত প্রকাশ করলেন। এরপর আমি সংকল্প করলাম যে, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁকে ছেড়ে যাব না। এভাবে আমি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আঠারো বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর সাহচর্যে অতিবাহিত করি।"[১৬০]

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. সম্পর্কেও বর্ণিত আছে, একবার তিনিও পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করার আগে মজলিস কায়েম করেছিলেন। তখন ইমাম আবূ হানীফা রহ. এক ব্যক্তিকে একটি প্রশ্ন দিয়ে তাঁর কাছে পাঠালেন। লোকটি ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মজলিসে গিয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শেখানো প্রশ্নটি করলেন এবং তাঁর জবাব শুনে তা অশুদ্ধ বলে মত ব্যক্ত করলেন। এরপর আবূ ইউসুফ রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মজলিসে এসে উপস্থিত হন। এ সময় ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, تَزَبَّبْتَ قَبْلَ أَنْ تُحَصْرِمَ -"সবেমাত্র আঙুর হওয়া শুরু হলো আর তাতেই কিশমিশ বনে গেলে!'[১৬১] তিনি আরও বললেন, من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه-"যে ব্যক্তি মনে করে যে, তার

---

১৬০. খতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৩৩; মিযযী, *তাহযীবুল কামাল*, খ. ২৯, পৃ. ৪২৭; যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ৬, পৃ. ৩৯৮

১৬১. ইবনু নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির*, পৃ. ৪২৫; ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয যাহাব*, খ. ১, পৃ. ৩২৩

https://nagorikpathagar.org

আর শেখার প্রয়োজন নেই, সে যেন নিজের জন্য ক্রন্দন করে।"[১৬২] অবশেষে আবূ ইউসুফ রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করে তাঁর তত্ত্বাবধানেই ফিকহের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

জ. শারঈ দলীলনির্ভর প্রচলিত রীতির প্রতি নজর রাখা

সালাফে সালিহীন ও মুজতাহিদ ইমামগণ ফাতওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য দেশে শারঈ দলীলনির্ভর প্রচলিত রীতির প্রতি নজর রাখার চেষ্টা করতেন। তাঁরা দেশে কোনো মুজতাহিদ ইমামের মতানুযায়ী প্রচলন লাভ করেছে– এরূপ কোনো রীতির পরিপন্থি ফাতওয়া প্রচার করে এবং সে আলোকে আমলের জন্য লোকদের উৎসাহিত করে উম্মতের মধ্যে কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে কিংবা তাদের বিভক্ত করতে চাইতেন না।

হুমাইদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খলীফা উমার ইবনু আবদিল আযীয রহ.-এর নিকট ফকীহদের মতপার্থক্য দূর করে সকলকে অভিন্ন মতে একত্রিত করতে আরয করলাম, لو جمعت الناس على شيء!-'যদি আপনি সকল লোককেই অভিন্ন মতের ওপর একত্রিত করতেন!' খলীফা উমার ইবনু আবদিল আযীয রহ. জবাব দেন, ما يسرني انهم لم يختلفوا.-'তাঁদের অর্থাৎ সাহাবীগণের মতভিন্নতা না থাকাটা আমার কাছে আনন্দের বিষয় নয়।' এরপর তিনি বিভিন্ন দেশে এ মর্মে নির্দেশ লিখে পাঠান, ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم.- "প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই যেন নিজ নিজ দেশের ফকীহগণের সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে ফায়সালা পেশ করে।"[১৬৩] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, খলীফা হারুনুর রশীদ যখন উম্মতের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে সকলকে *মুওয়াত্তার* ওপর একমত করতে চেয়েছিলেন, তখন ইমাম মালিক রহ. এরূপ কাজ করতে বাধা দেন এবং বলেন–

إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد تفرقوا في الأمصار، وحدث كل بما سمع من رسول الله، واستقر عمل كل مصر على ما بلغهم عن رسول الله، فلا تغير على الناس ما هم عليه.

---

১৬২. খতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ. ১৩, পৃ. ৩৫০; ইবনু খল্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান, খ. ৫, পৃ. ৪০৮

১৬৩. দারিমী, *আস-সুনান*, মুকাদ্দামাহ পরিচ্ছেদ : ইখতিলাফুল ফুকাহা, খ. ১, পৃ. ১৫৯, হা. নং : ৬২৮

https://nagorikpathagar.org

"রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গেছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট থেকে যা শুনেছেন, তা-ই বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু, প্রত্যেক দেশের আমল সেই অবস্থার ওপরই স্থিতিশীলতা লাভ করেছে– যা রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট থেকে তাদের কাছে পৌঁছেছে। কাজেই আপনি লোকদের তাদের স্ব-স্ব অবস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করবেন না।"[১৬৪]

শাইখ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াহইয়া রহ. বলেন, একবার (হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম) কাজী আবূ ইয়ালা [মৃ. ৪৫৮ হি.] রহ.-এর নিকট জনৈক ফকীহ এসে তাঁর কাছে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর মাযহাব অধ্যয়ন করতে চাইলেন। তখন তিনি তাঁর দেশ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকটি তাঁর দেশ সম্পর্কে অবহিত করলে পরে কাজী আবূ ইয়ালা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, -إن أهل بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعي فلماذا عدلت أنت عنه الى مذهبنا. "তোমার দেশের সকলেই তো ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর মাযহাব অধ্যয়ন করে। তবে তুমি কেন তাঁর মাযহাব ছেড়ে আমাদের মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হলে?" লোকটি বলল, -إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت. "আমি কেবল আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই (ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর) মাযহাব ছেড়েছি। তখন কাজী আবূ ইয়ালা রহ. বললেন–

إن هذا لا يصلح؛ فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد، وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي، لم تجد أحدا يعبد معك، ولا يدارسك، وكنت خليقا أن تثير خصومة، وتوقع نزاعا، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى.

"এরূপ কাজ তোমার জন্য সমীচীন নয়। কেননা, যদি তুমি তোমার দেশে আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী হও আর বাকিরা ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী হয়, তবে তুমি এমন কোনো লোককে খুঁজে পাবে না, যে তোমার সাথে ইবাদাত-বন্দেগী করবে এবং তোমার সাথে বসে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা করবে।

---

১৬৪. আতিয়্যাহ, *শারহুল আরবাঈন লিন-নববী*, পৃ. ৭

https://nagorikpathagar.org

এরূপ অবস্থায় তোমার এ কাজ বিবাদ সৃষ্টি করবে ও দ্বন্দ্ব তৈরি করবে। কাজেই তোমার দেশের লোকদের অনুসৃত মাযহাবের ওপর অটল থাকাই তোমার জন্য অধিক শ্রেয়।"[১৬৫]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, আমাদের পূর্বসূরি ইমামগণ দ্বীনের গবেষণাধর্মী নানা অপ্রধান বিষয়ে ইজতিহাদের নিয়ম অনুসরণ করে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের এ ইজতিহাদ বিভিন্ন ফলাফল নিয়ে এসেছে সত্যি; কিন্তু তাঁদের সে ভিন্নতায় কোনো প্রকারের জিদ, প্রগল্‌ভতা ও গোঁড়ামির স্থান ছিল না। তাঁরা যথাসাধ্য মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতেন। ক্ষেত্রবিশেষে যে মতপার্থক্যগুলো হয়েছে, তার পেছনে প্রধান কারণ ছিল দলীলের প্রচ্ছন্নতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা কিংবা দুর্বলতা। তদুপরি ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের মধ্যে যে মতপার্থক্য সংঘটিত হয়, তা তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধাবোধে সামান্যতমও ব্যত্যয় ঘটাতে পারেনি। তাঁদের ইখলাস ও উদারতা এতই পরিচ্ছন্ন ছিল যে, যখনই তাঁরা কোনো বিশুদ্ধ দলীল পেতেন কিংবা অন্যের যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হতেন, তখন তাঁরা কোনোরূপ কূটচালের আশ্রয় নেওয়া ব্যতীত সাথে সাথেই প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ করে নিতেন। এমনকি তাঁরা শিক্ষক হয়েও ছাত্রদের বিশুদ্ধ যুক্তি ও বাস্তবসম্মত মতামত গ্রহণ করে নিতেও কোনোরূপ কুণ্ঠিত হননি। তাঁদের এরূপ ইজতিহাদভিত্তিক উদারনৈতিক মতপার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে উম্মতের জন্য বহু কল্যাণও বয়ে এনেছে। যেমন–

ক. যুগ ও পরিস্থিতির চাহিদা পূরণার্থে বিশেষ প্রয়োজনে নিজের মাযহাবের পরিবর্তে অন্য মাযহাব অনুসরণের পথ উন্মুক্ত রয়েছে। মাযহাবের বিভিন্নতা না থাকলে এ সুযোগ লাভ করা সম্ভব হতো না। অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে ইমামগণ ভিন্নমত পোষণ করলে পরবর্তীদের জন্য (বিশেষ প্রয়োজনে) যেকোনো একটি মত অনুসরণ করার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে কোনো বিষয়ে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করলে তার বাইরে যাওয়ার ইখতিয়ার কারও থাকত না।[১৬৬] তা ছাড়া

---

১৬৫. ইবনু তাইমিয়াহ, *আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসূলিল ফিকহ*, (কায়রো : মাতবাআতুল মাদানী, তা.বি.), পৃ. ৪৮৩; মুহাম্মদ ইবনু আবদির রহমান, *আল-মুসতাদরাক আলা মাজমূই ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়াহ*, (http://www.ahlalhdeeth.com), খ. ২, পৃ. ২৪৭

১৬৬. যেমন– হানাফী মাযহাবে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহের জন্য ৯০ বছর অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। এর ফলে বহু মুসলিম নারীর জীবনে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে। পরবর্তীকালে এ সংকটাবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য হানাফী

https://nagorikpathagar.org

ইমামগণের মতভিন্নতার কারণে ক্ষেত্রবিশেষে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সুযোগও তৈরি হয়।[১৬৭] এসব কারণে অনেক আলিমই ইমামগণের মতপার্থক্যকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য একটি বিরাট রহমত ও প্রশস্ততার উপলক্ষ্য মনে করেন।[১৬৮]

ইবনু আবী ইয়ালা [মৃ. ৫২৬ হি.] রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ.-এর শিষ্য বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইসহাক ইবনু বাহলূল আল-আম্বারী [১৬৪-২৫২ হি.] রহ. তাঁর একটি কিতাবের নাম রাখেন 'كتاب الاختلاف' (মতানৈক্যের গ্রন্থ)। ইমাম আহমাদ রহ. এ কিতাবটি দেখে তাঁকে বললেন, "তুমি গ্রন্থটির নাম রাখো 'كتاب السعة' (প্রশস্ততার গ্রন্থ); 'কিতাবুল ইখতিলাফ' নাম রেখো না।"[১৬৯]

মূসা আল-জুহানী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাইয়িদুল কুররা তালহা ইবনু মুসাররাফ [মৃ. ১১২ হি.] রহ.-এর নিকট যখন (ইমামগণের) কোনো মতপার্থক্যের কথা আলোচনা করা হতো, তখন তিনি সেই প্রসঙ্গে বলতেন, لاتقولوا: الاختلاف، ولكن قولوا: السعة "-তোমরা একে 'মতপার্থক্য' বলো না; বরং তোমরা একে 'প্রশস্ততা' বলো।"[১৭০]

ইমামগণ নিজেরাই এ মত থেকে ফিরে আসেন এবং তাঁদের কেউ কেউ মালিকী মাযহাব অনুসারে নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহের জন্য চার বছর অপেক্ষা করতে বলেন। আবার তাঁদের অনেকেই বিষয়টি আদালতের রায়ের ওপর ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। (ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়িক*, (বৈরুত : দারুল মারিফাহ, তা.বি.), খ. ৫, পৃ. ১৭৮; যায়লায়ী, ফাখরুদ্দীন উসমান, *তাবয়ীনুল হাকায়িক*, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৩১৩ হি.), খ. ৩, পৃ. ৩১১)

১৬৭. যেমন– মদখোর ও অন্য কবিরা গুনাহকারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু দাবা খেলা হানাফী মাযহাবে কবিরা গুনাহ হলেও শাফিয়ী ও মালিকী মাযহাবমতে তা নয়। ফলে দাবা খেলায় জড়িতদের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়।

১৬৮. ইবনু তাইমিয়াহ, *শারহুল উমদাহ*, (রিয়াদ : দারুল আসিমাহ, ১৯৯৭), খ. ৪, পৃ. ৫৬৯; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১, পৃ. ১৭০

১৬৯. ইবনু আবী ইয়ালা, আবুল হুসাইন, *তাবাকাতুল হানাবিলাহ*, (বৈরুত : দারুল মারিফাহ, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ১১০; ইবনু তাইমিয়াহ, *শারহুল উমদাহ*, খ. ৪, পৃ. ৫৬৭; ইবনু মুফলিহ, বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম, *আল-মাকসিদ আল-আরশাদ...*, (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯০), খ. ১, পৃ. ২৪৮

১৭০. আবূ নুআইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, খ. ৫, পৃ. ১৯

https://nagorikpathagar.org

খ. ইমামগণের মতভিন্নতার কারণে লোকদের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে আমল তরকের কারণে ভয় ও শঙ্কা তৈরি হয়। অপরদিকে তারা ক্ষেত্রবিশেষে চূড়ান্ত হতাশা থেকেও নিষ্কৃতি লাভ করে। পক্ষান্তরে ইমামগণ কোনো কোনো বিষয়ে একমত হলে লোকেরা হয়তো চূড়ান্ত হতাশা কিংবা ঔদাসীন্যের শিকার হয়ে পড়ত।[১৭১]

গ. ইমামগণের মতভিন্নতার কারণে ফিকহশাস্ত্র প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং ক্রমশ তা বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে। ফলে বর্তমানে শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে বহু আধুনিক বিষয়ে স্থান, সময় ও পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী শারঈ দলীলনির্ভর বাস্তব ও যুক্তিসম্মত রায় প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এতে উত্তরোত্তর সর্বমহলে ইসলামী ফিকহের যৌক্তিকতা, গ্রহণযোগ্যতা ও সর্বজনীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রফেসর মুস্তাফা আয-যারকা রহ. বলেন–

قد يظن بعض المتوهمين ممن لا علم عندهم ولا بصيرة أن اختلاف الاجتهادات في الفقه الإسلامي نقيصة، ويتمنون لو لم يكن إلا مذهب واحد،...وأما الاختلاف الفقهي في الأحكام العملية المدنية فهو من المفاخر والذخائر؛ لأنه ثروة تشريعية كلما اتسعت كانت أروع وأنفع وأنجع.

"কতিপয় কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্বাচীন লোক ধারণা করে যে, ইসলামী ফিকহে ইজতিহাদী মতপার্থক্য একটি ত্রুটি। তারা আশাবাদ ব্যক্ত করে, মাযহাব যদি কেবল একটিই হতো!... বস্তুতপক্ষে ব্যাবহারিক

---

১৭১. যেমন– ইমামগণের মধ্যে কারও কারও মতে, ইচ্ছাকৃত নামায তরককারী কাফির। পক্ষান্তরে তাঁদের অনেকেই ফাতওয়া দিয়েছেন যে, ইচ্ছাকৃত নামায তরককারী যদি নামাযের ফারযিয়্যাত অস্বীকার না করে, তাহলে শুধু নামায তরক করার কারণে তাকে কাফির বলা যাবে না; সে ফাসিক হবে। এ মতভিন্নতার কারণে প্রথমোক্ত ইমামগণের অনুসারীদের মনে যেমন কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয় (এবং এ কারণে তাঁরা বেনামাযীকে কাফির বলা সত্ত্বেও তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানো অথবা মুসলিম কবরস্থানে তাকে দাফন না করার কথা বলেননি), তেমনি অপর ইমামগণের অনুসারীদের মনে শঙ্কা ও সতর্কতা দেখা দেয়। কেননা, বেনামাযী যখন জানবে যে, কোনো কোনো ইমামের ফাতওয়ামতে সে কাফির বলে গণ্য, তখন স্বভাবতই তার অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠবে এবং তাওবার মাধ্যমে নামাযের প্রতি যত্নবান হবে।

https://nagorikpathagar.org

গণবিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ফিকহী মতপার্থক্য একটি গর্ব ও মূল্যবান সম্ভারবিশেষ। কেননা, তা হলো আইনি সম্পদ; তা যতই বৃদ্ধি পাবে, ততই তার সৌন্দর্য, উপকারিতা ও কার্যকারিতা বাড়তে থাকবে।"[১৭২]

দুঃখের ব্যাপার হলো, উত্তরকালে মুকাল্লিদরা ক্রমে তাঁদের মুজতাহিদ ইমামগণের সেই উদারনৈতিকতা ও পরমতসহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে কোথাও কোথাও অবস্থা এতই নাজুক যে, মতপার্থক্য করার ক্ষেত্রে তারা ন্যূনতম শিষ্টাচার রক্ষার কোনো গরজ অনুভব করছে না। এক মাযহাবের অনুসারীরা অন্য মাযহাবের অনুসারীদের পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করে। প্রত্যেকে নিজের মাযহাবকে একমাত্র সঠিক এবং অন্যের মাযহাবকে ভ্রান্তরূপে চিহ্নিত করতে যাবতীয় প্রয়াস নিয়োগ করে। বলতে গেলে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে তাদের অনেকেরই একান্ত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, নিজের ও নিজের মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ এবং নিজের ও নিজের দলের স্বার্থ চরিতার্থ করা। আত্মপ্রীতি, পার্থিব মোহ, প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব ও হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়ে অক্ষমতাও এর প্রধান কারণ। এ জাতীয় মতবিরোধ একদিকে পরস্পরের মধ্যে চরম হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করছে, অপরদিকে তারা দ্বীনকে টুকরো টুকরো করছে এবং উম্মতকে নানা দলে-উপদলে বিভক্ত করছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, আমীন!

ব্যাবহারিক শাখাগত বিষয়সমূহে বাড়াবাড়ি এবং এর কারণ

আমাদের পূর্বসূরি মুজতাহিদ ইমামগণ ইসলামের ব্যাবহারিক শাখাগত বিষয়সমূহে ইখতিলাফের ক্ষেত্রে যে উদার ও ভারসাম্যপূর্ণ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন, পরবর্তীকালে তাঁদের অনুসারীগণ সেই কর্মপন্থা থেকে প্রায় বিচ্যুত হয়ে যান। তাঁরা উদারতা ও সহনশীলতার পরিবর্তে কট্টরতা ও অন্যায় পক্ষপাতিত্বের চর্চা করতে থাকেন বেশি।

হিজরী ৩য় শতাব্দীর শেষ নাগাদ পর্যন্ত যদিও আহলুস সুন্নাতের অনুসারী সুন্নীগণ নিজেদের অনুসরণীয় ইমামগণের ফাতওয়া মেনে চলতেন এবং সেই আলোকে কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করতেন; কিন্তু তাদের কেউ নিজেকে হানাফী, শাফিয়ী, মালিকী ও হাম্বলী প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করতেন না।

---

১৭২. মুস্তাফা আয-যারকা, ড. *আল-মাদখালুল ফিকহী আল-আম্ম*, (দিমাশক : দারুল কলম, ১৪১৮ হি.), খ. ১, পৃ. ২৬৯

https://nagorikpathagar.org

হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। তখন অনেকেই নিজের জন্য পৃথক পৃথক মাযহাবী পরিচয় ধারণ করেন এবং নিজ অনুসরণীয় ইমামগণের ফাতওয়া খুঁজে বের না করা পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের ব্যবস্থা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাতেন। সুতরাং সময়ের সাথে সাথে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে লাগে এবং দলাদলির সূত্রপাত ঘটে।

উপরন্তু, তাদের এ দলাদলি ক্রমে এমন গুরুতর রূপ লাভ করে যে, এরা একে অপরকে বাতিল, এমনকি কাফির পর্যন্ত মনে করত।[১৭৩] এ দলাদলির মহাব্যাধি মুসলিমগণের জাতীয় জীবনে প্রবেশ করায় উম্মত ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

---

১৭৩. এ কারণে তারা পরস্পরের মধ্যে বিয়েশাদিকে হারাম মনে করত এবং এক মাযহাবের অনুসারীরা অপর মাযহাবের ইমামের পেছনে সালাত আদায় করত না। আবূ হাতিম ইবনু খামূশ রহ. তো বলতেন যে, فكل من لم يكن حنبليًا فليس بمسلم- "হাম্বলী নয়- এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই মুসলিম নয়।" (যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ৩, পৃ. ৩৫০) হিজরী ৪৬৯ সালে হাম্বলী ও শাফিয়ীগণের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর নিযামুল মুলক আবূ আলী আত-তূসী [৪০৮-৪৮৫ হি.] রহ. দুদলের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। তখন শাফিয়ী দলের প্রধান ইবনুল কুশাইরী রহ. তাঁকে জবাব দেন–

فأما هؤلاء فيزعمون انا كفار، ونحن نزعم ان من لايعتقد مانعتقده كان كافرا، فأي صلح يكون بيننا؟

"এরা তো আমাদের কাফির মনে করে। আর আমরাও মনে করি যে, আমরা যা বিশ্বাস করি, যারা তা বিশ্বাস করে না, তারা কাফির। এ অবস্থায় আমাদের মধ্যে সমঝোতা কীভাবে হবে?"

কাযী মুহাম্মদ ইবনু মূসা আল-হানাফী [মৃ. ৫০৬ হি.] রহ. বলতেন–

لو كان لي من الامر شيء لأخذت على الشافعية الجزية

"যদি আমার শাসন-কর্তৃত্বের কোনো সুযোগ থাকত, তাহলে আমি শাফিয়ীদের ওপর জিযিয়া আরোপ করতাম।"

ঐতিহাসিক ইবনু আসাকির রহ. বর্ণনা করেন যে, মালিকীগণ সাজদার মধ্যে শাফিয়ীদের মৃত্যুর জন্য দুআ করতেন।

(আলী আল-মুমিন, *জুযূরুল মাসআলাতিত তায়িফাতি ফিল ইসলাম*,
http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/865.htm)

https://nagorikpathagar.org

কুরআনে উল্লেখিত 'মাকামে মাহমূদ'-এর ব্যাখ্যা নিয়ে হিজরী ৩১৭ সালে বাগদাদে হাম্বলী ও অপর তিন মাযহাবের অনুসারীগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। আর এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে দেশের সেনাবাহিনী ও সাধারণ জনগণও যোগ দেয় এবং শতসহস্র লোক হতাহত হয়। হিজরী ৩২৩ হিজরী সালে হাম্বলী ও শাফিয়ীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে সাত বছর পর্যন্ত চলে। শাফিয়ীদের নেতা ইবনুল কুশাইরী [৪৬০-৫৪৬ হি.] রহ. হিজরী ৪৪৮ সালে বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং আকীদাসংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে হাম্বলীদের সাথে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। এ বিবাদ সর্বশেষ সংঘাতে রূপ নেয় এবং উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। হিজরী ৫৫৪ সালে নাইশাপুরে হানাফী ও শাফিয়ীগণের মধ্যে, পুনরায় ৫৬০ সালে হানাফী ও শাফিয়ীদের মধ্যে এবং ৫৮৭ সালে মিশরে হাম্বলী ও শাফিয়ীগণের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ক্রমে এ ধরনের দলাদলি ও সংঘাত অন্যান্য মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইমাম ইবনু আকীল [৪৩১-৫১৩ হি.] রহ. সামসময়িক আলিমদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করে অত্যন্ত আক্ষেপ করে মন্তব্য করেন–

رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول العوام بل العلماء.

"আমি লোকদের কেবল অক্ষমতা ও দুর্বলতা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ই অন্যায়-অবিচার করা থেকে বাঁচাতে দেখিনি। আমি এখানে সাধারণ লোকদের কথা বলছি না; বরং আলিমদের কথাই বলছি।"[১৭৪]

তাঁর এ কথার মর্ম হলো– আলিমদের কোনো দল যখন দুর্বল ও অক্ষম থাকেন, তখন হয়তো তাঁরা অন্য দলের ওপর যুলম ও বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু যখনই তাঁরা কোনো সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকার হন বা শাসকদের অনুকম্পা লাভ করেন, তখন তাঁদের প্রভাবশালী দলটি দুর্বল দলের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হওয়ার পরিবর্তে শত্রুভাবাপন্ন ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের ওপর যুলম ও অবিচার শুরু করে দেন। তাঁর এ মন্তব্য খুবই যথার্থ। আমরা ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার বারংবার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করি। যেমন– উযীর ইবনু ইউনূস (মৃ. ৫৯৩ হি.) ছিলেন হাম্বলী মতাবলম্বী।

---

১৭৪. ইবনু মুফলিহ, মুহাম্মাদ, *আল-ফুরূ*, (বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৪ হি.), খ. ৩, পৃ. ২২; বুহূতী, মানসূর, *কাশশাফুল কিনা*, (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০২ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৮৯

https://nagorikpathagar.org

তাঁর সময় বাগদাদে হাম্বলীরা প্রচণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। এ সুবাদে তারা শাফিয়ীদের ওপর প্রায়ই চড়াও হতো। তারা ব্যাবহারিক শাখাগত বিষয়েও তাদের তাদের মতানুসারে আমল করতে বাধা দিত; এমনকি তারা তাদের সালাতে উচ্চৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ ও কুনূত পর্যন্ত পড়তে দিত না। এরপর যখন নিযাম মন্ত্রী হন এবং ইবনু ইউনূস মারা যান, তখন হাম্বলীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চূর্ণ হয়ে যায়। এ সময় শাফিয়ীরা আবার প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। তারা হাম্বলীদের ওপর স্বৈরাচারী বাদশাহর মতো নানারূপ যুলম ও অত্যাচার শুরু করে এবং দমন-পীড়ন চালাতে থাকে।[১৭৫]

ইতিবাচক বিষয় হলো– বর্তমানে এরূপ মাযহাবী দলাদলির তীব্রতা ও কলহ-বিবাদ আগের তুলনায় বহুলাংশে কমে এসেছে; তবে নতুনভাবে মাযহাবীদের সাথে লা-মাযহাবী সালাফীদের বিভেদ ও দলাদলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং বিভিন্ন দেশে ক্রমশ বেড়ে চলছে এবং তীব্র হচ্ছে। মাযহাবীদের পারস্পরিক বিভেদ এবং মাযহাবীদের সাথে লা-মাযহাবীদের দলাদলির পেছনে বহু কারণ নিহিত রয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তুলে ধরছি–

ক. তুলনামূলক অধ্যয়নের অভাব

ইসলামের ব্যাবহারিক শাখাগত বিষয়সমূহে আলিমদের মধ্যে যে কট্টরতা ও বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়, তার প্রধান কারণ হলো– বিভিন্ন মাযহাব সম্পর্কে তাঁদের তুলনামূলক নৈর্ব্যক্তিক অধ্যয়নের অভাব। এ জাতীয় বিতর্কিত কোনো বিষয়ে যখনই কোনো আলিম মত প্রকাশ করতে চান, তখন তাঁর প্রধান কর্তব্য হলো– বিষয়টি তুলনামূলক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করা। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মাযহাবে পক্ষে-বিপক্ষে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা নিরপেক্ষ মন নিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এক্ষেত্রে আলিমগণ চরম গাফিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের অধ্যয়ন একমুখী, কেবল নিজের পছন্দের মাযহাবকেন্দ্রিক। তাও আবার অসম্পূর্ণ পরনির্ভর অধ্যয়ন। অথচ এরূপ অধ্যয়নের ভিত্তিতে আমরা মত প্রকাশ করে থাকি বিজ্ঞ মুহাক্কিক; বরং মুজতাহিদসুলভ ভঙ্গিতে।[১৭৬]

---

১৭৫. ইবনু মুফলিহ, মুহাম্মাদ, *আল-ফুরূ*, (বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৪ হি.), খ. ৩, পৃ. ২২; বুহূতী, মানসূর, *কাশশাফুল কিনা*, (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০২ হি.), খ. ১, পৃ. ৪৮৯

১৭৬. আবদুল মালিক, *উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা*, পৃ. ১৪৯

https://nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য, অল্পসংখ্যক মাসআলা ব্যতীত প্রায় সকল মাসআলায় মাযহাবগুলোর মতপার্থক্য কেবল স্বরূপ নির্ণয় ও পদ্ধতিগত (اختلاف التنوع)। ক্ষেত্রবিশেষে কার্যক্ষেত্রে এ মতপাথর্ক্যের কোনো প্রভাবও থাকে না। অথচ কোনো কোনো আলিম এ খুঁটিনাটি মতভেদগুলো অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করে থাকেন। এর ফলে বাহ্যত মনে হয় যে, মাযহাবগুলো পরস্পরবিরোধী ও সাংঘর্ষিক। এরূপ অবস্থায় 'তুলনামূলক ফিকহ' একদিকে বিভিন্ন বিষয়ে নানা মতগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে এসব মতের প্রকৃত স্বরূপ উপস্থাপন করতে চেষ্টা করে, অপরদিকে প্রত্যেক মতের পক্ষে যৌক্তিকতাগুলো তুলে ধরে নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারীগণের অন্তরে অন্য মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি করতে এবং তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ নিরসন করতে বা হ্রাস করতে চেষ্টা করে।[১৭৭]

খ. সুন্নাহর ওপর পর্যাপ্ত ও গভীর জ্ঞান না রাখা

'সুন্নাহ' ইসলামী শরীয়তের একটি প্রধান ও মৌলিক উৎস। কুরআনের পরে এর মর্যাদাগত অবস্থান। এটি মূলত কুরআনের প্রায়োগিক ও বাস্তবিক রূপ। কুরআনে যেসব আদেশ-নিষেধ ও সাধারণ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রায়োগিক রূপের নির্দেশনাদানই সুন্নাহর প্রধান কাজ। এ কারণে আমলের ক্ষেত্রে মানুষ যতখানি না কুরআনের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়, তার চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হয় সুন্নাহর প্রতি। কাজেই একজন আলিমের সুন্নাহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাঁকে অন্তত পক্ষে বিধিবিধান-সংবলিত সকল হাদীস সম্পর্কে অবগত হতে হবে। পাশাপাশি হাদীসগুলোর অন্তর্নিহিত মর্ম, তাৎপর্য ও প্রেক্ষাপট এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও তাঁর সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো– সমাজে এ মাপের আলিম খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা প্রায়ই লক্ষ করি যে, অনেক আলিমই সুন্নাহর ওপর যৎসামান্য জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত অভিমত দিয়ে দেন এবং বিপরীত মত সম্পর্কে কটূক্তি করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন যে, তাঁদের অভিমতটিই একান্তই সুন্নাহসমর্থিত হক ও যথার্থ, পক্ষান্তরে অন্যদের অভিমতগুলো সুন্নাহর পরিপন্থি ভুল ও না-হক।

---

১৭৭. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন, আমার *তুলনামূলক ফিকহ*, ৩য় অধ্যায়।

https://nagorikpathagar.org

গ. শরীয়তের ওপর গবেষণার মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা

একজন আলিমকে ইসলামী শরীয়তের ওপর গবেষণা করার মূলনীতি তথা ইসলামী শরীয়তের মৌলিক ও সম্পূরক দলীলসমূহ এবং এগুলো প্রয়োগের নীতি, পরস্পর সাংঘর্ষিক দলীলসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন বা অগ্রাধিকার দানের নিয়মকানুন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকতে হয়। এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান ব্যতীত শরীয়তের বিভিন্ন উৎস ও দলীল থেকে সঠিক বিধান প্রতিপাদন করা এবং নতুন কোনো বিষয়ে শরীয়তের সমাধান দেওয়া সম্ভব নয়।

দুঃখের বিষয় হলো– সমাজে এ মাপের আলিম খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেকেই অপর্যাপ্ত ও ভাসাভাসা জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে অভিমত দিয়ে দেন এবং বিপরীত মত সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করে থাকেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো– অনেক সময় তাঁদের কথা ও যুক্তি এতই দুর্বল ও হালকা হয় যে, যা সাধারণ লোকদের ভাষা ও যুক্তির পর্যায়ভুক্ত।

ঘ. শরীয়তের মাকাসিদ ও উসূল সম্পর্কে জ্ঞান না রাখা

শরীয়তের মাকাসিদ (শরীয়তের বিধিবিধানসমূহের উদ্দেশ্যাবলি ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যসমূহ) ও উসূল (মূলনীতিসমূহ) প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও একজন আলিমকে সম্যক অবগত থাকতে হয়। এতৎসংক্রান্ত জ্ঞান ব্যতীত শরীয়তের বিভিন্ন উৎস থেকে বিধান প্রতিপাদন করা এবং বিশুদ্ধ ও সঠিক সমাধান দেওয়া সম্ভব নয়। তদুপরি সময়ের আবর্তনে সংঘটিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং শরীয়তের পরিবর্তনশীল (المتغيرات) বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সময় ও অবস্থার উপযোগী সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে এ জ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয়। এ প্রসঙ্গে শরীয়তের মাকাসিদ সম্পর্কে ইমাম আশ-শাতিবী রহ. বলেন–

أن من لم يعرف مقاصد الكتاب والسنة لم يحل له أن يتكلم فيهما.

"যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর মাকাসিদ সম্পর্কে অবগত নয়, তার জন্য এ দুটির ব্যাপারে বক্তব্য দেওয়া বৈধ হবে না।"[১৭৮]

---

১৭৮. শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, খ. ৩, পৃ. ৩১

https://nagorikpathagar.org

ইমাম আশ-শাতিবী রহ.-এর উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ইসলামী শরীয়তের যেকোনো ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে আলিমকে অবশ্যই মাকাসিদুশ শরীয়াহ-এর পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে; বিশেষ করে গবেষণাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাকাসিদের ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে।

দুঃখের ব্যাপার হলো– শরীয়তের মাকাসিদ ও উসূল সম্পর্কে যেসব আলিমের কোনো দক্ষতা ও প্রজ্ঞা নেই, তাঁরাও শরীয়তের নানা বিষয়ে তাহকীক ও গবেষণার ময়দানে প্রবেশ করেন এবং দ্বিধাহীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে থাকেন, উপরন্তু তা অন্যদের ওপরও চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। আবার কখনও তাঁরা পূর্বসূরি মুজতাহিদ ইমামগণ ও বিশিষ্ট আলিমগণের বিরুদ্ধেও কথা বলেন।

ঙ. মাযহাবী শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা

নিজের অনুসৃত মাযহাবের প্রতি অন্ধত্ব এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা মাযহাবী কট্টরতা ও পক্ষপাতমূলক আচরণের অন্যতম একটি কারণ। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, গবেষণাধর্মী শাখাগত বিষয়ে হক্কিয়ত (বিশুদ্ধতা) ও শ্রেষ্ঠত্বের সুনিশ্চিত দাবি করা সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য করেছেন; কিন্তু তাঁদের কেউ নিজের মতকে একমাত্র সঠিক মত এবং অন্যান্যদের মতকে ভ্রান্ত বলে জানতেন না। বরং তাঁদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি হতো এই যে, তাঁর মতটি তাঁর গবেষণা ও চিন্তা অনুযায়ী সঠিক; কিন্তু প্রকৃত বিচারে তা ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। অপরদিকে অন্যের মতটি তাঁর গবেষণা ও চিন্তা অনুযায়ী ভুল; কিন্তু প্রকৃত বিচারে তা সঠিক হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে।

*****

https://nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলিমগণের ঐক্যের অন্তরায় ও অনৈক্যের পরিণাম

আলিমের পরিচয়

'আলিম' শব্দটি আরবী। এটি 'ইলম' থেকে গঠিত কর্তৃবাচক বিশেষ্য। 'ইলম' শব্দটি কখনও ক্রিয়ামূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনও ক্রিয়াবিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ামূল হিসেবে এর আভিধানিক অর্থ হলো– কোনো কিছু জানা, বোধগত হওয়া, কোনো বস্তুর পরিচয় ও গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর ক্রিয়াবিশেষ্য হিসেবে এর অর্থ হলো– বোধ, জ্ঞান (Knowledge, Wisdom); বিজ্ঞান (Science)। আলিম অর্থ জ্ঞানী, বিদ্বান, বিজ্ঞানী প্রভৃতি।

কারও কারও মতে, মূলত 'ইলম' হলো إدراك (বোধ, চিন্তন বা মানসরচনা), قواعد (সূত্র ও বিধিসমূহ) ও ملكة (প্রতিভা)-এর সমন্বয়।[১৭৯] এখানে إدراك দ্বারা বস্তুসংক্রান্ত নিছক উপলব্ধি ও মানস রচনাকে বোঝানো হয়েছে; قواعد দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ দ্বারা প্রণীত নানা সূত্র, বিধি ও পরিভাষাগুলোকে বোঝানো হয়েছে; আর ملكة দ্বারা বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য লাভের ফলে অর্জিত দক্ষতা ও পরিপক্বতা থেকে সৃজিত প্রতিভাকে বোঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ ملكة (প্রতিভা) প্রচুর চিন্তা ও মানস রচনা এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বিদ্যমানতা থেকে সৃষ্টি হয়। এ মতানুসারে যেকোনো শাস্ত্রীয় জ্ঞানী বা বিদ্বান ব্যক্তিকে 'আলিম' বলা যায়– চাই তিনি পদার্থবিদ হোন কিংবা গণিতবিদ হোন অথবা

---

১৭৯. থানভী, মুহাম্মদ আলী, *কাশশাফু ইসতিলাহাতুল ফুনূন ওয়াল উলূম*, বৈরূত : মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৯৬; পৃ. ৪; আবূ আবদিল্লাহ আল-হাযিমী, *শারহুল জাওহারিল মাকনূন ফী সাদাফিছ ছালাছাতিল ফুনূন*, পৃ. ৭

https://nagorikpathagar.org

চিকিৎসক বা প্রকৌশলী কিংবা শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ হোন। কিন্তু এ গ্রন্থে 'আলিম' দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য যেকোনো শাস্ত্রীয় জ্ঞানী বা বিদ্বান ব্যক্তিকে বোঝানো নয়; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো– ইসলামী শরীয়তের নির্দিষ্ট পরিভাষায় 'আলিম'-এর পরিচয় তুলে ধরা। অর্থাৎ, ইসলামে 'আলিম' বলতে শারঈ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আলোকিত ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়।

ইসলামে 'ইলম' একটি পবিত্র পরিভাষা। কুরআন ও হাদীসে এর নানা ফযীলতের কথা উল্লেখ রয়েছে। ইসলামে ইলমকে 'নূর' (আলো) বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কাজেই ইলমের জন্য কেবল দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কে বেশি জানাটাই মুখ্য বিষয় নয়; বরং যতটুকু জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেই ভিত্তিতে আলোকিত হওয়াটাই মুখ্য বিষয়। সুতরাং আলিম হলো এমন ব্যক্তি, যিনি দ্বীন ও শরীয়তের জ্ঞান লাভের পাশাপাশি নিজেকে একজন আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তোলেন।

'ইলম'-এর বিপরীত হলো 'জাহল'।[১৮০] 'জাহল' অর্থ অজ্ঞতা, মূর্খতা, অবিবেচকতা। একে 'যুলমত' (অন্ধকার) বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কাজেই কোনো ব্যক্তি দ্বীন ও শরীয়তের জ্ঞান লাভ করার পরও যদি নিজেকে একজন আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তুলতে না পারে, মূর্খ ও অবিবেচকের মতো কার্যকলাপ করে, তবে সে যত বড়ো বিদ্বানই হোক, ইসলামে সে 'জাহিল'-রূপেই বিবেচিত হবে; আলিমরূপে গণ্য হবে না।

পবিত্র কুরআনে ইলমের প্রসঙ্গে দুটি কথা এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾-"আপনি বলে দিন, যারা জানে আর যারা না জানে, তারা কি এক?"[১৮১] অনেক মুফাসসিরের মতে, এ আয়াতে ইলমকে ঈমানের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, ঈমান হলো ইলমের প্রতিফলিত রূপ। অর্থাৎ, যারা আল্লাহর যাত, সিফাত ও ইখতিয়ার সম্পর্কে ইলম রাখে, তারাই ঈমান আনে। পক্ষান্তরে, যারা এ ইলম রাখে না, তারা ঈমান আনে না। এ মতানুসারে আয়াতের মর্ম হলো, যারা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাঁর নির্দেশাবলি পালনের মধ্যে কী পুরস্কার রয়েছে,

---

১৮০. ইবনু মানযূর, আবুল ফাদল জামালুদ্দীন, *লিসানুল আরব*, ইরান : নাশরু আদবিল হাওযা, কুম, ১৪০৫ হি., খ. ১২, পৃ. ৪১৬

১৮১. আল-কুরআন, ৩৯ (সূরা আয-যুমার) : ৯

https://nagorikpathagar.org

তা জানে ও বিশ্বাস করে আর যারা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না এবং তাঁর অবাধ্যতার মধ্যে কী শাস্তি রয়েছে, তা জানে না এবং তা বিশ্বাসও করে না, তারা উভয়েই সমান নয়।[১৮২] অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলার ভয়কে আলিমগণের মৌলিক বৈশিষ্ট্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾-"আল্লাহ তাআলার বান্দাদের মধ্যে কেবল আলিমরাই তাঁকে ভয় করে।"[১৮৩] অর্থাৎ, আল্লাহর ভয় হচ্ছে আলিমদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন, العلم مخافة الله عز وجل-"ইলম হলো আল্লাহর ভয়।"[১৮৪] তিনি আলিমের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, إن العالم مَن يخشى الله-"বস্তুতপক্ষে আলিম হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলে।"[১৮৫] অর্থাৎ, আলিম হওয়ার জন্য বেশি জানাটাই মুখ্য বিষয় নয়; বরং মুখ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ভয়। বিশিষ্ট তাবিঈ আতা রহ.ও বলেন, مَن خشي الله فهو عالم-"যে আল্লাহকে ভয় করে, সে-ই আলিম।"[১৮৬]

উপর্যুক্ত আয়াতে উলামা (العلماء) শব্দ দ্বারা শাস্ত্রীয় কিতাবী আলিমদের বোঝানো হয়নি; বরং এখানে 'উলামা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যাঁরা আল্লাহ তাআলার মহিমাময় যাত ও অসীম গৌরবময় সিফাতসমূহকে ঈমান ও মারিফাতের নূরের আলোকে উপলব্ধি করেন এবং তাঁকে ভয় করেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণ ও (পরবর্তী) অনেক বিলায়তপ্রাপ্ত আল্লাহর ওলী শাস্ত্রীয় কিতাবী আলিম ছিলেন না। তবুও তাঁরা সর্বোচ্চ স্তরের উপকারী ইলমের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তাআলার যাত, সিফাত, ইখতিয়ার ও কুদরত সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট ধারণা ছিল, তাঁরা আল্লাহ তাআলাকে সর্বক্ষণ ভয় করে চলতেন।

---

১৮২. তাবারী, মুহাম্মদ ইবনু জারীর, *জামিউল বায়ান ফী তাওীলিল কুরআন*, বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাত, ২০০০, খ. ২১, পৃ. ২৬৮

১৮৩. আল-কুরআন, ৩৫ (সূরা ফাতির) : ২৮

১৮৪. জাওহারী, আবুল কাসিম আবদুর রাহমান, *মুসনাদুল মুওয়াত্তা*, পৃ. ৩

১৮৫. ইবনু আবদিল বার, আবূ উমার ইউসুফ, *জামিউ বয়ানিল ইলম ও ফাদলিহি*, মুওয়াসসাসাতুর রাইয়ান, ২০০৩, খ. ২, পৃ. ১৩

১৮৬. ইবনু আবদিল বার, *জামিউ বয়ানিল ইলম ও ফাদলিহি*, খ. ২, পৃ. ১০৭

https://nagorikpathagar.org

মোটকথা, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামে 'আলিম' নামে অভিহিত হওয়ার জন্য মৌলিক দুটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে :

এক. ঈমান। কাজেই যার প্রকৃত ঈমান নেই, সে ব্যক্তি শারঈ অর্থে 'আলিম' নামে অভিহিত হতে পারে না।

দুই. আল্লাহর ভয়। যার মনে আল্লাহ তাআলার ভয় নেই, তাকওয়া নেই; যে প্রকাশ্যে অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তাকেও আলিম নামে অভিহিত করা যাবে না।

এ দুটি মানদণ্ডের আলোকে ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিই আলিমের সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে যাবে। যারা প্রাচ্যবিদ কিংবা ইসলাম সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রাখলেও ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম পালন করে না, তারা ইসলামে 'আলিম' নামে অভিহিত হতে পারে না।

একজন ব্যক্তি আলিম উপাধিধারী হতে হলে তার কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে– তা আমরা পরেই আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ। এর আগে আমাদের এ কথা জানা প্রয়োজন যে, 'আলিম' নামে আখ্যায়িত হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির মধ্যে মৌলিক কী কী শর্ত পাওয়া যেতে হবে? এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] রহ. বলেন–

ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يضعه الله عز وجل في القلوب.

"বেশি হাদীস রিওয়ায়াত করতে পারলেই ইলম হয় না। বস্তুতপক্ষে ইলম হলো নূরবিশেষ, যা আল্লাহ তাআলা বান্দাদের অন্তরগুলোতে সঞ্চারিত করেন।"[১৮৭]

ইমাম ইবনু রজব [৭৩৬-৭৯৫ হি.] রহ. বলেন–

فليس العلم بكثرة الرواية، ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد.

"বেশি হাদীস রিওয়ায়াত করতে পারলে অথবা বেশি কথা বলতে জানলেই ইলম হয় না; বরং ইলম হলো অন্তরে সঞ্চারিত একটা

১৮৭. জাওহারী, *মুসনাদুল মুওয়াত্তা*, পৃ. ৩

https://nagorikpathagar.org

বিশেষ নূর, যার মাধ্যমে বান্দা হককে উপলব্ধি করতে পারে, হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে ও হককে সংক্ষিপ্ত, অথচ জ্ঞানগর্ভ কথায় প্রকাশ করতে পারে।"[১৮৮]

মোটকথা, ইসলামে 'ইলম' অজস্র তত্ত্ব ও তথ্য জানার নাম নয়, সুন্দর সুন্দর কথা বলার নাম নয়, কিতাবপত্র রচনার নাম নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে ইলম হলো অন্তরের নূর (আলো), ন্যায়বোধ, সত্য-মিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা। এ কারণে যার মধ্যে সত্যিকার ইলম থাকবে, সে সাধারণত কুফর ও বড়ো কোনো গুনাহে লিপ্ত হতে পারে না। ইলমের সাথে কুফর ও বড়ো পাপ একত্র হতে পারে না। কারণ, ইলম হলো নূর (আলো), আর কুফর ও বড়ো পাপ হলো যুলমত (অন্ধকার)। বলাই বাহুল্য, আলো ও অন্ধকার একত্র হয় না। যখনই আলো আসে, তখন অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যায়।

সাহাবা কিরাম রা. উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আলিম ছিলেন। তাঁদের পর ইলমের ময়দানে মুজতাহিদ ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের অবদান অনেক বেশি, তবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, তাঁরা অজস্র কিতাবপত্র পড়েননি। তাহলে তাঁরা বড়ো আলিম কীভাবে হলেন?! আমরা নিশ্চয় জানি যে, যদিও তাঁরা কিতাবপত্র কম পড়েছেন; কিন্তু তাঁদের অন্তরে ইলমের নূর ছিল অনেক বেশি, তাঁদের মধ্যে ন্যায়বোধ ছিল প্রখর, সত্য-মিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা ছিল প্রচণ্ড। একবার ইমাম শাফিয়ী রহ. তাঁর শিক্ষক ওয়াকী রহ.-এর কাছে তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করলেন। তখন তিনি তাঁকে পাপ ছেড়ে দিতে বললেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي ** فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ المَعَاصِي

وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ العِلْمَ نُورٌ ** ونورُ الله لا يهدى لعاصي .

"আমি (আমার শিক্ষক) ওয়াকীর কাছে আমার স্মৃতির দুর্বলতার কথা জানালাম। তিনি আমাকে গুনাহ ছেড়ে দিতে নির্দেশনা দিলেন এবং বললেন– ইলম হলো নূর। আর আল্লাহ তাআলার এ নূর কোনো পাপীকে পথ দেখায় না।"[১৮৯]

---

১৮৮. ইবনু রজব, *ফাদলু ইলমিস সালাফ আলাল খালাফ*, পৃ. ৫

১৮৯. শাফিয়ী, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস, *দিওয়ান*, পৃ. ৬১

https://nagorikpathagar.org

এতে সন্দেহ নেই যে, গুনাহের কারণে পুথিগত জ্ঞানচর্চায় বিশেষ ক্ষতি হয় না, মুখস্থশক্তিতেও দুর্বলতা তৈরি হতে পারে না। বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মুত্তাকী মুমিন থেকে কাফির-ফাসিকের বেশি তথ্য ও জ্ঞান থাকতে পারে, প্রাচ্যবিদদের কেউ কেউ কুরআন-হাদীস সম্পর্কে অনেক ভালো জানে, তবুও তারা ইসলামে আলিমরূপে গণ্য নয়। কেননা, তাদের কাছে ইলমের সেই নূর নেই।

এখানে এ কথাও মনে রাখা জরুরি যে, এই 'নূর' মানে কেবল আধ্যাত্মিকতা নয়, কেবল ন্যায়বোধ ও সত্য-মিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতাও নয়। এর সাথে ইসলামের মৌলিক ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকাও জরুরি। কারণ, এ জ্ঞান ছাড়া সেই নূর অর্জিত হয় না। তদুপরি একজন আলিমের কাজ কেবল এটুকুও নয় যে, তিনি কেবল দ্বীনী বিষয়ে কিছু তথ্য জানবেন, মুখস্থ রাখবেন; বরং তাকে মানুষের সামনে দ্বীনী বিষয়ে কথা বলতে হয়, প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ফাতওয়াও দিতে হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম [৬৫১-৭৫১ হি.] রহ.-এর মতে, আলিম মানে যিনি ফাতওয়া দিতে পারেন, মাসায়িল অনুসন্ধান করতে পারেন এবং হালাল-হারামের মৌলিক সূত্রাবলি জানেন।[১৯০] ইবনুল কাইয়িম রহ. তাঁর এ কথায় আলিম ও মুজতাহিদকে প্রায় একই মানদণ্ডে দেখেছেন। শাইখ ইবনু সালিহ আল-উছাইমীন [মৃ. ১৪২১ হি.] রহ. 'আলিম ও মুজতাহিদ' অভিধা দুটিকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, المجتهدُ في الحقيقةِ هو العالِمُ- "প্রকৃতপক্ষে মুজতাহিদ ব্যক্তিই হলেন আলিম।"[১৯১]

আমরা জানি যে, ইজতিহাদের জন্য মৌলিকভাবে কয়েকটি শর্ত আছে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো : ক. আরবী ভাষা জানা; খ. কুরআন-হাদীসের মৌলিক বিষয়াদি জানা; গ. ইজমা বা যেসব বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন, সেগুলো জানা; ঘ. উসূলুল ফিকহ বা গবেষণা-অনুসন্ধান প্রক্রিয়া জানা প্রভৃতি। এসব শর্তের ভিত্তিতে ইসলামের মর্ম ব্যাখ্যায় কার চিন্তা কতটুকু মৌলিক, সে হিসেবে মুজতাহিদদের মধ্যে স্তরভেদ আছে।

---

১৯০. ইবনুল কাইয়িম, আবূ আবদিল্লাহ, *ইলামুল মুয়াক্কিঈন*, বৈরুত : দারুল জীল, ১৯৭৩, খ. ১, পৃ. ৯

১৯১. উছাইমীন, শাইখ, *শারহুল উসূল মিন ইলমিল উসূল*, সৌদি আরব: দারু ইবনিল জাওযী, দাম্মাম, ১৪৩৫ হি., পৃ. ৬৭২

https://nagorikpathagar.org

সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, যারা শুধু অনুসন্ধান করে পূর্বের মতামতের আলোকে বর্তমানকে ব্যাখ্যা করতে পারেন। বলাই বাহুল্য, বর্তমানের আলিমগণ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই শর্তগুলো অনেক ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। কেননা, কুরআন, হাদীস, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ, আরবী ভাষা বিষয়ে জানাশোনা থাকলে এই শর্তগুলো পাওয়া যাবে। কাজেই নূর ও রূহানিয়তের পাশাপাশি এই জ্ঞান ও তথ্যগত সামর্থ্য থাকলে তাকে 'আলিম' বলা যাবে।

আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ ও বৈয়াকরণ ইবনু জিন্নী [মৃ. ৩৯২ হি.] রহ. বলেন–

لَمَّا كان العِلْم قد يكون الوصف به بعدَ المُزاوَلة له وطُولِ المُلابسةِ صار كأنه غريزةٌ ولم يكن على أول دخوله فيه ولو كان كذلك لكان مُتعلِّماً لا عالِماً فلما خرج بالغريزة إلى باب فَعُل صار عالمٌ في المعنى.

"দীর্ঘ জ্ঞানসাধনা ও অধ্যবসায়ের পরই ইলমের গুণ অর্জিত হয় বলে এ গুণটি যেন একটি স্বভাবে পরিণত হয়। এ কারণে ইলমের মধ্যে প্রথম প্রবেশকালে ইলমের গুণ অর্জিত হয় না; বরং এরূপ ব্যক্তি মুতাআল্লিম (শিক্ষার্থী) হয়; আলিম হয় না। সুতরাং এ স্বভাবটি চর্চিত হতে হতে যখন পুরোটাই নিজের রুচি ও মননসিদ্ধ হবে, তখনই সে কার্যত আলিমে পরিণত হবে।"[১৯২]

উপরিউক্ত কথা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইলম হলো একটি গুণ, একটি যোগ্যতা, একটি প্রতিভা, যা সাধারণত দীর্ঘ অধ্যবসায় ও সাধনার পরেই অর্জিত হয়; যৎসামান্য চেষ্টা ও পড়ালেখার মাধ্যমে এ গুণ, যোগ্যতা ও প্রতিভা অর্জিত হয় না। কাজেই যারা দীর্ঘ অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে এ গুণ, যোগ্যতা ও প্রতিভা অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং এ গুণ, যোগ্যতা ও প্রতিভা তার স্বভাব ও রুচিতে পরিণত হবে, তবেই সে প্রকৃত আলিমে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে যারা পড়াশোনা করেছে; কিন্তু এ স্বভাবতুল্য গুণ, যোগ্যতা ও প্রতিভা অর্জন করতে পারেনি, তারা কার্যত আলিম নামে পরিচিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। এদের বেশিপক্ষে মুতাআল্লিম (শিক্ষার্থী) বা ইলমের জগতে অনুপ্রবেশকারী বলা যেতে পারে।

---

১৯২. ইবনু মানযূর, মুহাম্মাদ, *লিসানুল আরব*, বৈরুত : দারু সাদির, ১ম সংস্করণ, খ. ১২, পৃ. ৪১৬

https://nagorikpathagar.org

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় উপমহাদেশে যারা কওমী ও আলিয়া মাদরাসাসমূহে পড়া শেষ করেন, তাদের সাধারণত আলিম বলা হয়। কিন্তু বর্তমানে কওমী ও আলিয়া মাদরাসাসমূহে প্রচলিত সিলেবাস শেষ করে সকলেই কি উল্লিখিত গুণ, যোগ্যতা ও প্রতিভা অর্জন করতে সমর্থ হয়?! বাস্তবতা হলো– অধিকাংশ শিক্ষার্থী এ দুই ব্যবস্থায় মাদরাসায় পড়া শেষ করেন বটে; কিন্তু তারা সেই কাঙ্ক্ষিত গুণ, যোগ্যতা ও প্রতিভা অর্জন করতে পারে না বললে অত্যুক্তি হবে না। ফলে তাদের সবাইকে সাধারণভাবে আলিম নামে আখ্যায়িত করা দুরূহ। আমার পর্যবেক্ষণমতে, পাঁচ থেকে সর্বোচ্চ দশ ভাগ শিক্ষার্থী সেই মৌলিক গুণ ও যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আর এদের আলিম বলতে হবে, বলাটা উচিত। তবে আমাদের সমাজে বাকি নব্বই ভাগ ছাত্রও আলিম হিসেবে পরিচিত। এটা আমাদের জন্য বড়ো দুর্ভাগ্য।

আলিমের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলি

আলিমের উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা অনুসারে একজন ব্যক্তি 'আলিম' নামে অভিহিত হওয়ার জন্য তাকে কতিপয় যোগ্যতা ও গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। এ যোগ্যতা ও গুণগুলোকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়– ক. অ্যাকাডেমিক, খ. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক।

ক. অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন প্রকৃত আলিম মানেই মুজতাহিদ। জ্ঞান-গরিমা, চিন্তাশক্তি ও উদ্ভাবনক্ষমতা প্রভৃতি বিচারে যেমন মুজতাহিদগণের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে, তেমনি আলিমগণের মধ্যেও স্তরভেদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ সাধারণ স্তরের আলিম, কেউ হলেন মধ্যমপর্যায়ের বিজ্ঞ আলিম, আর কেউ হলেন মুজতাহিদের পর্যায়ভুক্ত আলিম। আমরা নিম্নে একজন সাধারণ স্তরের আলিমের প্রয়োজনীয় অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা তুলে ধরছি।

১. আল-কুরআনুল কারীম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান

আল-কুরআন হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের প্রধান উৎস। সুতরাং আলিম হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে আল-কুরআন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, পবিত্র আল-কুরআনে উল্লেখিত সকল বিধিবিধান এবং এগুলোর অন্তর্নিহিত মর্ম, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে যেমন তাঁর গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন,

https://nagorikpathagar.org

তেমনি পবিত্র আল-কুরআন বোঝার জন্য যে সকল আনুষঙ্গিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় (যেমন– নাসিখ-মানসূখ, আয়াত নাযিলের উপলক্ষ্য ও প্রেক্ষাপট প্রভৃতি), সেসব বিষয় সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক।

২. আল-হাদীস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান

আল-কুরআনের পরে ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস। এটি মূলত আল-কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক রূপ। অধিকন্তু, অনেক ক্ষেত্রে হাদীস ব্যতীত কুরআনের নির্দেশের প্রকৃত রূপ ও মর্ম উদ্ধার করাও সম্ভব নয়। কাজেই আলিম হওয়ার জন্য কুরআনের পর হাদীস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বলা বাহুল্য যে, বর্তমানে হাদীসের বহু বিশাল বিশাল সংকলন পাওয়া যায় এবং সেগুলোতে সহীহ-দাঈফ-মাওদূ মিলে অজস্র হাদীস বর্ণিত আছে। যেহেতু কারও পক্ষে সকল হাদীস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অনেক দুরূহ ব্যাপার, তাই অন্ততপক্ষে একজন আলিমকে সহীহাইন ও সুনানে আরবাআতে উল্লেখিত হাদীসসমূহ, বিশেষ করে বিধিবিধান-সংবলিত সকল হাদীস সম্পর্কে অবগত হতে হবে। তবে এসব হাদীস মুখস্থ থাকা জরুরি নয়। হাদীসটি কোন অধ্যায়ে আছে এবং প্রয়োজনের সময় হাদীসটি সহজে বের করতে পারেন– এতটুকুই যথেষ্ট। তদুপরি একজন আলিমের জন্য যেমন হাদীসের অন্তর্নিহিত মর্ম, তাৎপর্য ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনি হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় (যেমন– হাদীসের মর্যাদা ও শুদ্ধতা নির্ণয়সংক্রান্ত জ্ঞান, রাবীদের অবস্থা, নাসিখ-মানসূখ প্রভৃতি) সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। তবে জারহ ও তাদীলবিষয়ক সকল কিছুই মুখস্থ থাকা আলিমের জন্য আবশ্যক নয়। বরং হাদীসের ইমামগণ কর্তৃক রচিত 'জারহ ও তাদীল'-বিষয়ক কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ভালোভাবে জানা থাকা কিংবা হাদীসগুলো সম্পর্কে হাদীসের ইমামগণের বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য জানা থাকা বা প্রয়োজনে খুঁজে বের করতে পারাটাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

৩. ইজমা সম্পর্কে সম্যক অবগতি

ইজমা অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন, সেসব বিষয়ে একজন আলিমকে অবগত থাকতে হবে। কারণ, সেসব বিষয়ে নতুন কোনো চিন্তা-গবেষণা করার অবকাশ খুব একটা থাকে না; বরং সেসব ক্ষেত্রে সর্বস্বীকৃত মতটিই প্রাধান্য পাবে।

https://nagorikpathagar.org

৪. উসূলুল ফিকহ-এর ওপর ব্যুৎপত্তি অর্জন

একজন আলিমকে উসূলুল ফিকহ তথা ইসলামী আইনের ওপর গবেষণা করার মূলনীতি, ইসলামী আইনের মৌলিক ও সম্পূরক দলীলসমূহ এবং এগুলো প্রয়োগের নীতি, পরস্পর সাংঘর্ষিক দলীলসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন বা অগ্রাধিকারদানের নিয়ম প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকতে হবে।

৫. ইমামগণের উদ্ভাবিত মাসায়িল ও ইখতিলাফ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান

একজন আলিমকে পূর্বসূরি মুজতাহিদ ইমামগণের উদ্ভাবিত মাসায়িল ও ইখতিলাফ সম্পর্কেও পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখতে হবে, যাতে তিনি তাঁদের মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। যেহেতু কারও পক্ষে পূর্বসূরি মুজতাহিদ ইমামগণের উদ্ভাবিত সকল মাসায়িল ও ইখতিলাফ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অনেক দুরূহ ব্যাপার, তাই অন্তত পক্ষে একজন আলিমকে ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে অবগত হতে হবে। তবে এসব গ্রন্থের সবকটি বিষয় মুখস্থ থাকা জরুরি নয়; বরং প্রয়োজনের সময় মাসআলা অনুসন্ধান করে সহজে সমাধান বের করতে পারেন, এতটুকু যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট।

৬. ইলমুল আকায়িদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান

ইলমুল আকায়িদ সম্পর্কেও আলিমের প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তবে অবশ্যই তাঁর এতৎসংক্রান্ত পক্ষ-বিপক্ষের নানা যুক্তিতর্ক সম্পর্কে একজন কালামবিদ বা ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিবিদের মতো সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক নয়; বরং তাঁর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসগুলো দলীল-প্রমাণসহ দৃঢ়ভাবে জানবেন এবং বিশ্বাস করবেন।

৭. শরীয়তের মাকাসিদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান

শরীয়তের মাকাসিদ তথা শরীয়তের বিধিবিধানসমূহের উদ্দেশ্যাবলি ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যসমূহ সম্পর্কেও আলিমকে সম্যক অবগত থাকতে হবে। সময়ের আবর্তনে সংঘটিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে এ জ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয়। উসূলুল ফিকহ জানা এবং এতে দক্ষ হওয়া ব্যতীত যেমন শরীয়তের বিভিন্ন উৎস থেকে বিধান প্রতিপাদন করা এবং নতুন কোনো বিষয়ে শরীয়তের সমাধান দেয়া সম্ভব নয়, তেমনি মাকাসিদের জ্ঞানের অভাবেও তা সম্ভবপর নয়। তাই ইমাম ইমাম আশ-শাতিবী [মৃ.-৭৯০ হি.] (রহ.) বলেন–

https://nagorikpathagar.org

فإذا بلغ الإنسان مبلغًا، فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله.

"যখন কেউ এমন পর্যায়ে উন্নীত হবে যে, সে শরীয়তের প্রতিটি বিষয় ও অধ্যায়ে শরীয়াহ-প্রণেতার উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, তখনি কেবল সে শরীয়তের শিক্ষা দান, ফতোয়া প্রদান ও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে।"[১৯৩]

অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন–

وأكثر ما تكون– أي زلة العالم– عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذى اجتهد فيه.

"অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলিমগণ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যখন তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাকাসিদ বিবেচনায় উদাসীনতা প্রদর্শন করেন।"[১৯৪]

এ কারণে তিনি প্রায় সিদ্ধান্তমূলক মত জানিয়ে বলেন–

إِنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَقَاصِدَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَمْ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّتَكَلَّمَ فِيْهِمَا

"যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর মাকাসিদ সম্পর্কে অবগত নয়, তার জন্য এ দুটির ব্যাপারে বক্তব্য দেওয়া বৈধ হবে না।"[১৯৫]

৮. আরবী ভাষার ওপর দক্ষতা

কুরআন ও হাদীস থেকে শুরু করে ইসলামী বিধিবিধানের মৌলিক সকল উৎসই আরবী ভাষায় প্রণীত। তাই ইসলামী বিধিবিধানের ব্যাপারে যথার্থরূপে কোনো কথা বলতে হলে আলিমকে অবশ্যই আরবী ভাষার ওপর দক্ষ হতে হবে। এক্ষেত্রে আরবী ভাষার পণ্ডিত না হলেও ন্যূনপক্ষে আরবী ভাষা

---

১৯৩. শাতিবি, আবূ ইসহাক ইবরাহিম, *আল মুওয়াফাকাত*, দারু ইবনে আফফান : ১৯৯৭, খ. ৫, পৃ. ৪৩

১৯৪. শাতিবি, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ১৩৫

১৯৫. শাতিবি, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩১

https://nagorikpathagar.org

সঠিকভাবে বোঝার মতো সম্যক জ্ঞান তাঁর থাকতে হবে। এজন্য সারফ (শব্দপ্রকরণ), নাহু (বাক্যপ্রকরণ), লুগাত (ভাষাজ্ঞান) ও বালাগাত (অলংকারশাস্ত্র) প্রভৃতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া আবশ্যক।

উল্লেখ্য, আরবী ভাষাসংক্রান্ত যেকোনো দুর্বলতা বা অদক্ষতার কারণে চরম প্রচেষ্টা নিয়োগ করা সত্ত্বেও তাঁর প্রদত্ত বক্তব্যে ভুল থাকার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।[১৯৬] কাজেই আলিমদের মধ্যে আরবী ভাষার জ্ঞান যার যত বেশি থাকবে, তার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যগুলোর মর্ম ও ইঙ্গিত সঠিকভাবে উপলব্ধি করা তত বেশি সম্ভব হবে। এ কারণে ইসলামের সকল মনীষীই মুজতাহিদ ও মুকাল্লিদ নির্বিশেষে সকল মুসলিমের জন্য আরবী ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনু তাইমিয়াহ রহ. বলেন–

وَنَفْسُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الدِّيْنِ وَمَعْرِفَتُهَا فَرْضٌ وَاجِبٌ، فَإِنَّ فَهْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَرْضٌ، وَلَا يُفْهَمُ إِلَّا بِفَهْمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

"আরবী ভাষা দ্বীনের অঙ্গীভূত। কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা ফরয আর আরবী জানা ছাড়া যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ বোঝা সম্ভব নয়, তাই আরবী জানাও একটি আবশ্যকীয় ফরয। ইসলামী আইনের একটি স্বীকৃত মূলনীতি হলো– যা ছাড়া ওয়াজিব সম্পাদিত হবে না, তাও ওয়াজিব অর্থাৎ ওয়াজিবের পূর্বশর্তও ওয়াজিব।"[১৯৭]

---

১৯৬. আরবী ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জন প্রসঙ্গে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন–

أنفقت في الحديث أربعين ألفا, وفي الأدب ستين ألفا, وليت ما أنفقت في الحديث أنفقته في الأدب! قيل له : كيف؟ قال: لأن الخطأ في الأدب يؤدي إلى الكفر.

"আমি হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য ব্যয় করেছি চল্লিশ হাজার দিরহাম, আর আরবী সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করার জন্য ব্যয় করেছি ষাট হাজার দিরহাম। তিনি আক্ষেপ করে বলেন– যদি আমি হাদীসের জন্য যা ব্যয় করেছি, তা সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করার জন্য ব্যয় করতাম! তাকে জিজ্ঞেস করা হলো– আপনার এ ধরনের চিন্তা করার কারণ কী? তিনি বললেন– এর কারণ হলো, সাহিত্যে ভুল কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।" (*আল-মাদখাল ইলাল আরাবিয়্যাহ*, পৃ. ৬)

১৯৭. ইবনু তাইমিয়াহ, *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম*, কায়রো : মাতবাতুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়াহ, ১৩৬৯ হি., খ.১, পৃ.৪২৪; মুনাবী, আবদুর রাউফ, *ফায়যুল কাদীর*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪, খ. ৬, পৃ. ৫০

https://nagorikpathagar.org

৯. ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান

ইতিহাস হলো জ্ঞানের এমনই এক শাখা, যা মানুষকে তার শেকড় সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে, শেকড়ের সাথে বন্ধন মজবুত করে এবং সবশেষে ইতিহাস থেকে অর্জিত শিক্ষা মানুষকে বলে দেয় তার কোন পথে যাওয়া উচিত, আর কোন পথ ভুলেও মাড়ানো উচিত নয়। উপরন্তু, একটি জাতির ঐতিহ্য ও অতীতের গৌরবান্বিত ইতিহাস ঐ জাতিকে বর্তমানের মর্যাদাপূর্ণ কর্মতৎপরতায় উদ্দীপিত করতে পারে। বিশিষ্ট দার্শনিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনু সিনা (৩৭০-৪২৭ হি.) ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞানকে মানুষের উন্নতি ও সাফল্যের জন্য সর্বাপেক্ষা উপকারী বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেন–

> "ইতিহাসের জ্ঞান মানুষকে সত্য ও ন্যায় এবং অসত্য ও অন্যায়ের মধ্যে কার্যত পার্থক্য করতে শেখায়, তাকে বাস্তব নির্দেশনা দেয়– কোন পথটি সঠিক ও কল্যাণকর এবং কোন পথটি ভুল ও ক্ষতিকর। অধিকন্তু, ইতিহাসের সুবাদে মানুষ সত্য ও সুন্দরকে আঁকড়ে ধরতে শেখে এবং অন্যায় ও বিপদ থেকে বাঁচার উপায় জানতে পায়।"[১৯৮]

একজন আলিমকে অন্তত ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিমদের অবদান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে তিনি ইসলামের ইতিহাসের কল্যাণ ও সৌন্দর্যগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারেন, সঠিক পথনির্দেশের মাধ্যমে উম্মাহর হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে ভূমিকা রাখতে পারেন এবং ইসলামবিরোধীদের প্রোপাগান্ডাসমূহের সমুচিত জবাব দিতে পারেন।

১০. সমাজ ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে বাস্তবসম্মত জ্ঞান

আলিমকে অবশ্যই তাঁর সমাজ ও চতুর্দিকে বসবাসকারী মানুষের রীতিনীতি, চিন্তাচেতনা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হতে হবে। আলিম যদি এক জগতে থাকেন, আর সমাজের মানুষেরা অপর এক জগতে থাকে, তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর চিন্তাভাবনা ও বক্তব্য যথার্থ ও বাস্তবসম্মত নাও হতে পারে। কারণ, এ অবস্থায় আলিমের চিন্তাভাবনা কেবল যা হওয়া উচিত, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; বাস্তব অবস্থার দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে না।

উল্লেখ্য যে, মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ও অবক্ষয় এবং তাদের জীবনমানের উন্নতি ও অবনতির কারণে তাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন

---

১৯৮. ইবনু সীনা, *আস সিয়াসাহ*, পৃ. ৮

https://nagorikpathagar.org

পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। কাজেই এসব পরিবর্তিত অবস্থার কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনস্বার্থে স্থান, সময় ও অবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী হুকুমের মধ্যে পরিবর্তনের অবকাশ রয়েছে। ইসলামী শরীয়তের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো, لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.-"সময়ের পরিবর্তনে বিধান পরিবর্তনের প্রসঙ্গকে অস্বীকার করা যায় না।"[১৯৯] অর্থাৎ, এটা স্বীকার্য যে, (ক্ষেত্রবিশেষে) সময় পরিবর্তন হলে বিধানেও পরিবর্তন আসতে পারে।[২০০] কাজেই একজন আলিমকে অবশ্যই সমাজসচেতন হতে হবে এবং সাম্প্রতিক পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। তবেই তাঁর বক্তব্য বাস্তবসম্মত ও যুক্তিভিত্তিক হতে পারে।

১১. আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকলে আলিমের জন্য ভালো। এ অবস্থায় তিনি ইসলামের কথাগুলো অধিক যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন। তদুপরি কালের আবর্তনে উদ্ভূত নতুন নতুন আবিষ্কার, চিকিৎসা পদ্ধতি ও ব্যবসায়িক রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত দিতে হলেও এ জ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয়। অন্ততপক্ষে এ জাতীয় কোনো বিষয়ে মতামত দিতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও কুশলীদের মতামত সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক। যেমন– ডাক্তারি বিষয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং অর্থনীতির বিষয়ে অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদের সাথে আলোচনা করে পরিপূর্ণ স্বচ্ছ ধারণা গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলি

একজন আলিম মুত্তাকী, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত, হালাল উপার্জনকারী, সৎসাহসী, সদালাপী, বিনয়ী ও চরিত্রবান হবেন। তিনি বিদআতী, অসৎ,

---

১৯৯. মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, *কাওয়ায়িদুল ফিকহ*, করাচী : সাদাফ পাবলিশার্স, ১৯৮৬, পৃ. ১১৩

২০০. যেমন– নামাযের জন্য মহিলাদের মসজিদে গমন প্রসঙ্গ। পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় পর্দাসহ সাধারণ বেশভূষা সহকারে মসজিদে গমন করতে মহিলাদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই; কিন্তু যেখানে রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়, তা ছাড়া যেখানে অতিরিক্ত সাজসজ্জা সহকারে বের হওয়া তাদের নিয়মে পরিণত হয়েছে, সেখানে তাদের জন্য মসজিদে যাওয়া জায়িয নয়।

https://nagorikpathagar.org

প্রবৃত্তিগামী ও স্বার্থপূজারি, চাটুকার ও দাম্ভিক হবেন না ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এসব গুণ অবশ্যই প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যেই থাকা আবশ্যক; বরং আলিমের মধ্যে এসব গুণ আরও ভালোভাবেই থাকা আবশ্যক।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম আবূ বাকর আল-আজুররী [মৃ. ৩৬০ হি.] রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন–

"একজন আলিমের ইলমী যোগ্যতার পাশাপাশি কিছু নৈতিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন– তাঁর সহচররা তাঁর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে; তাঁর সঙ্গী ও মিত্ররা তাঁর পক্ষ থেকে কল্যাণের আশা রাখে; তিনি পদস্খলনগুলো মার্জনা করেন; অন্যের দোষ প্রচার করেন না; প্রচার-প্রোপাগান্ডায় বিশ্বাস করেন না; শত্রুর গোপনীয়তা ফাঁস করেন না এবং তার নিকট থেকে অন্যায়ভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না; লোকদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন ও মাফ করেন; তিনি সত্যের কাছে নত হন; অন্যায়ের ব্যাপারে কঠোর; রাগ সংবরণকারী, যারা তাঁকে কষ্ট দেয়, তা হজম করেন; তিনি সেসব লোকের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা লালন করেন– যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য আচরণ করে; চুপ থেকে নির্বোধদের কথার জবাব দেন এবং আলিমদের কথায় সাড়া দেন ও গ্রহণ করেন। তিনি তোষামুদে ও চাটুকার নন; শত্রুতা পোষণকারী নন; অহংকারী ও দাম্ভিক নন; হিংসুটে ও বিদ্বেষ পোষণকারী নন; অবিবেচক ও নির্বোধ নন; রুক্ষ, কঠোর ও নির্দয় নন; দোষারোপকারী নন; অভিসম্পাতকারী নন; গীবতকারী নন; গালমন্দকারী নন। তিনি সেসব ভাইয়ের সাথে মেলামেশা করেন, যারা তাঁকে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত ও আনুগত্যের কাজে সহযোগিতা করেন এবং তাঁর অপছন্দনীয় কাজ থেকে বারণ করেন। তিনি সেসব লোকের সাথেও সুন্দর আচরণ করেন, যাদের অনিষ্ট থেকে তিনি নিরাপত্তা বোধ করেন না এ আশায় যে, সে তার দ্বীনের ওপর অটল থাকবে। তিনি সুস্থ অন্তরের অধিকারী হন, তাঁর অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়। তিনি প্রবল সুধারণা পোষণকারী হন, যথাসম্ভব তিনি মুমিনদের প্রতি সুধারণা পোষণ করেন। তিনি কারও নিকট থেকে কোনো নিয়ামতের অপসারণ কামনা করেন না। কোনো ব্যক্তি তাঁর সাথে অবিবেচকের মতো রুক্ষ আচরণ করলেও তিনি তার সাথে নম্র আচরণ করেন। যখন তিনি কারও অবিবেচকতা ও মূর্খতায়

https://nagorikpathagar.org

আশ্চর্যান্বিত হন, তখন তিনি স্মরণ করেন– তার ও তার রবের মধ্যে তার অবিবেচকতা ও মূর্খতার মাত্রা তার সাথে কৃত অবিবেচকতা ও মূর্খতার চেয়েও অনেক বেশি। তিনি তার কোনোরূপ ক্ষতি কামনা করেন না এবং নিজেও তার পক্ষ থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা করেন না। লোকজন তাঁর ব্যাপারে নিরাপত্তা ও স্বস্তি বোধ করে আর তিনি নিজের ব্যাপারে খুবই পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হন।"[২০১]

সুপ্রিয় পাঠকগণ, এবার আমরা বাস্তব অবস্থার দিকে একটু তাকাই। বর্তমান সময়ে এসব অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন লোকদের সংখ্যা কী পরিমাণ হতে পারে? প্রত্যেক খ্যাতিমান ওয়ায়িয, সুবক্তা ও আলোচক, কওমী বা আলিয়া ডিগ্রিধারী অথবা ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ও পিএইচ.ডি ডিগ্রিধারী কিংবা সেলিব্রেটি ওয়ায়িয, লেখক ও গবেষক অথবা কিতাবের তাহকীককারীর মধ্যে কি এসব যোগ্যতা ও গুণ রয়েছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে বিগত শতাব্দীর প্রখ্যাত শাইখ ড. আবদুস সালাম বিন বারজিস রহ.-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যে। তিনি বলেন–

"নিশ্চয় 'আলিম' বলে ডাকা যায়– এমন লোকের সংখ্যা খুবই অল্প। এটা অতিরঞ্জন হবে না যে, যদি বলা হয়– এমন ব্যক্তি বর্তমানে বিরল। এর কারণ হলো, একজন আলিমের কতগুলো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর বর্তমানে নিজেদের ইলমের সাথে সংযুক্তকারী অধিকাংশের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশই পাওয়া যায় না। সুতরাং একজন আলিম সে নয়, যে একজন সুবক্তা; একজন আলিম সে নয়, যে একটি কিতাব সংকলন করে অথবা একটি পাণ্ডুলিপির তাহকীক করে। আর শুধু এসব কারণেই যদি কাউকে আলিম বোঝানো হয়, তাহলে আলিম নন– এমন অনেকেই আলিম হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যাবেন। আর বর্তমানে সাধারণ জনগণের অনেকেই আলিম নন, এমন লোকদের বাগ্মিতা ও লেখালেখির কাছে নিজেদের বিনম্র করেছে। সুতরাং এই বিষয়গুলো (বাগ্মী হওয়া, কিতাব সংকলন করা, পাণ্ডুলিপির তাহকীক করা ইত্যাদি) তাদের কাছে একটি বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে গেছে। সত্যিকারার্থে একজন আলিম হলেন তিনি, যিনি

২০১. আজুররী, *আখলাকুল উলামা*, পৃ. ৪৫

https://nagorikpathagar.org

শারঈ ইলমের ব্যাপারে বিজ্ঞ এবং কিতাব ও সুন্নাহর হুকুম-আহকামের সাথে পরিচিত, নাসিখ-মানসূখ, মুতলাক-মুকাইয়্যাদ, মুজমাল-মুফাসসারের মতো বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত এবং যিনি সেসব ব্যাপারেও সালাফের বক্তব্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, যেসব ব্যাপারে তাঁরা মতপার্থক্য করেছেন।"[২০২]

আলিমের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য

'আলিম' অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি আখ্যা, একটি গৌরবময় পদবি– যা আল্লাহ তাআলা স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী কেবল তাঁর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের দান করে থাকেন। আলিমগণ হলেন সম্মানিত নবী ও রাসূলগণের ওয়ারিস ও খলীফা। উপরন্তু, আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে তাঁদের বহু মর্যাদা ও বিশিষ্ট ফযীলত। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের (মান-মর্যাদার) স্তরগুলো বুলন্দ করেন। (অর্থাৎ, তাদের মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।) তোমরা যা কিছু করো, সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ খবর রাখেন।"[২০৩]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

---

২০২. আবদুস সালাম, *মান হুমুল উলামা* শীর্ষক অডিয়ো ক্লিপ থেকে সংগৃহীত, সোর্স : সালাফিটক (salafitalk) ডট নেট।

২০৩. আল-কুরআন, ৫৮ (সূরা আল-মুজাদালাহ) : ১১

https://nagorikpathagar.org

"যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ পাড়ি দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহের মধ্যে একটি রাস্তা অতিক্রম করান। আর ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর জন্য তাঁদের ডানা বিস্তার করে দেন। এ ছাড়া একজন আলিমের জন্য আসমান ও যমীনের সবকিছুই, এমনকি পানিতে বসবাসকারী মাছও ক্ষমাপ্রার্থনা করে। আর ইবাদাতে মশগুল ব্যক্তির ওপর আলিমের মর্যাদা পূর্ণিমার রাতে সকল নক্ষত্রের ওপর চাঁদের মর্যাদার মতোই। আলিমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। (জেনে রেখো যে,) নবীগণ কোনো দিনার-দিরহাম (অর্থাৎ, অর্থসম্পদ) রেখে যাননি (যা তাঁদের পরে আলিমগণ উত্তরাধিকারীরূপে তার মালিক হবে); বরং তাঁরা (সম্পদরূপে কেবল) ইলমই রেখে গেছেন। কাজেই যারা তা অর্জন করবে, তারা (সমৃদ্ধির) বিপুল অংশ অর্জন করল।"[২০৪]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.

"যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে কেবল কোনো কল্যাণ (ইলম) শেখার বা শেখানোর অভিপ্রায়ে আসবে, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মর্যাদার অধিকারী। আর যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসে, সে ওই ব্যক্তির অনুরূপ, যে অন্যের সম্পদ পরিদর্শনে আসে।"[২০৫]

এই বিশিষ্ট মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী সম্মানিত আলিমগণ রাসূলুল্লাহ সা. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে যুগে যুগে মানুষকে সত্য পথের নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন, তাদের শিক্ষাদান ও পরিশুদ্ধ করে যাচ্ছেন। তাঁরা একদিকে তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহর ইলমকে বক্ষে ধারণ করছেন, অপরদিকে এর প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। এ কারণে ইসলামে তাঁদের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব অত্যধিক। বস্তুতপক্ষে আলিমগণ হলেন আকাশের

---

২০৪. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইলম, হা. নং : ১/৩৬৪৩; হাদীসটি সহীহ।

২০৫. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, মুকাদ্দমাহ, হা. নং : ১৭/২২৭; হাদীসটি সহীহ।

https://nagorikpathagar.org

উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। এ পৃথিবীতে এঁদের মাধ্যমেই মানুষ সত্যের দিশা পায়, আলোর পথ লাভ করে। তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলে কিংবা কোথাও আচ্ছাদিত হয়ে পড়লে এ পৃথিবী নিকষকালো অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাবে এবং গোটা মানবসমাজ গভীর আঁধারে দিশেহারা হয়ে পড়বে। না তারা সত্যের কোনো সন্ধান পাবে, না কোনো আলোর পথ খুঁজে পাবে। সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَإِذَا انْطَمَسَتْ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ.

"পৃথিবীর আলিমগণের উদাহরণ হলো আকাশের নক্ষত্রের মতো, যাদের মাধ্যমে স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাওয়া যায়। নক্ষত্রগুলো নিষ্প্রভ বা অদৃশ্য হয়ে গেলে পথনির্দেশকরা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে।"[২০৬]

বিশিষ্ট তাবিঈ আবূ কিলাবাহ [মৃ. ১০৪ হি.] রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

مَثَلُ الْعُلَمَاءِ مَثَلُ النُّجُومِ الَّتِي يُهْتَدَى بِهَا، وَالأَعْلاَمِ الَّتِي يُقْتَدَى بِهَا، إِذَا تَغَيَّبَتْ عَنْهُمْ تَحَيَّرُوا، وَإِذَا تَرَكُوهَا ضَلُّوا.

"আলিমগণের উদাহরণ হলো আসমানের নক্ষত্রের মতো, যাদের মাধ্যমে পথ খুঁজে পাওয়া যায়। এঁরা এমন মহান দিকনিদের্শক, যাদের পথনির্দেশ অনুসরণ করা হয়। যদি তাঁরা অদৃশ্য হয়ে যান, তাহলে লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে; আর যদি লোকেরা তাঁদের বর্জন করে, তবে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"[২০৭]

---

২০৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু আনাস ইবনু মালিক রা.), হা. নং : ১২৬০০; আজুররী, আবূ বাকর, *আখলাকুল উলামা*, হা. নং : ১৫। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শুআইব আল-আরনাউত রহ.-এর মতে, হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। তবে ইমাম সুয়ূতী রহ.-এর মতে, হাদীসটি হাসান। (সুয়ূতী, *আল-জামিউস সাগীর*, খ. ১, পৃ. ২০৮, হা. নং : ২৪৪১)

২০৭. ইবনু আবী শাইবাহ, আবূ বাকর, *আল-মুছান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আছার*, (হাদীসু আবী কিলাবাহ রহ.), তাহকীক : মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, ভারত : আদ দারুস সালাফিয়্যাহ, তা. বি., খ. ১৩, পৃ. ৪৯৬, হা. নং : ৩৬৩২৬

https://nagorikpathagar.org

আলিমদের ঐক্যের গুরুত্ব

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আলিমগণ হলেন নবী-রাসূলগণের উত্তরসূরি, দ্বীনের অতন্দ্রপ্রহরী, দ্বীন রক্ষার ঢাল ও সুদৃঢ় প্রাচীর। মানুষের সংশোধন এবং সমাজের সংস্কার ও মেরামত হলো তাঁদের একটি প্রধান দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"তাদের প্রত্যেক দলটি থেকে কিছু কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে করে তারা দ্বীনের ওপর ব্যুৎপত্তি লাভ করত, অতঃপর যখন তারা নিজ জাতির কাছে ফিরে আসত, তখন তারা তাদের জাতিকে ভয় প্রদর্শন করত। আশা করা যায় যে, এতে তারা সতর্ক হয়ে চলবে।"[২০৮]

এ আয়াতে বলা হয়েছে, দ্বীনের ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আলিমদের একটি গুরুদায়িত্ব হলো– নিজ নিজ জাতিকে ভয় প্রদর্শন করা, যাতে তারা অন্যায় থেকে বিরত থাকে এবং সত্যপথে চলে। বস্তুতপক্ষে তাঁদের কাছেই মানুষ লাভ করে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান, চিনতে পারে নিজের রবকে, শিখতে পারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান। তাঁদের মাধ্যমেই মানুষ খুঁজে পায় নিজের আসল পরিচয় এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসে অন্ধকার জগতের মানুষ সন্ধান পায় আলোকিত জীবনের, মৃত হৃদয়গুলো হয় পুনরুজ্জীবিত, দুনিয়ার ভোগবিলাসে উন্মাদ মানুষ আখিরাতমুখী জীবন ধারণ করে। অধিকন্তু, আলিমগণ হলেন উম্মতের অভিভাবক। উম্মতের বিরুদ্ধে সব ধরনের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। তাঁরা নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করে সব ধরনের বাতিল মতবাদকে রুখে দেওয়ার জন্য অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যান। তাঁরা হক কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন না; হক প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জানমাল ব্যয় করাটা গৌরবের মনে করেন; বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করতে কালক্ষেপণ করেন না। তাঁদের হাতেই জিন্দা হয় সুন্নাত, দূরীভূত হয় বিদআত-রুসুমাত। তাঁরা ইলমে নববীর ময়দানে স্তূপীকৃত প্রত্যেকটি মিথ্যাচার, বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার জঞ্জাল থেকে তাকে পবিত্র করেন, মুক্ত করেন।

---

২০৮. আল-কুরআন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ) : ১২২

https://nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

يحمل هَذَا الْعلمَ منْ كُلِّ خلفٍ عدوله، ينفون عَنهُ تَحْرِيف الغالينَ، وانتحال المبطلينَ وَتَأْويل الْجَاهِلين.

"এ ইলম বহন করবে প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মের ন্যায়পরায়ণ লোকেরাই। তারা এ ইলম থেকে অতিরঞ্জনকারীদের বিকৃতি, ভণ্ডদের মিথ্যাচার ও অজ্ঞ-জাহিলদের অপব্যাখ্যা দূরীভূত করবে।"[২০৯]

ইসলামের অগ্রযাত্রার শুরু থেকেই শত্রুরা ইসলাম ও উম্মাহর বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকে এবং ক্রমশ তা বৃদ্ধি পেতে থাকে; কিন্তু দ্বীনের অতন্দ্রপ্রহরী আলিমগণ সব সময় এসব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে দ্বীনের ভাবমূর্তি এবং উম্মতের সম্মান রক্ষা করতে প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়েছেন। যখন যেখানেই তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং সংঘবদ্ধভাবে কাজ করেছেন, তখন সেখানে ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হতে পারেনি, তাদের যাবতীয় কূটচাল বুমেরাং হয়ে যায়। আর যখন যেখানেই তাঁরা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং পরস্পর দলাদলিতে লিপ্ত রয়েছে, তখন সেখানে ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হয়েছে এবং দ্বীন ও উম্মাহর ক্ষতি সাধন করেছে। কাজেই বলা চলে, দ্বীনের হিফাযত এবং উম্মতের শান্তি-সমৃদ্ধি ও উন্নতির অনেকাংশই আলিমগণের ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে কুরআন ও হাদীসের যত জায়গায় ঐক্যবদ্ধ ও জামাআতবদ্ধ থাকার নির্দেশ এসেছে, উম্মতের একান্ত অভিভাবক হিসেবে আলিমগণই হলেন সেসব নির্দেশের সর্বপ্রথম ও প্রধান উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

إِنَّ اللهَ لا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَذَّ شُذَّ إِلَى النَّارِ.

"আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে (বর্ণনান্তরে মুহাম্মাদ সা.-এর উম্মতকে) গুমরাহীর ওপর একত্র করবেন না। আল্লাহর হাত (অর্থাৎ, সমর্থন বা সহযোগিতা) থাকে জামাআতের সাথে। আর যে ব্যক্তি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[২১০]

---

২০৯. তাবারানী, *মুসনাদুশ শামিয়ীন*, হা. নং : ৫৯৯; তাহাভী, *মুশকালুল আছার*, হা. নং : ৩২৬৯

২১০. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব: আল-ফিতান), হা. নং : ২১৬৭। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, হাদীসটি গরীব।

https://nagorikpathagar.org

ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসে উল্লেখিত জামাআত-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আহলে ইলমের মতে, এখানে জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, أهل الفقه والعلم والحديث- ফকীহ, আলিম ও মুহাদ্দিসগণ। হাদীসের বিশিষ্ট ভাষ্যকার আবদুর রহমান আল-মুবারকপুরী রহ. বলেন, হাদীসে আলিমদের ঐকমত্যই বোঝানো হয়েছে; সাধারণ লোকদের ঐকমত্য বিবেচ্য নয়। কারণ, তাদের ঐকমত্য ইলমের ওপর ভিত্তি করে হয় না।"[২১১]

মোটকথা, আলিমদের ঐকমত্য মানেই উম্মতের ঐকমত্য, আর তাঁদের বিভাজন মানেই উম্মতের বিভাজন। তাঁরা চাইলে যেমন উম্মতকে ঐক্যবদ্ধও রাখতে পারেন, তেমনি উম্মতকে টুকরো টুকরোও করে দিতে পারেন। তাঁদের ঐক্য ও বিভাজনের ওপরই বহুলাংশে নির্ভর করবে উম্মতের ঐক্য ও বিভাজন। উম্মতের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি যেমন তাঁদের কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করে, তেমনি উম্মতের মধ্যে যেকোনো ফিতনা সৃষ্টি এবং উম্মতের মধ্যে বিভাজন তৈরির একটি প্রধান উপলক্ষ্যও তাঁরা। এ দিকেই ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "مِنْهُمْ خَرَجَتِ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ-(অচিরেই এমন একটি সময় আসবে, যখন) তাঁদের (আলিমসমাজ) থেকেই ফিতনার উদ্ভব হবে এবং পুনরায় সেই ফিতনা তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।"[২১২] অর্থাৎ, তাঁরা নিজেরাই সেই ফিতনার পরিণাম ভোগ করবে।

আলিমদের বিভেদের চিত্র : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে আলিমদের বহু ধারা-উপধারা ও দল-উপদল রয়েছে। আমরা তাঁদের প্রধান সাতটি ধারায় শ্রেণিকরণ করতে পারি। প্রধান সাতটি ধারার মধ্যে প্রত্যেকটি ধারাই যে বৈশিষ্ট্য ও কার্যগত দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তা নয়; বরং তন্মধ্যে কোনো কোনো ধারার মধ্যে অন্য ধারার বৈশিষ্ট্য ও কর্মগুলোও কমবেশি পাওয়া যায়। নিম্নে আমরা প্রথমে এ ধারাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরব, অতঃপর প্রত্যেকটি ধারার অন্তর্ভুক্ত দল-উপদল ও গ্রুপগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ।

---

২১১. মুবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী*, খ. ৬, পৃ. ৩২২

২১২. আবূ বাকর আদ-দাইনূরী, *আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম*, হা. নং : ৫১৯; বাইহাকী, *শুআবুল ঈমান*, হা. নং : ১৭৬৩; হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল।

https://nagorikpathagar.org

আলিমদের প্রধান প্রধান ধারা

ক. দেওবন্দী ধারা

এটি বাংলাদেশের আলিমগণের বৃহত্তর ধারা। এ ধারার আলিমগণ ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের মতাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁরা আকীদায় আশআরী ও মাতুরিদী চিন্তাধারার অনুসারী, ইলমুল কালাম (যুক্তিমিশ্রিত ও ব্যাখ্যানির্ভর ধর্মতত্ত্ব)-এর সমর্থক; ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ও তাসাউফের অনুবর্তী।

দেওবন্দী ধারার আলিমগণ সাধারণত তালীম, দাওয়াত-তাবলীগ ও (শরীয়াহনির্ভর) তাসাউফের সাথে জড়িত থাকেন। একসময় বাংলাদেশে এ ধারার আলিমগণ প্রায়ই প্রচলিত ধারায় রাজনীতিবিমুখ ছিলেন। এখনও তাদের মধ্যে একটি বড়ো অংশ রাজনীতিবিমুখ। তারা সাধারণত গণতন্ত্র চর্চার বিরোধী। এখন অবশ্যই তাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ প্রচলিত রাজনীতির সাথে জড়িত এবং গণতন্ত্রচর্চায়ও অংশগ্রহণ করেন।

খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. তাঁর কিতাব *আল-মুহান্নাদ*-এর শুরুতে দেওবন্দীদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন–

ليعلم أولا قبل أن نشرع في الجواب إنا بحمد الله ومشائخنا رضوان الله عليهم أجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الأنام وذروة الإسلام الإمام الهمام الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في الفروع، ومتبعون للإمام الهمام أبي الحسن الأشعري والإمام الهمام أبي منصور الماتريدي رضي الله عنهما في الاعتقاد والأصول، ومنتسبون من طرق الصوفية إلى الطريقة العلية المنسوبة إلى السادة النقشبندية والطريقة الزكية المنسوبة إلى السادة الجستية وإلى الطريقة البهية المنسوبة إلى السادة القادرية و وإلى الطريقة المرضية المنسوبة إلى السادة السهروردية رضي الله أجمعين.

"উত্তরের পূর্বে শুরুতেই জেনে রাখা উচিত– আমরা, আমাদের শাইখগণ, আমাদের সমস্ত জামাআত ও দল আলহামদুলিল্লাহ ব্যাবহারিক শাখাগত বিধিবিধানের ক্ষেত্রে ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী; উসূলুদ্দীন তথা দ্বীনের মৌলিক

https://nagorikpathagar.org

আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইমাম আবুল হাসান আল আশআরী ও ইমাম আবূ মানসূর আল মাতুরিদী রহ.-এর অনুসারী; সুলূক ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে নকশেবন্দিয়া, চিশতিয়া, কাদিরিয়া ও সুহরাওয়ার্দিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখি।"[২১৩]

▪ নদভী ধারা

দেওবন্দী ধারার একটি উল্লেখযোগ্য উপধারা হলো নদভী ধারা। এ ধারার প্রাণপুরুষ হলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও চিন্তাবিদ ভারতের লখনৌস্থ 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা'র মহাপরিচালক সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী [১৯১৩-১৯৯৯ খ্রি.] রহ.। তিনি ১৯৬২ সাল থেকে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ-এর মজলিসে শূরার স্থায়ী সদস্যও ছিলেন।

নদভী উপধারার আলিমগণ নিজেদের দেওবন্দী মতাদর্শের ধারক মনে করলেও দেওবন্দী আলিমগণ প্রশ্নাতীতভাবে তাদের নিজেদের একান্ত অনুসারীরূপে গণ্য করেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেউ কেউ তাদের অনেকটা দেওবন্দী-আদর্শচ্যুতও মনে করেন। চিন্তাধারা ও মনমানসিকতাগত দিক থেকে দেওবন্দীদের সাথে নদভীদের কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। নদভীগণ তুলনামূলকভাবে অধিকতর উদার মনোভাবাপন্ন ও সংস্কারমনা। এ উপধারাটি ভারতের লখনৌস্থ 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা'র চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত।

উল্লেখ্য যে, ১৮৯৪ সালে অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিন্তাধারার সাথে ইসলামী ফিকহ ও গবেষণাকে সমন্বয়ের ব্রত নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেওবন্দ ধারা থেকে নাদওয়াতুল উলামাকে একটি সংস্কারপন্থি প্রগতিশীল বলে মনে করা হয়। এমনকি দু-ধারার ড্রেস কোডও আলাদা। মুসলিম বিশ্ব দুটি প্রতিষ্ঠানকে দেওবন্দ স্কুল অব থট ও নাদওয়াতুল উলামা স্কুল অব থট বলে জানে। বাংলাদেশে নদভী ধারায় বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধতম হলো চট্টগ্রামের জামেয়া দারুল মাআরিফ।

---

২১৩. সাহারানপুরী, খলীল আহমাদ, *আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ*, (অনু : দেওবন্দী আহলে সুন্নাতের আকীদা, মাওলানা মো: আবদুল হাকীম), সিলেট : আল-হাবীব ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২, পৃ. ১৩-৪

https://nagorikpathagar.org

খ. সালাফী ধারা

এ ধারার আলিমগণ আকীদায় আছারী (ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত) চিন্তাধারার অনুসারী, ইলমুল কালামকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ফিকহের ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্যমতে, তাঁরা নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসরণের পরিবর্তে সহীহ হাদীসসমূহের অনুসরণ করেন; তাঁরা তাসাউফের বিরোধী ও সমালোচক। বাংলাদেশে এ ধারার আলিমগণ (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) প্রায়ই রাজনীতিবিমুখ। অধিকন্তু, তাঁরা গণতন্ত্রকে একটি কুফরী মতবাদ হিসেবে জানেন।

গ. বেরেলভী ধারা

এ ধারার আলিমগণ মুফতি আহমাদ রেযা খান বেরেলভীর চিন্তাধারার অনুসারী এবং ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের মুকাল্লিদ। এরা তাসাউফের জোরালো সমর্থক ও অনুবর্তী। এরা নবী-রাসূল ও ওলী-আল্লাহগণ সম্পর্কে এমন কিছু চিন্তা-বিশ্বাস পোষণ করেন, যা অন্য ধারার আলিমগণ অতিরঞ্জন, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে শিরক বলে গণ্য করেন। এ ধারার আলিমগণ সাধারণত রাজনীতিমুখী নন; যদিও তাঁরা অনেক সময় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

ঘ. দর্শননির্ভর বাতিনী সূফী ধারা

এ ধারার আলিমগণ ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ও প্রায়ই রাজনীতিবিমুখ। তাসাউফের ক্ষেত্রে তারা বাতিনী চিন্তার অনুসারী। তাদের মতে, শরীয়ত ও তরীকত দুটি ভিন্ন বিষয়। এরা তরীকত ও মারিফতের নামে এমন অনেক চিন্তা (যেমন– ইত্তিহাদ, ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ, হুলূল, ফানা, বাকা, তানাসুখুল আরওয়াহ, ওয়াহদাতুল আদয়ান, ইসকাতুত তাকালীফ প্রভৃতি) পোষণ করেন এবং কাজ করেন, যা প্রকাশ্যত ইসলামের আকীদা ও বিধিবদ্ধ রীতিনীতির পরিপন্থি।

ঙ. শরীয়তনির্ভর সুফী ধারা

এ ধারার আলিমগণ আকীদায় আশআরী ও মাতুরিদী চিন্তাধারার অনুসারী এবং ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের মুকাল্লিদ। তাঁদের মতে, শরীয়ত ও তরীকত দ্বীনের পরস্পর অবিচ্ছেদ্য দুটি অংশ। শরীয়ত হলো দ্বীনের বাহ্যিক অর্থাৎ কর্মমুখী ও ব্যাবহারিক রূপ আর তরীকত হলো আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক

https://nagorikpathagar.org

উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অনুসৃত পথ। এ ধারার অনুসারী আলিমগণ তরীকতের নির্দিষ্ট আমলগুলোর পাশাপাশি শরীয়তের বিধিবিধান পালনের প্রতিও তাগাদা দেন। তাদের মধ্যে অনেকেই বাতিনী সূফীদের উপর্যুক্ত চিন্তাগুলো ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন, আবার কেউ কেউ রদও করেন। এ ধারার আলিমগণও প্রায়ই রাজনীতিবিমুখ।

চ. মিশ্র ধারা

মিশ্র ধারা বলতে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর অনুসারী আলিমগণকে বোঝানো হয়েছে। এ ধারার মধ্যে বিভিন্ন ধারার আলিমগণের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এখানে বেশির ভাগ আলিম আলিয়া ধারায় শিক্ষিত হলেও দেওবন্দী ও সালাফী ধারায় শিক্ষিত অনেক আলিমও রয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এখানে আকীদার ক্ষেত্রে যেমন আছারী আকীদার অনুসারী আলিমগণ রয়েছেন, তেমনি আশআরী ও মাতুরিদী চিন্তাধারার অনুসারী আলিমগণও রয়েছেন; তবে কিছু বিষয়ে সকলেই মাওলানা সাইয়িদ আবুল আ'লা মাওদূদী রহ.-এর চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত। আর ফিকহের ক্ষেত্রে এখানে বেশির ভাগ আলিম হানাফী মাযহাবের মুকাল্লিদ, তবে কিছুসংখ্যক আলিম সালাফী চিন্তাধারার অনুসারী। এ ধারার আলিমগণ সকলেই রাজনীতিমুখী। তাদের মতে, ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এরা প্রচলিত নিয়মকানুন মেনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। তাসাউফের ক্ষেত্রেও এ ধারার মধ্যে বিভিন্ন চিন্তার আলিমগণ রয়েছেন। তবে তাদের অধিকাংশ আলিমই প্রচলিত তাসাউফে বিশ্বাসী নন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মূলত একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম। এটি নির্দিষ্ট কোনো ধর্মতাত্ত্বিক দল নয়; যদিও এর কিছু চিন্তা-বিশ্বাস নিয়ে অন্যান্য ধারার আলিমগণের সাথে মতপার্থক্য রয়েছে।

ছ. জিহাদী ধারা

এটি বাংলাদেশের আলিমগণের একটি ক্ষুদ্রতম ও বিচ্ছিন্ন ধারা। এ ধারার আলিমগণ মনে করেন, মুসলিম উম্মাহর সকল সমস্যার মূল কারণ হলো খিলাফতের অনুপস্থিতি। আর বর্তমানে প্রচলিত ধারায় গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব নয়। তাদের মতে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো সশস্ত্র জিহাদ বা বিপ্লব।

https://nagorikpathagar.org

বিভিন্ন ধারার দল-উপদলসমূহ

উপর্যুক্ত সাতটি ধারার আলিমগণ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা কারণে বহু দল-উপদল ও গ্রুপে বিভক্ত। নিম্নে সংক্ষেপে বিভিন্ন ধারার আলিমদের প্রধান প্রধান দল-উপদলগুলো তুলে ধরা হলো :

ক. দেওবন্দী ধারার দল-উপদলসমূহ

বাংলাদেশে দেওবন্দী আলিমগণের মাঝে বেশ কিছু উপদল, গ্রুপ ও রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক প্ল্যাটফরম রয়েছে। তাদের মধ্যে কয়টি দল-উপদল ও গ্রুপ রয়েছে এবং তারা কয়টি উপধারায় বিভক্ত– তা নিরূপণ করা সহজ নয়। প্রত্যেকটি বড়ো বড়ো মাদরাসাকেন্দ্রিক আলাদা আলাদা গ্রুপও রয়েছে। যেমন– চট্টগ্রামে হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম, পটিয়া আল জামেয়া আল ইসলামিয়া ও দারুল মাআরিফ– তিনটি শীর্ষস্থানীয় কওমী মাদরাসা রয়েছে। এ তিনটি মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে মনমানসিকতাগত দূরত্ব তো রয়েছে; উপরন্তু, কিছু কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্যও দেখা যায়। এ তিনটি মাদরাসাসমূহের মধ্যে তুলনামূলকভাবে হাটহাজারী মাদরাসাকে অধিকতর রক্ষণশীল, পটিয়া মাদরাসাকে কম রক্ষণশীল এবং দারুল মাআরিফকে উদার ও সংস্কারপন্থি হিসেবে গণ্য করা হয়। দেশের অন্যান্য জায়গার বড়ো বড়ো মাদরাসার মধ্যেও পারস্পরিক মনমানসিকতাগত ও চিন্তাগত দূরত্বের এ চিত্র কমবেশি লক্ষণীয়।

কওমীদের এই বহু দল-উপদলে বিভক্তির নানাবিধ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই হলো অর্থনীতি ও রাজনীতিসংশ্লিষ্ট কারণ। আকীদা ও ফিকহগত কারণ তেমন নেই বললেই চললে। তবে বর্তমানে তাদের মধ্যে একটি চিন্তাশীল অংশ বৈশ্বিক প্রভাবের কারণে পূর্বসূরিদের তুলনায় অধিকতর উদার মনোভাবাপন্ন ও সংস্কারপন্থি। এ ধারার আলিমগণকে কার্যক্রমের দিক থেকে প্রধানত ছয়টি উপধারায় বিভক্ত করা যায়–

এক. নির্বিবাদী দাওয়াহ ও তাবলীগী উপধারা,
দুই. রাজনৈতিক উপধারা,
তিন. সূফী উপধারা,
চার. অরাজনৈতিক প্রতিবাদী উপধারা,
পাঁচ. পীরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক উপধারা ও
ছয়. জিহাদী উপধারা।

https://nagorikpathagar.org

এক. নির্বিবাদী দাওয়াহ ও তাবলীগী উপধারা

১. তাবলীগ জামায়াত

এ উপধারার সর্ববৃহৎ সংগঠন হলো তাবলীগ জামায়াত। এর প্রবর্তক হলেন দিল্লীর অধিবাসী মাওলানা ইলইয়াস কান্ধলভী রহ.। এ ধারার আলিমগণ সাধারণত রাজনীতিবিমুখ ও নির্বিবাদী। তাঁরা কেবল দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে মানুষের সংশোধনে কাজ করেন। তাবলীগ জামায়াতের মূলভিত্তি হিসেবে ছয়টি উসূল বা মূলনীতিকে ধারণ করা হয়। এগুলো হলো– কালিমা; নামায; ইলম ও যিকর; ইকরামুল মুসলিমীন (মুসলিমদের সম্মান করা); সহীহ নিয়ত; দাওয়াত ও তাবলীগ।

এ উপধারাটি কিছু ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে বর্তমানে দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা–

১. তাবলীগ জামায়াত (মাওলানা জুবাইর আহমদ)। এ উপদলের নেতৃত্বে রয়েছেন বিশিষ্ট আলিমগণ। এ উপদলটি ওজাহাতী নামে পরিচিত। একে 'উলামা ইকরাম' গ্রুপও বলা হয়।

২. তাবলীগ জামায়াত (মাওলানা সাদ কান্ধলভী)। বাংলাদেশে এ উপদলের নেতৃত্বে অধিকাংশই রয়েছেন সাধারণ শিক্ষিতগণ। এ উপদলটি এতাআতী নামেও পরিচিত।

উল্লেখ্য যে, দেশের তাবলীগনির্ভর ধর্মীয় মহলে এখন চরম বিপর্যয়কাল চলছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। মসজিদে মসজিদে দুটি করে দল। কোথাও কোথাও তাদের সম্পর্কের এতই অবনতি ঘটছে যে, তা জখম ও মারামারির পর্যায়ে চলে যায়। মিল-মহব্বতের তাবলীগ ও ইখলাসের তাবলীগ অন্তত বাংলাদেশে যে মতান্তর, বিরোধ, বিদ্বেষ ও রক্তারক্তির নজির স্থাপন করছে– এমন কল্পনা সাধারণ মানুষ কখনও করেনি! আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, বছরের পর বছর মিল-মহব্বত ও ইখলাসের সাধনা করে এখন তাদের মধ্যে যে মতানৈক্য ও দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তা কখনও আর নিরসন হবে কি না।

২. মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ

এ উপধারার অপর একটি সংগঠন হলো মজলিসে দাওয়াতুল হক। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.। এ সংগঠনের আলিমগণের মতে, তিনি গভীর পর্যবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত গবেষণার পর

https://nagorikpathagar.org

উম্মতের দ্বীনী যিন্দেগীর কিছু ভুলভ্রান্তি চিহ্নিত করেন, অতঃপর সেগুলোর সংশোধনকল্পে এবং উম্মতের দ্বীনী জীবনে পূর্ণতা আনয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি কার্যক্রম হাতে নেন। উম্মতের সামনে দলীল-প্রমাণের আলোকে ঈমান, কুফর ও শিরক-বিদআতের পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরা, তাজবীদ অনুযায়ী বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষাদান, সকল আমলের পূর্ণাঙ্গ সুন্নাত তরীকা পেশ করে তার অনুসরণে উদ্‌বুদ্ধকরণ এবং মুনকারাত তথা হারাম, মাকরূহে তাহরীমী ও নাজায়িয কাজ সম্পর্কে অবহিতকরণ ছিল সেগুলোর অন্যতম। উলামায়ে কিরামের পরামর্শে তিনি এই মেহনতের নাম দেন মজলিসে দাওয়াতুল হক।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর ইন্তিকালের পর তাঁর খলীফা মাওলানা আবরারুল হক রহ.-এর হাত ধরে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এর চর্চা হয়। তাঁর ইন্তিকালের পর পাকিস্তানের হাকিম আখতার ফারুক মজলিসে দাওয়াতুল হকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাওলানা আবরারুল হক রহ.-এর খিলাফত পেয়েছেন বাংলাদেশের কয়েকজন আলিম। তাঁদের মধ্যে যাত্রাবাড়ী মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মাহমুদুল হাসান অন্যতম। তিনি বর্তমান মজলিসে দাওয়াতুল হকের আমীর। সংগঠনটির আরেক গুরুত্বপূর্ণ আলিম হলেন মুফতি মানসূরুল হক; তিনি রাজধানীর মোহাম্মদপুর জামিয়া রাহমানিয়া মাদরাসার মুহতামিম।

মজলিসে দাওয়াতুল হকের আয়োজনে মাহফিলগুলোতে কতগুলো পদ্ধতি ও নিয়ম কঠোরভাবে পালন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ওয়াজের জন্য মসজিদ বা মাদরাসা বেছে নেওয়া, রাস্তা বন্ধ করে মাহফিল না করা, সীমাবদ্ধ এলাকায় মাইক বসানো, বেশি রাত অবধি মাহফিল না করা, বয়ানের জন্য হাদিয়া বা সম্মানি পেশ না করা, অনুমতি ছাড়া খাবারের আয়োজন না করা, বক্তার আগমনে স্লোগান না দেওয়া, মঞ্চে আলোকসজ্জা না করা ইত্যাদি। এ সংগঠনের ওয়াজ মাহফিল ঢাকাতেই বেশি হয়ে থাকে। সারা দেশে অনেক মাদরাসায় সংগঠনটির চর্চা হয়।

দুই. রাজনৈতিক উপধারা

এ উপধারার আলিমগণ সাধারণত রাজনীতিমুখী এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। এ উপধারাটি রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে নানা দল-উপদলে বিভক্ত। যেমন–

https://nagorikpathagar.org

১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। এটি ১৯৮৭ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন নামে প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে 'ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ' নামেই নিবন্ধিত। এই দলটির বর্তমান প্রধান হচ্ছেন সৈয়দ রেজাউল করিম।

২. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ২২ মার্চ, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

উল্লেখ্য, ১৯১৯ সালে দারুল উলূম দেওবন্দকেন্দ্রিক সর্বপ্রথম ইসলামী রাজনৈতিক দল জমিয়তের কার্যক্রম শুরু হয়, তখন উপমহাদেশকেন্দ্রিক এ দলের নাম ছিল 'জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ'। পরবর্তীকালে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে তাদের নিজস্ব আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিভক্ত ভারতে মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-এর নেতৃত্বে পুনর্গঠিত হয়ে এর নাম 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে দলটির বাংলাদেশ অংশকে 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ' নামকরণ করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন তাজাম্মুল আলী। এরপর সভাপতি হন মরহুম আজিজুল হক। পরবর্তী সভাপতি আব্দুল করীম শাইখে কৌড়িয়া। তারপর সভাপতি হন মরহুম আশরাফ আলী বিশ্বনাথী। ২০০৫ সালে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হন মাসিক মদীনা সম্পাদক মুহিউদ্দীন খান। পরবর্তীকালে ২০ দলীয় জোটের অন্যতম প্রধান নেতা প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী ও সাংসদ মুফতি মোহাম্মদ ওয়াক্কাসের সাথে দলের আরেক শীর্ষ নেতা মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমীর নেতৃত্বের বিরোধকে কেন্দ্র করে দলে বিভাজন দেখা দেয় এবং দুটি উপদলে ভাগ হয়ে পড়ে–

ক. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (মুফতি মোহাম্মদ ওয়াক্কাস),

খ. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী)

৩. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল। মাওলানা আতাউল্লাহ ইবনে হাফেজ্জী হুজুর এই দলের আমীর এবং মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী মহাসচিব। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে মাওলানা হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

https://nagorikpathagar.org

৪. খেলাফত মজলিস

খেলাফত মজলিস একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল। দলটির আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক, মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের। ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ সালে ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এক জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে তৎকালীন শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হকের নেতৃত্বাধীন খেলাফত আন্দোলন, আহমদ আবদুল কাদেরের নেতৃত্বাধীন যুব শিবির, মওলানা ভাসানীর ন্যাপের একাংশের নেতা ও তমদ্দুন মজলিসের সংগঠক ভাষাসৈনিক অধ্যক্ষ মসউদ খানের নেতৃত্বে একীভূত হয়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম আমির ছিলেন বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন মওলানা আবদুল গফ্ফার। তারপর আমির হন শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক।

২০০১ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে গঠিত বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের একটি শরিক দল ছিল খেলাফত মজলিস। ২০০৫ সালে খেলাফত মজলিস ভেঙে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় :

ক. এক ভাগ 'খেলাফত মজলিস' নামে বিএনপি জোটে থেকে যায়।

খ. অপর ভাগটি জোট থেকে আলাদা হয়ে 'বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস' নাম ধারণ করে। মাওলানা ইসমাইল নূরপুরী এই দলের আমীর এবং মাওলানা মামুনুল হক সাধারণ সম্পাদক।

৫. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম

বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম বাংলাদেশের প্রাচীনতম একটি ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রাজনৈতিক দল। ১৯৪৫ সালের ২৮ ও ২৯ অক্টোবর কলকাতার মুহাম্মদ আলী পার্কে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সমর্থনে একটি উলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' নামে একটি নতুন সংগঠন। এই নতুন জমিয়ত পাকিস্তান প্রশ্নে মুসলিম লীগের পক্ষ নেয়। কিন্তু দেশ ভাগের পর মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে তাদের দূরত্ব তৈরি হয়। ফলে নবগঠিত পাকিস্তানে 'নেজামে ইসলাম' তথা ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুদূর পরাহত দেখে তারা নিরাশ হয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালে 'নিখিল ভারত জমিয়ত ওলামায়ে ইসলাম'-এর নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের সঙ্গ ত্যাগ করে 'নেজামে ইসলাম পার্টি' নামে পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

https://nagorikpathagar.org

এই লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার হয়বতনগরে দলটির কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনেই মাওলানা আতহার আলী রহ.-কে সভাপতি, চরমোনাই পীর সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক রহ.-কে সহ-সভাপতি, মাওলানা সৈয়দ মুসলেহ উদ্দিন রহ.-কে সাধারণ সম্পাদক এবং মাওলানা আশরাফ আলী ধর্মন্ডলীকে সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত করে 'নেজামে ইসলাম পার্টি'-এর কার্যক্রম শুরু হয়। যেকোনো মূল্যে পাকিস্তানে নেজামে ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে এ পার্টির প্রধান লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়।

নেজামে ইসলাম পার্টি উপমহাদেশে ইসলামী রাজনীতির একটি আলোচিত অধ্যায়ের নাম। একসময় এখানে এটি ইসলামী রাজনীতির প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রধান সংগঠন ছিল। ঐকমত্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনেও তাদের অংশীদারত্ব ছিল। কিন্তু পরে শাইখগণের বিভেদ থেকে শুরু হয় ভাঙন। পাকিস্তান আমলেই এই সংগঠনের জৌলুস ফিকে হতে শুরু করে। বাংলাদেশের শুরুতে নেজামে ইসলাম পার্টি হারিয়ে ফেলে রাজনৈতিক অধিকার। পরে রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পেলেও আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি এই সংগঠন। বর্তমানে এ দলটি দুটি ভাগে বিভক্ত :

ক. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (নিজামী)। এ দলের বর্তমান প্রধান হলেন মাওলানা এ কে এম আশরাফুল হক।

খ. বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (ইজহার)। এর বর্তমান আমীর হলেন সরওয়ার কামাল আজিজি ও মহাসচিব হলেন মূসা বিন ইযহার।

৬. ফরায়েজী আন্দোলন বাংলাদেশ

'ফরায়েজী আন্দোলন' ১৯ শতকের প্রথমদিকে সূচিত হয়েছিল। এ আন্দোলনের মুখপাত্র ছিলেন বিখ্যাত সমাজসংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহ। ফরায়েজী আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও পরবর্তীকালে এটি কৃষকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে রূপ লাভ করে। হাজী শরীয়তুল্লাহর ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র দুদু মিয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৮৬২ সালে দুদু মিয়া ইন্তিকাল করেন। তাঁর কোনো যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না। তাই নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে এই আন্দোলন চাপা পড়ে যায়। এভাবেই ফরায়েজী আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর হাজী শরীয়তুল্লাহর সন্তানসন্ততি ও অনুসারীরা মিলে 'ফরায়েজী আন্দোলন বাংলাদেশ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। বর্তমানে এর আমীর হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ রহ.-এর সপ্তম পুরুষ মাওলানা আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান, পীর সাহেব বাহাদুরপুর আর মহাসচিব হলেন মাওলানা আবদুর রহমান ফরায়েজী।

৭. ইসলামী ঐক্যজোট ও দফায় দফায় ভাঙন

'ইসলামী ঐক্যজোট' দেওবন্দী ঘরানার আলিমগণের একটি বড়ো রাজনৈতিক জোট। এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মূলত এই জোটটি গঠিত হয়। দেওবন্দী ঘরানার ছয়টি ইসলামী দল নিয়ে এই জোটটি গঠিত হয়। দলগুলো হচ্ছে– খেলাফত মজলিস, খেলাফত আন্দোলন, নেজামে ইসলাম পার্টি, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন (বর্তমান ইসলামী আন্দোলন), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও ফরায়েজী আন্দোলন।

ইসলামী ঐক্যজোট গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, চরমোনাইয়ের পীর মাওলানা ফজলুল করিম, মাওলানা আবদুল করিম শায়খে কৌড়িয়া, মাওলানা আশরাফ আলী ধর্মতলি, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান ও মাওলানা আহমাদুল্লাহ আশরাফ। ১৯৯৭ সালে ঐক্যজোটে ইসলামী মোর্চা নিয়ে যোগ দেন মুফতি ফজলুল হক আমিনী। তিনি ঐক্যজোটের মহাসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে সময় জোটপ্রধানের দায়িত্বে ছিলেন শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক।

১৯৯৮ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট গঠিত হয়। শাইখুল হাদীস আজিজুল হক ও মুফতি আমিনীর নেতৃত্বে ইসলামী ঐক্যজোট আট দফা দাবি নিয়ে চার দলীয় জোটে শরীক হয়। এ ঘটনায় জোট থেকে বের হয়ে যায় জোটের অন্যতম শরীক দল ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর জোটের আধিপত্য নিয়ে বিরোধ ঘটে জোটের চেয়ারম্যান শাইখুল হাদীস ও মহাসচিব মুফতি আমিনীর মধ্যে। প্রথমেই শাইখুল হাদীসকে বাদ দিয়ে মুফতি আমিনী নিজেকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করে নতুন ঐক্যজোট গঠন করেন। এই সময় মহাসচিব হিসেবে তিনি নেন নেজামে

https://nagorikpathagar.org

ইসলাম পার্টির নির্বাহী সভাপতি মুফতি ইজহারুল ইসলামকে। অপরদিকে শাইখুল হাদীস সাহেব মুফতি আমিনীকে জোট থেকে বহিষ্কার করে নিজে চেয়ারম্যান পদে থেকে যান এবং এম. আব্দুল মতিনকে মহাসচিব বানান। এরপর একপর্যায়ে শাইখুল হাদীসের জোটের কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

২০০৪ সালে মুফতি আমিনীর সাথে মহাসচিব মুফতি ইজহারুল ইসলামের দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং মুফতি ইজহারুল ইসলাম নতুন ঐক্যজোটের ঘোষণা দেন। নিজে চেয়ারম্যান থেকে মিসবাহুর রহমান চৌধুরী নামে একজনকে মহাসচিব বানিয়ে তিনি এ জোট গঠন করেন। সেইসাথে নেজামে ইসলাম পার্টি থেকে তিনি সরে এসে নতুন নেজামে ইসলাম পার্টি গঠন করেন।

মুফতি ইজহারুল ইসলাম তাঁর নতুন ইসলামী ঐক্যজোটকে শক্তিশালী করতে পারেননি। তাঁর সাথে প্রথম বিরোধ ঘটে দলের মহাসচিব মিসবাহুর রহমান চৌধুরীর সাথে। ফলে ২০০৫ সালের দিকে মিসবাহুর রহমান চৌধুরী নতুন জোটের ঘোষণা দেন। সে জোটে মাওলানা মুহিউদ্দিন খানের জামাতা মাওলানা নুরুল ইসলাম খানকে মহাসচিব বানানো হয়। কিছুদিন পরে মিসবাহুর রহমান চৌধুরীর মনোনীত মহাসচিব নুরুল ইসলাম খান ইউনাইটেড ইসলামিক পার্টি নামে নতুন একটি দল ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে মুফতি ইজহারুল ইসলাম হাফেজ জাকারিয়াকে নতুন মহাসচিব হিসেবে মনোনয়ন দেন। তবে এই দুই জোটই ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

২০০৮ সালের ১৭ নভেম্বর মুফতি আমিনীর ঐক্যজোট নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হয়। এই বছরই 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' নিজ নামে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হয়ে ঐক্যজোট থেকে বেরিয়ে যায়।

২০১২ সালে ডিসেম্বর মাসে মুফতি ফজলুল হক আমিনী ইন্তেকাল করেন। এরপর তাঁর ঐক্যজোটে পরিবর্তন ঘটে। এই জোটের মহাসচিব আব্দুল লতিফ নেজামীকে চেয়ারম্যান করে মুফতি ফয়জুল্লাহকে মহাসচিব হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। তাদের নেতৃত্বেই ২০১৫ সাল পর্যন্ত চলে জোটের কার্যক্রম। এরপর আবার ভাঙন দেখা দেয়। ২০১৬ সালের ৭ জানুয়ারি এই জোটটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক অংশের নেতৃত্বে থাকেন মাওলানা আবদুল লতীফ নেজামী এবং অপর অংশের নেতৃত্বে থাকেন নেজামে ইসলাম পার্টির চেয়ারম্যান এড. আবদুর রকীব।

https://nagorikpathagar.org

এভাবে দেখা যায়, ইসলামী ঐক্যজোট সময়ের ব্যবধানে বেশ কয়েক দফা ভাঙনের শিকার হয় এবং একটি জোট থেকে পরপর পাঁচটি জোট গঠিত হয়। এ জোটগুলো হলো :

ক. ইসলামী ঐক্যজোট (মাও. আজিজুল হক)। বর্তমানে এ জোটটি নিষ্ক্রিয়।

খ. ইসলামী ঐক্যজোট (মুফতি আমিনী)। বর্তমানে এ জোটটি দুটি ভাগে বিভক্ত।

খ.১. ইসলামী ঐক্যজোট (নেজামী)। মাওলানা আবদুল লতীফ নেজামীর পর বর্তমানে এর নেতৃত্বে আসেন মাওলানা আবুল হাসানাত আমিনী।

খ.২. ইসলামী ঐক্যজোট (এড. আবদুর রকীব)

গ. ইসলামী ঐক্যজোট (মুফতি ইজহার)। বর্তমানে এ জোটটি নিষ্ক্রিয়।

ঘ. ইসলামী ঐক্যজোট (মিসবাহুর রহমান)। বর্তমানে এ জোটটি নামেমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে।

তিন. সূফী ধারা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দেওবন্দী ধারাটি তাসাউফে বিশ্বাসী এবং এর একনিষ্ঠ অনুবর্তী। এ ধারার অনুসারীগণ নকশেবন্দিয়া, চিশতিয়া, কাদিরিয়া, সুহরাওয়ার্দিয়া প্রভৃতি তরীকার সাথে সম্পর্ক রাখেন। বাংলাদেশে কালক্রমে তাসাউফকেন্দ্রিক বহু মারকায গড়ে উঠেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক মারকাযের অনুসারীদের সাথে অন্য মারকাযের অনুসারীদের চিন্তা ও মনমানসিকতাগত কিছু দূরত্বও লক্ষ করা যায়। সংক্ষেপে তাদের কয়েকটি মারকাযের পরিচয় তুলে ধরা হলো–

১. চরমোনাই মারকায

বাংলাদেশে দেওবন্দী চিন্তাধারাকে ধারণ করে যতগুলো মারকায তাসাউফের কাজ করে যাচ্ছে, তন্মধ্যে চরমোনাই অন্যতম। যতটুকু জানা যায়, চরমোনাইতে সৈয়দ ইসহাক রহ.-এর আগে তাঁর মাতামহ আহসানুল্লাহ কাসেমী রহ.-এর আমল থেকেই খানকাহভিত্তিক মেহনত চলে আসছিল। সৈয়দ আহসানুল্লাহ কাসেমী রহ. ছিলেন বিখ্যাত দেওবন্দী আলিম ও উজানীর

https://nagorikpathagar.org

কারী ইবরাহীম রহ.-এর সর্বপ্রথম খলীফা। অবশ্য এই মারকাযে দ্বীনী মাদরাসা ও বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি প্রতিষ্ঠা করে তালীম ও তাযকিয়ার একটি নিয়মিত ধারা কায়েম করার কারণে সৈয়দ ইসহাক রহ.-কেই এ মারকাযের স্থপতিপুরুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

সৈয়দ ইসহাক রহ. প্রথমে ইলমে যাহেরী অর্জনের পর চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার শাইখ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর খলীফা উজানীর কারী ইবরাহীম রহ.-এর কাছে বাইআত গ্রহণ করেন এবং পরে এ তরীকায় খিলাফত লাভ করেন।

এরপরে তিনি নিজের এলাকায় ফিরে এসে খানকাহর মেহনত শুরু করেন এবং তাঁর হাতেই চরমোনাই মারকায প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭৩ সালে তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র সৈয়দ ফজলুল করীম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। বর্তমানে তাঁর পুত্র সৈয়দ রেজাউল করীম মারকাযের দায়িত্বে আছেন।

২. বাহাদুরপুর মারকায

এ মারকাযটি মাদারীপুরের শিবচরের বাহাদুরপুরে অবস্থিত। এ মারকাযের স্থপতি হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। বর্তমানে এ মারকাযের দায়িত্বে আছেন হাজী শরীয়তুল্লাহ রহ.-এর ৭ম পুরুষ বাংলাদেশ ফরায়েজী আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান, পীর সাহেব বাহাদুরপুর। তিনি হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির নায়েবে আমীর ছিলেন।

৩. উজানী পীরের মারকায, চাঁদপুর

এ মারকাযটি চাঁদপুরের কচুয়ায় অবস্থিত। এ মারকাযের স্থপতি হলেন রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর অন্যতম খলীফা কারী ইবরাহীম রহ.। চরমোনাইয়ের স্থপতি সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক রহ. তাঁর খেদমতে আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে তাঁর কাছ থেকেই তরীকার খিলাফত লাভ করেন। বর্তমানে এ মারকাযের পীর হলেন মুফতি ইহতেশামুল হক কাসেমী উজানী।

৪. নানুপুর মারকায, চট্টগ্রাম

এ দরবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শাহ সুলতান আহমদ নানুপুরী (১৯১৪-১৯৯৭ খ্রি.)। তিনি 'নানুপুরী হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন দেওবন্দী ঘরানার আলিম ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তিনি জামিয়া ইসলামিয়া

https://nagorikpathagar.org

ওবাইদিয়া নানুপুরের মহাপরিচালক ছিলেন। দেওবন্দ অধ্যয়নকালে তিনি সাত বছর হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর সান্নিধ্যে ছিলেন এবং ১৯৪৪ সালের ১৮ নভেম্বর তাঁর কাছে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেশ ভাগের পর শাইখ মাদানীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে পড়লে তিনি অন্য কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তির কাছে তাঁকে তাসাউফের শিক্ষা নিতে অনুমতি প্রদান করেন। তারপর তিনি আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আজিজুল হক রহ.-এর নিকট বাইআত গ্রহণ করেন ও খিলাফত লাভ করেন। তিনি ১৫ বছর তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন। তাঁর অনুসারীদের কাছে তিনি 'শাইখুল আরব ওয়াল আজম', 'ইমামুল আরিফীন', 'সুলতানুল আরিফীন', 'কুতুবে আলম', 'রাহবারে তরীকত', 'ওলিকূল শিরোমণি' ইত্যাদি নামে পরিচিত।

শাহ সুলতান আহমদ নানুপুরীর ইন্তিকালের পর তাঁর অন্যতম শিষ্য শাহ মাওলানা জমির উদ্দীন নানুপুরী (১৯৩৬-২০১১ খ্রি.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও একজন বিজ্ঞ আলিম ও প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে সুলতান আহমদ নানুপুরী রহ. ব্যতীত মুফতি আযীযুল হক, মুফতি আহমদ শফী ও কাতারের শাইখ ইউসুফ রেফায়ীও খিলাফত প্রদান করেন। গোটা বাংলাদেশে তাঁর অসংখ্য মুরিদ ও শিষ্য ছড়িয়ে আছে। চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সোনারগাঁসহ বিভিন্ন এলাকায় তিনি বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মুরিদগণ বিভিন্ন স্থানে ১১৩টি নতুন মাদরাসা তাঁর নামে (জমিরিয়া মাদরাসা) নামকরণ করেন। এ ছাড়া ৪০০ মাদরাসা ও হিফযখানা তাঁর পরামর্শে পরিচালিত হতো। তাঁর ইন্তিকালে পর তাঁর সন্তান মাওলানা সালাউদ্দীন নানুপুরী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

উপর্যুক্ত মারকাযগুলো ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিছু সূফী ধারাও দেওবন্দী আলিমগণের মধ্যে গড়ে ওঠে। নিম্নে তাঁদের এ ধরনের কয়েকজন বিশিষ্ট সূফীর নাম উল্লেখ করা হলো :

- ❖ মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (১৮৯৫-১৯৮৭ খ্রি.), প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন। তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর একজন বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন।

- ❖ মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৬-১৯৬৯ খ্রি.)। তিনি লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া কওমী মাদরাসাসহ গওহরডাঙ্গা কওমী মাদরাসা, ফরিদাবাদ কওমী মাদরাসা ও বড় কাটারা কওমী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি আশরাফ আলী থানবী রা.-এর কাছে আধ্যাত্মিক

https://nagorikpathagar.org

শিষ্যত্ব লাভ করেন। তিনি মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী ও মাওলানা আবদুল গনী রহ. প্রমুখ থেকেও খিলাফত লাভ করেন।

❖ মুফতি আজীজুল হক (১৯০৩-১৯৬১ খ্রি.), প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মুহতামিম আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া। তিনি আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর কাছে আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব লাভ করেন। তিনি শাহ জমীরুদ্দীন রহ.-এর একজন বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন।

❖ মুফতি আহমদ শফী (১৯১৬-২০২০ খ্রি.), মুহতামিম, হাটহাজারী মুঈনুল ইসলাম মাদরাসা, চট্টগ্রাম ও প্রতিষ্ঠাতা, হেফাজতে ইসলাম। তিনি সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর আধ্যাত্মিক শিষ্য ও তাঁর অন্যতম খলীফা ছিলেন।

চার. অরাজনৈতিক প্রতিবাদী উপধারা

দেওবন্দী আলিমদের মধ্যে বাংলাদেশে সম্প্রতি কয়েকটি অরাজনৈতিক প্রতিবাদী সংগঠনও গড়ে উঠেছে। এগুলো প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত নয়; তবে ধর্মীয় ও উম্মাহর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে এসব সংগঠন কথা বলে, প্রতিবাদ করে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ

'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ' বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাভিত্তিক একটি অরাজনৈতিক প্রতিবাদী সংগঠন। এটি ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি গঠিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো– দেশে ইসলামী শিক্ষা ও তাহযীব-তামাদ্দুনের সংরক্ষণ। হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক শাহ আহমদ শফী রহ. ছিলেন এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে এর আমীর হলেন মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী ও (ভারপ্রাপ্ত) মহাসচিব হলেন মাওলানা সাজেদুর রহমান।

এ সংগঠনটি ২০১০ সালে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির বিরোধিতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ২০১১ সালে এটি 'বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন নীতি (২০০৯)'-এর কয়েকটি ধারাকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক দাবি করে এর তীব্র বিরোধিতা করে। ২০১৩ সালে এটি ইসলাম ও রাসূল সা.-কে কটূক্তিকারী নাস্তিক ব্লগারদের ফাঁসি দাবি করে ব্যাপক আন্দোলন ও সমাবেশ শুরু করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এটি ১৩ দফা দাবি উত্থাপন করে।

https://nagorikpathagar.org

সমালোচকদের মতে, হেফাজতে ইসলাম কাগজে-কলমে অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন হলেও সংগঠনটির কর্মকাণ্ড জন্ম থেকে অদ্যাবধি অরাজনৈতিক ইস্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি।

মুফতি আহমদ শফীর ইন্তিকালের পরপর হেফাজত প্রকাশ্য দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন–

ক. এক ভাগ হলো জুনাইদ বাবুনগরীর অনুসারী এবং

খ. অপর ভাগটি নিজেদের আহমদ শফীর অনুসারী বলে দাবি করেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে জুনাইদ বাবুনগরীর অনুসারী নেতাদের একাংশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতায় যুক্ত আছেন বলে কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকেন। আবার অনেকেই সরকারের দলন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। ঠিক বিপরীত চিত্র আমির আল্লামা আহমদ শফীর অনুসারীদের। তারা জুনাইদ বাবুনগরীর অনুসারীদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করার পাশাপাশি ব্যস্ত নতুন সংগঠন গড়ে তুলতে। এ ভাগের নেতৃত্বে রয়েছেন মুফতি ফয়জুল্লাহ, আনাস মাদানী (মুফতি আহমদ শফীর পুত্র) ও মুঈনুদ্দীন রুহী প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, হেফাজতের সাথে দেশের সিংহভাগ ইসলামী দল ও আলিমগণ একাত্মতা পোষণ করলেও হেফাজতকে সমর্থন করেনি চরমোনাই পীরের অনুসারী আলিমগণ ও তাদের দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। বলতে গেলে শুরু থেকেই হেফাজতের সাথে তাদের বনিবনা হয়নি। তা ছাড়া মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ ও তাঁর অনুসারী কওমী আলিমরাও হেফাজতের এসব কর্মসূচি সমর্থন করেন না।

পাঁচ. পীরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক উপধারা

এটি বাংলাদেশে দেওবন্দীদের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপধারা। চরমোনাই পীরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সংগঠন 'ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ' এ উপধারার প্রতিনিধিত্ব করে। এ উপধারার প্রাণপুরুষ হলেন মাওলানা সৈয়দ ইসহাক রহ., পরবর্তীকালে তাঁর ছেলে সৈয়দ ফজলুল করীম রহ.। এ ধারার আলিমগণ তরীকতচর্চার সাথে সাথে রাজনীতিমুখীও। এ উপধারার অনুসারী আলিমগণ নিজেদের দেওবন্দী মতাদর্শের ধারক মনে করলেও অধিকাংশ দেওবন্দী আলিম

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু তাদের দেওবন্দের একনিষ্ঠ অনুসারীরূপে গণ্য করেন না। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্যও লক্ষ করা যায়। কওমী মাদরাসাভিত্তিক বৃহত্তর সংগঠন 'হেফাজতে ইসলাম'-এর মধ্যেও তাদের অংশীদারত্ব নেই।

ছয়. জিহাদী উপধারা

এ উপধারাটি দেওবন্দী ঘরানার আলিমদের একটি ক্ষুদ্রতম ধারা। এ উপধারাটি একসময় আফগানিস্তানের জিহাদ থেকে প্রেরণা লাভ করত। এ উপধারার অনুসারীগণ একসময় সংগঠিতও ছিল। তবে বর্তমানে তাদের কর্মকাণ্ড খুব একটা নজরে পড়ে না। বলতে গেলে এখন এ উপধারাটি প্রায় ম্রিয়মাণ। এ ধারার একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন হলো হরকাতুল জিহাদ।

হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ

'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ' আন্তর্জাতিক ইসলামিক জিহাদী গ্রুপের বাংলাদেশি শাখা। এটি বর্তমানে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ। বাংলাদেশে সংগঠনটির নামের সংক্ষিপ্ত রূপ 'হুজি-বি' নামেও এর পরিচিতি রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিশ্ব ইসলামী জিহাদ আন্দোলন 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী আল-আলামী' ১৯৮৪ সালে সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের বাংলাদেশি মুজাহিদদের দ্বারা ১৯৮৯ সালে 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যশোরের মনিরামপুরের মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী। কিন্তু ওই বছরই আফগানিস্তানের খোস্তে মাইন অপসারণের সময় মাওলানা ফারুকী নিহত হন। পরে ঢাকায় বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাবে ৩০ এপ্রিল, ১৯৯২ সালে হুজি বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। এ গোষ্ঠীর বাংলাদেশি শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা আবদুস সালাম। দলটি প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন সন্ত্রাসী হামলায় ১০০ জনেরও বেশি লোকের মৃত্যুতে এ দলকে দায়ী করা হয়। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা বিদ্রোহকে সমর্থন করার জন্য এই গ্রুপটি পরিচিতি পায়। এটি রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) এবং আরাকান রোহিঙ্গা জাতীয় সংস্থা (এআরএনও)-এর সাথেও সম্পর্কযুক্ত ছিল। মুফতি আবদুল হান্নান এ সংগঠনের সর্বশেষ নেতা ছিলেন। তাকে ১ অক্টোবর, ২০০৫ সালে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর এ গোষ্ঠীর কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে যায়।

https://nagorikpathagar.org

খ. সালাফী ধারার দল-উপদলসমূহ

দেশে-বিদেশে সালাফী ধারার আলিমদের মধ্যেও অসংখ্য উপধারা, দল-উপদল ও গ্রুপ রয়েছে। সালাফীদের এই বিভক্তি প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে ডা. জাকির নায়েক বলেন–

> "But even in Salafi there are various groups and if you go to U.K. Mashallah! Subhanallah! Allahu Akbar! There are so many groups. In U.K each group fighting against the other, calling the other Salafia kafir, Nauzubillah! ... Which salafia do you belong to?"[২১৪]

তিনি এক বক্তৃতায় সারা বিশ্বে সালাফীদের ১৬৪টি গ্রুপ থাকার কথা প্রকাশ করেন। সালাফীদের এ বিভক্তির নানাবিধ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই হলো তাকফীর, ওয়ালা-বারা, জিহাদ, খুরূজ প্রভৃতিবিষয়ক। অন্য আকীদাগত কারণ তেমন নেই বললেই চলে, ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু মতপার্থক্যও রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করেন, আবার তাদের কারও কারও বক্তব্য হলো– তারা নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসারী নন; তারা সহীহ হাদীসের একান্ত অনুসারী। নিম্নে আমরা প্রথমে সালাফীদের কতিপয় প্রধান প্রধান ধারার কথা উল্লেখ করব, অতঃপর সংক্ষেপে বাংলাদেশে তাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দল-উপদল ও গ্রুপের পরিচয় তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ।

ক. সালাফীদের প্রধান প্রধান ধারা

বর্তমানে সালাফীদের প্রধান চারটি ধারায় বিভক্ত করা যায় :

১. নাজদী সালাফী ধারা

এ ধারাটি আকীদা ও মানহাজের ক্ষেত্রে পুরোপুরি মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব আন-নাজদী রহ.-এর অনুসরণ করেন। এ ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– তারা যথাযথ তাকফিরের ওপর আমল করেন, শাসকদের বিদ্দার ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলেন। এ ধারাটি দুটি প্রধান উপধারায় বিভক্ত :

214. http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9n0

https://nagorikpathagar.org

১.১. তাকফীরী উপধারা

এ ধারার অনুসারীগণ যেসব শাসক শরীয়াহ আইনে দেশ পরিচালনা করেন না, তাদের কাফির বলে আখ্যায়িত করেন। তবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন না। তাদের দৃষ্টিতে, বর্তমান সময় জিহাদ করার জন্য উপযুক্ত নয় এবং পারিপার্শ্বিকতাও অনুকূল নয়। এ দলটি সাধারণত মুসলিম জনগণ ও তাদের ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের প্রতারণাপূর্ণ ফরেন পলিসি এবং মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর ভণ্ডামিপূর্ণ অবস্থানের সমালোচনা করে থাকেন। তারা সর্বদা 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' (আনুগত্য ও সম্পর্ক ছিন্নকরণ)-সংক্রান্ত আলাপে মুখর থাকেন। ফলে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত যেকোনো মুসলিম গ্রুপের পক্ষে এরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমর্থন দিয়ে থাকেন। তারা তাদের সমালোচকদের বিরুদ্ধে হরহামেশা নিফাক ও কুফরের অভিযোগ আরোপ করেন। আচার-আচরণ ও কঠোরতার দিক থেকে মাদখালীদের সাথে এই গ্রুপটির অনেক মিল রয়েছে। কিন্তু মুসলিম সরকার প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকায় তারা মাদখালীদের সম্পূর্ণ বিরোধী। সংখ্যায় স্বল্প হলেও পাশ্চাত্যে তাদের একনিষ্ঠ সমর্থক রয়েছে। এ গ্রুপের বেশির ভাগ সদস্য সরাসরি জিহাদ না করলেও তাদের লেখালিখি জিহাদী গ্রুপ তৈরির ভিত রচনা করে দেয়।

সৌদি আরবে এ উপধারার উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত আলিমই বর্তমানে আলে-সৌদের কারাগারে। যেমন– শাইখুল মুহাদ্দিস আল্লামা সুলাইমান আল-উলওয়ান, আলী আল-খুদাইর, নাসির আল-ফাহাদ প্রমুখ।

১.২. জিহাদী উপধারা

এ ধারার অনুসারীগণ তুলনামূলকভাবে অতি কঠোর। তারা যেসব মুসলিম শাসক শরীয়াহ আইনে দেশ পরিচালনা করেন না, তাদের কাফির বলে আখ্যায়িত করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদও ঘোষণা করেন। বিশেষ করে, বিশ্বের নির্যাতিত মুসলিমদের পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করাও এ ধারার অনুসারীদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আল-কায়েদা এবং আল-কায়েদা প্রভাবিত আরও কিছু সশস্ত্র সংগঠন এ ধারার অন্তর্ভুক্ত।

২. ইখওয়ানী বা সাহওয়াপন্থি সালাফী ধারা

এ ধারাটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব রহ.-এর সংস্কারবাদী চিন্তাধারা লালনের পাশাপাশি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের চিন্তাপদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত। এ ধারার অনুসারীগণ একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কার

https://nagorikpathagar.org

আন্দোলনের সমর্থক। সৌদি আরবে এ ধারার অনুসারীগণ সাহওয়াপন্থি[২১৫] সালাফী নামে পরিচিত। তাদের লক্ষ্য স্বভাবতই শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করা নয়; বরং একটি সামগ্রিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইতিবাচক পরিবর্তনই তাদের লক্ষ্য। এ ধারার অনুসারীগণ রাজনীতি-সচেতন এবং এরা সোশ্যাল মিডিয়ায় অত্যন্ত সক্রিয়। ফলে এরা তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের দাবিগুলো সহজে বুঝতে পারেন। মুসলিমদের বর্তমান সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধানে তাদের দৃশ্যমান সক্রিয় তৎপরতা থেকেই জানা যায়, মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে তারা সত্যিকার অর্থে ভাবেন। এ ধারাটিও আবার দুটি উপধারায় বিভক্ত :

২.১. আপসকামী উপধারা

এ উপধারার আলিমগণ সাধারণত আপসকামী হন। এরা প্রকাশ্যে শাসকদের সমালোচনা করে তাদের কোপানলে পড়তে চান না। তারা প্রায়ই শাসকদের সাথে আপস রক্ষা করে চলেন এবং পরামর্শের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে চান।

২.২. আপসহীন উপধারা

এ উপধারার আলিমগণ সাধারণত প্রতিবাদী হন। তারা শাসকদের অন্যায় কাজের সমালোচনা করেন। শাইখ সফর আল-হাওয়ালী, সালমান আল-আওদা, আয়েজ আল-কারনী প্রমুখ এ ধারার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। এদের বৃহদংশও এখন আলে-সৌদের কারাগারে।

---

২১৫. 'সাহওয়া' শব্দটির মানে হলো 'সক্রিয় তৎপরতা'। ৯০ দশকের প্রথম দিকে উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা এবং প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সৌদি সালাফীদের সক্রিয় রাজনৈতিক অবস্থান বোঝাতে মূলত এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সাহওয়াপন্থি আলিমগণ যুদ্ধ ও মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অবস্থান নিয়েছিলেন। অপরদিকে এ নিয়ে আরবের মূলধারার সালাফী আলিমদের মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়। সৌদি সালাফী গ্রুপগুলোর মধ্যে মাদখালীরা হলো সাহওয়াপন্থি আলিমদের বিরোধিতাকারী সর্বশেষ গ্রুপ। তারা সাহওয়াপন্থি আলিমদের সাইয়িদ কুতুব ও তাঁর ভাই মুহাম্মাদ কুতুবের রাজনৈতিক চিন্তার অনুগামী অভিহিত করে 'কুতুবপন্থি' বলে ট্যাগ দেয়। মুহাম্মাদ কুতুব ছিলেন সফর হাওয়ালীর থিসিসের সুপারভাইজার। কেউ কেউ শাইখ সফর হাওয়ালীকে সাহওয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মনে করে।

https://nagorikpathagar.org

৩. নির্বিবাদী সালাফী ধারা

এ ধারার অনুসারীগণ সাধারণত নির্বাবাদী ও শাসকগোষ্ঠীর প্রতি পূর্ণ অনুগত হন। বর্তমানে এ ধারাটি প্রধানত দুটি উপধারায় বিভক্ত :

৩.১. সৌদি সালাফী ধারা

বর্তমানে সালাফী গ্রুপগুলোর মধ্যে এটিই সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপদল। সৌদি ধর্মীয় নেতাদের অধিকাংশই এ ধারার। এ ঘরানার আলিমগণ সাধারণত (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) হাম্বলী মাযহাব অনুসরণ করে থাকেন। এরা নির্বিবাদী, শাসকগোষ্ঠীর প্রতি অনুগত। সৌদি আলিমদের প্রতিনিধিত্বশীল এ দলটি কাউকে 'কাফির' বলে ঘোষণা দেন না। তবে তারা জিহাদী গ্রুপগুলোর বিরোধিতা করে থাকেন; এমনকি তারা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনেরও কঠোর সমালোচক।

৩.২. মাদখালী উপধারা

মাদখালী উপধারাটি মূলত সৌদি সালাফীদের একটি ছোটো উপগ্রুপ। এরা সৌদি শাইখ রাবী ইবনু হাদী আল-মাদখালীর চিন্তাধারার অনুসারী। এরা সাধারণ সালাফী গ্রুপগুলোর চেয়ে অনেকটা ভিন্ন ধাঁচের। তাঁদের কার্যধারা অন্তর্গতভাবেই বিভেদমূলক। বলতে গেলে এ উপগ্রুপটির পূর্ণ মনোযোগ হলো– অন্যরা 'সঠিক' সালাফী লাইনে আছে কি নেই, তা যাচাই করা। কে সঠিক মানহাজে আছে বা নেই– এ বিতর্কে মাদখালীরা নিজেরাও দিনদিন বিভক্ত হয়ে পড়ছে। প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় মানুষের নিকট তাদের গুরুত্ব দিন দিন কমছে। অন্যদের খারিজ করার ব্যাপারে তাদের প্রান্তিক ও বেপরোয়া কথাবার্তা এবং সমাজে এসবের তেমন একটা প্রভাব না থাকাই তাদের গুরুত্বহীনতার প্রমাণ।[২১৬]

---

২১৬. মাদখালী ধারার সালাফী মতবাদের গুরুত্ব কমে যাওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন–

ক. তারা অত্যন্ত অসহিষ্ণু হিসেবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের এ পরিচিতি পুরো সালাফী আন্দোলনের এত বেশি ক্ষতিসাধন করেছে যে, অন্যান্য সালাফী ধারার অধিকাংশ নেতা (এমনকি মাদখালী ধারারও কোনো কোনো আলিম) বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ ধারার মধ্যে চরম প্রান্তিকতার সহজাত উপাদান রয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য যে, এ উপধারার অনুসারীগণ যদিও নিজেদের সালাফী বলে পরিচয় দেন, কিন্তু আদতে তাঁরা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের চিন্তাধারা অনেক ক্ষেত্রেই লালন করেন না। তাঁরা তাকফির, ওয়ালা-বারা, জিহাদ, খুরূজসহ আরও মৌলিক অনেক মাসআলায় নাজদী চিন্তাধারার অনুগামী নন।

৪. শাইখ আলবানীর জর্ডানী সালাফী ধারা

অনুসারী বিবেচনায় এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এরা কঠোরভাবে মাযহাববিরোধী এবং কেবল সহীহ হাদীসভিত্তিক ফিক্বহের সমর্থক ও প্রচারক। রাজনৈতিকভাবে এরাও একান্ত নির্বিবাদী। এরা শাসকগোষ্ঠী কিংবা জিহাদপন্থি সালাফীদের সতর্কতার সাথে এড়িয়ে চলেন; যদিও জিহাদীদের ব্যাপারে তাদের সমালোচনা সৌদি সালাফীদের মতো ততটা স্পষ্ট নয়। এ দলটিও ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে চরম অক্ষরবাদী (Literalist)। অক্ষরবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাঁরা বিদআত নির্ধারণ করেন; যদিও অন্য সালাফীগণ একে দোষণীয় মনে করেন না। যেমন– মসজিদের ভেতরে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া, কার্পেটের ওপর কাতারের চিহ্ন দেওয়া কিংবা মিম্বারে তিনটি ধাপের কমবেশি না হওয়া ইত্যাদি।

বাংলাদেশে সালাফীদের দল-উপদলসমূহ

সালাফীদের উপর্যুক্ত ধারাসমূহের স্পষ্ট প্রভাব বাংলাদেশের সালাফী আলিমদের ওপরও যে পড়েছে, তা বলাই বাহুল্য। এখন বাংলাদেশে সালাফীদের মধ্যে

খ. মাদখালী জনপ্রিয়তার হুজুগে পড়ে যারা তখন গা ভাসিয়েছিল, পরে তারা হয় এ গ্রুপ ত্যাগ করেছে, নয়তো সালাফিজম ত্যাগ করেছে। কেউ কেউ এমনকি ধর্মীয় প্র্যাকটিস থেকেই সরে গেছে। এ ঘটনা এত বেশি ঘটেছে যে, এ ধরনের লোকদের বোঝাতে 'সালাফী বার্নআউট' বলে একটা পরিভাষা চালু হয়ে গেছে।

গ. সরকারের কট্টর সমর্থক হওয়ার কারণে কিছু সময়ের জন্য (নব্বই দশকের শেষ থেকে শূন্য দশকের প্রথম পর্যন্ত) সৌদি সরকার মাদখালী মতবাদ প্রমোট করেছিল। কিন্তু এ মতবাদের নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব বেড়ে গেলে সরকার নিজেই মাদখালী ধর্মীয় নেতাদের ওপর থেকে কৌশলে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। তারপর সৌদি আরবের বাইরে এটি শুধু পাশ্চাত্যের মুসলিম সমাজে সক্রিয় থাকে। বিশেষ করে ধর্মান্তরিত কিংবা স্বল্প শিক্ষিত নন-প্র্যাকটিসিং অভিবাসী মুসলিমদের মধ্যে এটি সীমিত হয়ে পড়ে। এদের আচরণ দেখে মনে হয়, যেন তারা প্রসিদ্ধ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য হঠাৎ করে একটি অস্ত্র হাতে পেয়ে গেছে।

https://nagorikpathagar.org

কেউ নাজদী সালাফীর অনুসারী, কেউ ইখওয়ানী-সালাফীর অনুসারী, কেউ মাদখালী সালাফীর অনুসারী, কেউ নির্বিবাদী সৌদি সালাফীর অনুসারী, কেউ আলবানীর জর্ডানী সালাফী ধারার অনুসারী। কারও কারও গবেষণামতে, বাংলাদেশে আহলে হাদীস তথা সালাফীদের ১৯টির মতো উপদল রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশে সালাফীদের বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো :

১. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস' মূলত 'পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর বাংলাদেশ সংস্করণ। ১৯৫৩ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর গোড়াপত্তন হয় এবং এর প্রথম আমীর ছিলেন আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (১৯০০-১৯৬০), তাঁরপর আমীর হন ড. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল বারী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর নতুন নাম হয় 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস' এবং এর আমীর হিসেবে ড. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল বারী বহাল থাকেন। মূলত এটিই বাংলাদেশে আহলে হাদীসদের প্রাচীনতম সংগঠন এবং এতদঞ্চলে আহলে হাদীসের ভিত রচনা করে।

মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী কুরাইশী ছিলেন একজন উদারমনস্ক ব্যক্তি। তিনি নিজে আহলে হাদীস হলেও অপরের মতকে সম্মান করতেন এবং দলমত-নির্বিশেষে সকলের ঐক্য কামনা করতেন। তাঁর নেতৃত্বে জমঈয়ত একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলাদেশ আমলে নেতৃবৃন্দের মতানৈক্যের কারণে জমঈয়ত বারংবার ভাঙনের শিকার হয় এবং নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে এ মূল সংগঠনের সভাপতি হলেন প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ ফারুক ও মহাসচিব শহীদুল্লাহ খান মাদানী।

২. জামাআতে মুজাহেদীন বাংলাদেশ

এটি আহলে হাদীসদের একটি প্রাচীন সংগঠন। এর অনুসারীগণ নিজেদের সাইয়েদ আহমদ বেরলভি ও ইসমাঈল শহীদের জিহাদী সিলসিলার উত্তরাধিকারী দাবি করেন। দিনাজপুরের চিরির বন্দরের নান্দেড়াই দারুল হুদা আলিয়া মাদরাসা এই দলের কার্যালয় হিসেবে পরিচিত। তবে বর্তমানে এই দলটির উল্লেখযোগ্য কোনো সাংগঠনিক কার্যক্রম দেখা যায় না।

https://nagorikpathagar.org

৩. আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম

১৯৮৩ সালে কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাথে মতানৈক্যের জের ধরে মাওলানা মুনতাছির আহমদ খান রহমানী ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান প্রমুখ 'জমঈয়তে আহলে হাদীস' থেকে বের হয়ে 'আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম' গঠন করেন। এর সভাপতি হন মুনতাছির আহমাদ রাহমানী (১৯২৩-১৯৮৯)। পরবর্তীকালে আরও অনেক আলিম এই দলে যোগ দেন। ঢাকার বংশালে মালিবাগ মহল্লায় হাবীব মার্কেটের দোতলায় এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত। প্রধানত ঢাকার আহলে হাদীস মহল্লাগুলোতেই এর প্রভাব সীমিত। বর্তমানে এই সংগঠনটি দুটি উপদলে বিভক্ত। এক ভাগের আমীর হলেন মুফতি মুনিরুদ্দীন, অন্য ভাগের আমীর ড. মুজাফফর বিন মুহসিন।

৪. আহলে হাদীস আন্দোলন (গালিব)

১৯৯৪ সালে ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব 'জমঈয়তে আহলে হাদীস' থেকে বের হয়ে 'আহলে হাদীস আন্দোলন' প্রতিষ্ঠা করেন। এর আগে ১৯৭৮ সালে তিনি 'বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘ' গঠন করেন। এর কয়েক বছর পর থেকে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে নানা বিষয়ে তাঁর মতদ্বৈততা তৈরি হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৯ সালে জমঈয়ত এ যুবসংঘের সাথে তাদের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে এবং এর বিকল্প সংগঠন হিসেবে পৃথক 'জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস' গঠন করে। অবশেষে ১৯৯৪ সালে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী সম্মেলনে মুরব্বি সংগঠন হিসেবে 'আহলে হাদীস আন্দোলন' প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মূলনীতি হিসেবে পাঁচটি বিষয় স্থির করা হয়। এ পাঁচটি বিষয় হলো :

ক. কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা;

খ. তাকলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজার অপনোদন;

গ. ইজতিহাদ বা শরীয়ত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্তকরণ;

ঘ. সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে গ্রহণ;

ঙ. মুসলিম সংহতি দৃঢ়ীকরণ।

বর্তমানেও এর আমীর হলেন ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব। যতটুকু জানা যায়, এটি একটি সোশ্যাল মুভমেন্ট হলেও এর পলিটিক্যাল লক্ষ্যও রয়েছে। ২০০৬ সালে জোট সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এই দলটি 'ইনসাফ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং আসন্ন নির্বাচনে ন্যূনতম ৬০টি আসনে প্রার্থী

https://nagorikpathagar.org

দেওয়ার ঘোষণা দেয়। ১/১১-এর কারণে সেই নির্বাচন হয় ২০০৮-এ, যদিও তখন তারা আর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। একসময় দেশের তরুণ আহলে হাদীসপন্থিদের ভেতরে এই দলের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তাদের সেই জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারেনি এবং দলের মধ্যেও নানা ভাঙন তৈরি হয়।

৫. আহলে হাদীস আন্দোলন (আবদুর রাযযাক)

আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ ড. গালিবের দল ত্যাগ করে নারায়ণগঞ্জে 'আল-জামিয়া আস-সালাফিয়্যাহ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। তিনি আহলে হাদীসের একাংশের নেতৃত্ব দেন।

৬. বাংলাদেশ আহলে হাদীস জামা'আত

২০০৯ সালে আহলে হাদীস আন্দোলন থেকে কিছু লোক বের হয়ে 'আহলে হাদীস জামাআত' ও 'আহলে হাদীস ছাত্রমাজ' গঠন করেন। বর্তমানে 'আহলে হাদীস জামাআত'-এর আমীর হলেন আবদুস সামাদ সালাফী এবং নায়েবে আমীর হলেন ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন।

৭. জামায়াতে গুরাবায়ে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

১৮৯৫ সালে মাওলানা নাযীর হুসাইন ও আব্দুল্লাহ গযনভীর ছাত্র ও মুরিদ আব্দুল ওয়াহহাব মুহাদ্দেসে দেহলবী (১৮৬৬-১৯৩৩) কর্তৃক 'জামায়াতে গুরাবায়ে আহলে হাদীস' নামে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। আব্দুল ওয়াহহাব সাহেবকে 'ইমাম' ঘোষণা করে তার অধীনে ১২ জন আহলে হাদীস আলিম ও নেতা বাইআত গ্রহণ করেন। এদের 'ইমামতপন্থি' বা 'ইমারতপন্থি' আহলে হাদীসও বলা হয়।

তাদের মতে, ইসলামী হুকুমত থাকুক বা না থাকুক, মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা একজন 'ইমাম' বা 'আমির'-এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। উক্ত ইমাম শারঈ হুকুম-আহকাম, এমনকি হুদুদ ও কিসাসও জারি করতে পারবেন। ইমামহীন অবস্থায় কোনো মুসলিম মৃত্যুবরণ করলে সেটা 'জাহিলী হালত'-এ মৃত্যুবরণ বলে গণ্য হবে। আহলে হাদীসদের একটি বড়ো অংশ এই ইমামতপন্থিদের বিরোধিতা করেন। শেষমেশ এই 'জামায়াতে গুরাবা আহলে হাদীস' একটি আলাদা দলে পরিণত হয়।

https://nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য যে, আব্দুল ওয়াহহাব কর্তৃক ১৮৯৫ সালে গঠিত এই ইমামতপন্থি আহলে হাদীস দলের সমর্থনে স্বাক্ষর করা ৮৩ জন আলিমের ৪২ জনই ছিলেন বাঙালি। এদের মাধ্যমেই পরে বাংলাদেশে এর শাখা গঠিত হয়। দেশ ভাগের পর এই দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় দিল্লি থেকে করাচিতে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে আব্দুর রহমান সালাফী এই দলের পাকিস্তান অংশের আমীর এবং রংপুরের মাওলানা আব্দুল হামীদ এই জামায়াতের বাংলাদেশ অঞ্চলের আমীর হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়াও নিউইয়র্কের টেক্সাসেও এর একটি শাখা রয়েছে।

আধুনিক সালাফী ধারা ও গ্রুপগুলো

উপর্যুক্ত প্রধান দল-উপদলগুলো ব্যতীত বর্তমানে বাংলাদেশে আহলে হাদীসগণ বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলে বহু ধারা ও গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো গ্রুপে একাধিক সালাফী ধারার প্রভাবও বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে তাদের প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রুপের বিবরণ দেওয়া হলো :

১. মাদখালী গ্রুপ

বাংলাদেশে বর্তমানে এ গ্রুপটি অত্যন্ত সক্রিয়। এ গ্রুপের অনেকেই নব্য-সালাফী। আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়াহ, আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারা-এর ডিগ্রিধারী বাংলাদেশী মাদানী শাইখদের মধ্যে কেউ কেউ উপর্যুক্ত মাদখালী চিন্তা গ্রহণ করেন এবং তাঁদের দ্বারাই এতদঞ্চলে ক্রমে এ ধারা প্রসার লাভ করে। এ ধারার আলিমগণ একদিকে গণতন্ত্রের কড়া সমালোচক, অপরদিকে রাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক ও পরিপোষক। তারা বিশ্বের ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকামী আন্দোলনসমূহের বিরোধিতা ও সমালোচনা করেন।

২. আলবানী গ্রুপ

বাংলাদেশে এ গ্রুপটির সক্রিয় সমর্থক রয়েছে। তারা কঠোরভাবে মাযহাববিরোধী এবং কেবল সহীহ হাদীসভিত্তিক ফিকহের সমর্থক ও প্রচারক। রাজনৈতিকভাবে এরা একান্ত নির্বিবাদী। এরা সতর্কতার সাথে শাসকগোষ্ঠীদের এড়িয়ে চলেন এবং ইসলামী আন্দোলনসমূহের ব্যাপারে তাদের সমালোচনা মাদখালীদের মতো ততটা স্পষ্ট নয়। শিক্ষিত তরুণদের একাংশের মধ্যে এ গ্রুপের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

https://nagorikpathagar.org

৩. জামাআতী/সাহওয়াপন্থি সালাফী গ্রুপ

এ গ্রুপটি তুলনামূলক উদার মনোভাবাপন্ন ও সহনশীল। এ ধারার অনুসারী আলিমগণ আলবানী গ্রুপের মতো কঠোর মাযহাববিরোধী নন; বরং বিভিন্ন মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের সমর্থক। বাংলাদেশে ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীনকে সাহওয়াপন্থি সালাফীদের দিকপাল বলা যায়।

৪. সশস্ত্রবাদী গ্রুপ

এ গ্রুপটি সালাফীদের একটি প্রান্তিক গ্রুপ। বাংলাদেশে বর্তমানে এ গ্রুপের কার্যক্রম খুব একটা দেখা যায় না। একসময় জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) এ গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করত এবং এর নেতা ছিলেন সালাফী মতাদর্শের অনুসারী শাইখ আবদুর রহমান।

গ. বেরেলভী ধারার দল-উপদলসমূহ

বাংলাদেশে বেরেলভী ধারাও বহু দল-উপদল ও গ্রুপে বিভক্ত এবং তাদের প্রত্যেকটি দল অপর দলকে এবং প্রত্যেকটি গ্রুপ অপর গ্রুপকে নিয়মিত বিষোদ্‌গার করে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে ফাতওয়াও দেয়। তাদের এই বিভক্তির নানাবিধ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে কিছু আছে চিন্তানৈতিক, আর বেশির ভাগই হলো আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণ। ফিকহীগত কারণ তেমন নেই বললেই চলে। এ ধারার আলিমদের বিভাজনকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় :

এক. চিন্তানৈতিক বিভক্তি,

দুই. রাজনৈতিক বিভক্তি,

তিন. তাসাউফকেন্দ্রিক নানা দরবার ও খানকাহ।

এক. চিন্তানৈতিক বিভক্তি

১. আঞ্জুমান-ই-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া

এটি বাংলাদেশে বেরেলভী ধারার বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন। ১৯৫৪ সালে শাইখ সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (১৮৫৭-১৯৬১ খ্রি.) এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এর নাম ছিল আঞ্জুমান-এ-আহমদিয়া সুন্নিয়া।

https://nagorikpathagar.org

পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালে খাজা আবদুর রহমান চৌহরভীর নাম যুক্ত করে এর নামকরণ করা হয় আঞ্জুমান-ই-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া। এর প্রধান কার্যালয় হলো চট্টগ্রাম।

আঞ্জুমান-ই-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার প্রধান সহযোগী সংগঠন হলো গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ। ১৯৮৬ সালে সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ এ কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের অধীনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় দুই শতাধিক মাদরাসা ও বিভিন্ন খানকাহ পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধতম হলো চট্টগ্রাম ষোলশহরের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা। এ সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় রাসূলুল্লাহ সা.-এর শুভাগমনকে উপলক্ষ্য করে প্রতি বছর ঢাকায় ৯ রবিউল আউয়াল ও চট্টগ্রামে ১২ রবিউল আউয়াল বিশাল জুলুস (মিছিল) অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে আঞ্জুমানের সভাপতি হলেন সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ ও মহাসচিব হলেন মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন।

উল্লেখ্য যে, শাইখ সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি ছিলেন বেরেলভী মতাদর্শে একান্ত বিশ্বাসী এবং এর একনিষ্ঠ প্রচারক। বলতে গেলে তিনিই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আহমদ রেযা খান বেরেলভীর মাসলাককে পরিচিত করে তোলেন এবং তিনি জামেয়াকে এ মাসলাকের ভিত্তিতে পরিচালনার নির্দেশ দেন।

২. দাওয়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ

দাওয়াতে ইসলামী বেরেলভী ধারার একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর শাখা রয়েছে। ১৯৮১ সালে এটি আবূ বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদর দপ্তর হলো করাচি, পাকিস্তান। বাংলাদেশেও এর শাখা রয়েছে। এর অনুসারীদের ড্রেস কোড হলো সাদা পাঞ্জাবি, মাথায় সবুজ পাগড়ি ও গলায় খয়েরি চাদর।

৩. মিনহাজুল কুরআন, বাংলাদেশ

মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল বেরেলভী ধারার একটি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত পাকিস্তান আওয়ামী তাহরীকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ তাহির আল-কাদেরী। বাংলাদেশেও এর শাখা রয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

দুই. রাজনৈতিক বিভক্তি

১. বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট

বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট বেরেলভী মতাদর্শভিত্তিক একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল। এটি ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশে সুন্নী মতাদর্শভিত্তিক ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই এর লক্ষ্য। এর বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন এম. এ. মতিন এবং মহাসচিব হলেন স. উ. ম. আব্দুস সামাদ।

২. ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ

ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ বেরেলভী মতাদর্শভিত্তিক অপর একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল। 'বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট' ভেঙে এর উদ্ভব ঘটে। দলটির বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ মুজাদ্দিদী এবং মহাসচিব হলেন জয়নুল আবেদীন জুবাইর।

তিন. তাসাউফকেন্দ্রিক দরবার ও খানকাহ

বাংলাদেশে বেরেলভী মতাদর্শভিত্তিক নানা সূফী দরবার ও খানকাহ গড়ে উঠেছে। তন্মধ্যে 'খানকায়ে কাদেরিয়া আলিয়া, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি 'সিলসিলায়ে কাদেরিয়া আলিয়া'-এর অন্যতম শাইখ সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (১৮৫৭-১৯৬১ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ, অতঃপর সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ এ খানকাহর খলীফা হন। জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া এ খানকাহর প্রচার ও প্রসারের দায়িত্বে রয়েছে। প্রায় প্রত্যেক বছর রবিউল আউয়াল মাসে এখানে পাকিস্তানের সিরিকোট দরবার থেকে খলীফাগণ আসেন এবং তাঁদের হাতে বহু লোক বাইআত গ্রহণ করেন।

রাজধানী ঢাকাসহ আরও বিভিন্ন জায়গায় এ মতাদর্শ ও সিলসিলাভিত্তিক বহু দরবার ও খানকাহ রয়েছে।

ঘ. বাতিনী সূফী ধারার বিভিন্ন তরীকা-উপতরীকা

বাংলাদেশে বাতিনী সূফী ধারায় বিভিন্ন তরীকা-উপতরীকা প্রচলন লাভ করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তাদের মারকায ও খানকাহ গড়ে উঠেছে। তবে এ ধারার অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক মিলমিশের অভাব লক্ষণীয়। নানা চিন্তার ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ ধারার কয়েকটি প্রসিদ্ধ তরীকা হলো :

https://nagorikpathagar.org

১. মাইজভান্ডারী

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি নিবাসী বিখ্যাত সূফী শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী রহ.-এর হাতে এ তরীকার উদ্ভব ঘটে। এ তরীকার অনুসারীগণ ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ, হুলূল, ফানা, বাকা ও তাওহীদুল আদইয়ান প্রভৃতি বাতিনী চিন্তায় বিশ্বাস করেন। তারা আরও বিশ্বাস করেন যে, নুবুওয়াতের সমস্ত ধারা যেভাবে খাতামুন নাবিয়ীন মুহাম্মাদ সা.-এর পবিত্র সত্তায় কেন্দ্রীভূত হয়ে 'নুবুওয়াতে মুহাম্মাদী'-রূপে বিকশিত হয়েছিল, তেমনি বেলায়াতের সকল ধারাও খাতামুল ওয়ালাদ শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারীর সত্তায় কেন্দ্রীভূত হয়ে 'বেলায়াতে মোতলাকা-এ আহমদী'-রূপে প্রকাশ ও বিকাশ লাভ করে।

তাঁদের ধারণামতে, শাহ আহমদ উল্লাহ রহ. সকল ধর্মাবলম্বী ও তরীকতপন্থির স্ব-স্ব ধর্ম ও তরীকায় বহাল রেখে এবং নিজ বেলায়াতের ধারা অনুযায়ী আধ্যাত্মিক ফয়েয বিতরণে সমর্থ ছিলেন বিধায় তিনি অতীতের সকল ধর্ম ও তরীকার সমাবেশকারীরূপে সাব্যস্ত। তাঁর এ বেলায়াতে মোতলাকা বা বাধাহীন বেলায়াতী ধারাই 'মাইজভান্ডারী তরীকা' নামে খ্যাত।

২. দেওয়ানবাগী

বাংলাদেশে বাতিনী ধারার বর্তমানে বহুল আলোচিত-সমালোচিত একটি তরীকার নাম হলো 'দেওয়ানবাগী তরীকা'। এ তরীকার প্রবর্তক হলেন মাহবুব-ই-খোদা, যিনি সর্বস্তরে 'দেওয়ানবাগী' নামে পরিচিত। তিনি ফরিদপুরের চন্দ্রপাড়া দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী (মৃ. ১৯৮৪ খ্রি.)-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। পরে স্বীয় মুর্শিদের কন্যা হামিদা বেগমকে বিয়ে করেন। এ সুবাদে শ্বশুরের কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন। এর কিছুদিন পর তিনি নারায়ণগঞ্জের দেওয়ানবাগ নামক স্থানে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেকে 'সূফীসম্রাট' হিসেবে পরিচয় দিয়ে খ্যাতি লাভ করতে থাকেন। এরপর তিনি মতিঝিলের আরামবাগে 'বাবে রহমত' নামে আরেকটি দরবার স্থাপন করেন।

তাঁর বক্তব্যমতে, তিনি 'মোহাম্মাদী ইসলাম' প্রচারের জন্য নির্বাচিত ও আদিষ্ট হন। এ প্রসঙ্গে দেওয়ানবাগ দরবার থেকে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগী পত্রিকায়* উল্লেখ করা হয়–

https://nagorikpathagar.org

"দেওয়ানবাগী এবং তার মুরীদদের মাহফিলে স্বয়ং আল্লাহ্, সমস্ত নবী, রাসূল সা. ফেরেস্তা, দেওয়ানবাগী ও তাঁর মুর্শিদ চন্দ্রপাড়ার মৃত আবুল ফজলসহ সমস্ত ওলী-আউলিয়া এক বিশাল ময়দানে সমবেত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে দেওয়ানবাগীকে মোহাম্মাদী ইসলামের প্রচারক নির্বাচিত করা হয়। অতঃপর আল্লাহ্ সবাইকে নিয়ে এক মিছিল বের করেন। মোহাম্মাদী ইসলামের চারটি পতাকা চারজনের যথাক্রমে আল্লাহ্, রাসূল সা., দেওয়ানবাগী এবং তাঁর পীরের হাতে ছিল। আল্লাহ্, দেওয়ানবাগী ও তাঁর পীর প্রথম সারিতে ছিলেন। বাকিরা সবাই পিছনের সারিতে। আল্লাহ নিজেই স্লোগান দিয়েছিলেন, 'মোহাম্মাদী ইসলামের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো'।"[২১৭]

নিম্নে তাঁর কিছু আকীদা ও বাণী উল্লেখ করা হলো–

ক. স্বপ্ন ও কাশফের মাধ্যমে আল্লাহর দীদার লাভ করা সম্ভব। তাঁর মতে, শুধু তিনিই নন, তাঁর স্ত্রী-কন্যাসহ লক্ষ লক্ষ মুরীদও আল্লাহকে দেখেছেন।[২১৮]

খ. সকল ধর্মই সত্য এবং নাজাতের জন্য কেবল ইসলামী শরীয়তের প্রতি ঈমান রাখা আবশ্যক নয়। তাঁর মতে, যেকোনো ধর্মের লোক যদি তার নিজ নিজ ধর্মের ওপর অটল থেকে এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে, তাহলে নামধারী মুসলমানের চেয়েও সে উত্তম।[২১৯]

তিনি তাঁর এ কথার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন–

"আমি এক ভিন্ন ধর্মের লোককে ওযীফা ও আমল বাতলে দিলাম। কদিন পর ওই লোকটি স্বপ্নযোগে মাদীনায় গেল এবং নাবীজীর হাতে হাত মিলাল। এর ফলে সে তার সর্বাঙ্গে যিকর অনুভব করতে লাগল। তারপর থেকে ওই লোকটি প্রত্যেক কাজেই অন্তরে আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে থাকে।"[২২০]

---

২১৭. *সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগী পত্রিকা*, ১২.০৩.১৯৯

২১৮. *আল্লাহ কোন পথে?*, (ঢাকা : সূফী ফাউন্ডেশন, আরামবাগ), পৃ. ২৩

২১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

২২০. *মানতের নির্দেশিকা*, (ঢাকা : সূফী ফাউন্ডেশন, আরামবাগ), পৃ. ২৩

https://nagorikpathagar.org

গ. শরীয়তের দায়দায়িত্ব পালন থেকে মুক্তিলাভ। দেওয়ানবাগীর মতে, কোনো লোক যখন নফসীর মাকামে গিয়ে পৌঁছে, তখন তার আর কোনো ইবাদাত লাগে না।[২২১] তাঁর পীর ও শ্বশুর আবুল ফজল সুলতান আহমাদ (মৃ. ১৯৮৪ খ্রি.) লিখেছেন–

> "কোন লোক যখন মোকামে ছুদূর, নশোর, শামসী, নূরী, কুরবে মাকীনের মোকাম অতিক্রম করিয়া নফসীর মোকামে গিয়ে পৌঁছে, তখন তাঁহার কোনো ইবাদাত থাকে না। জজবার অবস্থায়ও কোনো লোক যখন ফানার শেষ দরজায় গিয়ে পৌঁছে, তখনও তাহার কোনো ইবাদাত থাকে না। এমনকি তখন ইবাদাত করিলে কুফরী হইবে।"[২২২]

ঘ. শরীরে আল্লাহ তাআলার অনুপ্রবেশ ও মিশ্রণ (হুলূল)। তাঁর মতে, মুমিন যখন সাধনা করতে করতে আল্লাহ তাআলার একেবারে নিকটে চলে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা তার শরীর ও রূহের সাথে এভাবে মিশে যান, যেরূপভাবে কারও ওপর জিন সওয়ার হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে তাঁর কথা হলো–

> "...আল্লাহ তাঁর বন্ধুর দেহ এবং আত্মার সাথে এমন নিবিড়ভাবে মিশে থাকেন, যার ফলে ওলী-আল্লাহগণের দেহ ও আত্মা সমানভাবে পবিত্র ও সম্মানিত হয়ে পড়ে।"[২২৩]

অন্যত্র তাঁর বক্তব্য এভাবে এসেছে–

> "...জিন মানুষের ওপর ভর করে তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। ...সে রকম আল্লাহ দয়া করে তাঁর বান্দার সাথে মিশে বান্দার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজের করে নেয়। ..."[২২৪]

ঙ. আল্লাহ তাআলার শরীরী রূপ ধারণ। এ প্রসঙ্গে তাঁর কথা হলো– "জিব্রাইল বলতে আর কেউ নন; স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই জিব্রাইল।"[২২৫]

---

২২১. *আল্লাহ কোন পথে?*, পৃ. ৯০

২২২. চন্দ্রপুরী, আবুল ফজল, *হাক্কুল ইয়াকীন*, ১৯৭৮, পৃ. ২৯

২২৩. *আল্লাহ কোন পথে?*, পৃ. ২৮

২২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

২২৫. *মাসিক আত্মার বাণী*, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ২১

https://nagorikpathagar.org

ছ. জন্মান্তর ও আল্লাহতে বিলীন হওয়া। এ প্রসঙ্গে '*আল্লাহ কোন পথে?*' বইতে লেখা হয়েছে–

> "... নেক আমলের দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করে আল্লাহতে বিলীন না হওয়া পর্যন্ত দেহ ধারণ করা আত্মার অত্যাবশ্যক। ...অনুরূপভাবে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মা দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার পর আত্মার মূল লক্ষ্য হচ্ছে পুনরায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা। এজন্য যথেষ্ট সাধনার প্রয়োজন হয়। এ সাধনার পথে কোনো বাহন আত্মার ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়লে পুনরায় নতুন বাহন ধারণ করে তাকে সাধনার পথে এগিয়ে যেতে হয়। পুনরুত্থানের প্রক্রিয়ায় সাধনার অগ্রগতি অনুযায়ী আত্মা উন্নত স্তরের বাহন লাভ করে থাকে। একইভাবে যার সাধনাবিহীন জীবন তার শাস্তিপ্রাপ্ত আত্মা পুনরুত্থানের মাধ্যমে নিকৃষ্ট বাহন লাভ করে অনন্তকাল ব্যাপী আযাব ভোগ করতে থাকে। ... এভাবেই মানুষ জীবন-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। আল্লাহতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত। ... আল্লাহতে বিলীন না হওয়া পর্যন্ত মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারবে না। আত্মার জন্য স্থূল দেহ বাহন স্বরূপ, বাহন ব্যতীত আত্মার উন্নতি অবনতি কিংবা শান্তি বা মুক্তি হওয়া সম্ভব নয়। মৃত্যুর ফলে আত্মা স্থানান্তরিত হয় এবং কর্ম অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়। কর্মানুযায়ী উন্নত ও অনুন্নত আত্মার বাহনে আরোহণ করে যে জীবন লাভ করে, তাকে পুনরুত্থান বলে। এভাবে মানুষের পুনরুত্থান হবে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। ..."[২২৬]

চ. পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম, মীযান, পুলসিরাত প্রভৃতি সম্পর্কে বিকৃত ধারণা।

দেওয়ানবাগী সাহেব জন্মান্তরবাদের উপর্যুক্ত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে হাশর-নাশর, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম প্রভৃতিরও এমন ব্যাখ্যা করেছেন, যা প্রকারান্তরে এতৎসংক্রান্ত কুরআন ও হাদীস থেকে সুপ্রমাণিত ও প্রচলিত ধারণা অস্বীকার করার নামান্তর।

জাহান্নাম প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

> "মানুষের দেহ স্থূল; কিন্তু আত্মা সূক্ষ্ম। সুতরাং জাগতিক কোনো আগুন দ্বারা সূক্ষ্ম আত্মাকে জ্বালানো সম্ভব নয়। মৃত্যুর পর মানুষের শরীর ধ্বংস হয়। উহাকে জাগতিক আগুন দিয়ে পোড়ানোর প্রশ্ন

---

২২৬. *আল্লাহ কোন পথে?*, পৃ. ৭৮

https://nagorikpathagar.org

অবান্তর। (কাজেই আসল কথা হলো,) আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আত্মা এক বিচ্ছেদ যাতনা ভোগ করতে থাকে। প্রভুর পরিচয় নিজের মাঝে না পাওয়া অবস্থায় মৃত্যু হলে সে বেঈমান হয়ে কবরে যাবে। তখন তার আত্মা এমন এক অবস্থায় আটকে পড়ে যে, পুনরায় আল্লাহর সাথে মিলনের পথ খুঁজে পায় না। আর তা আত্মার জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক। আত্মার এরূপ চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাকেই জাহান্নাম বা দোযখ বলা হয়।"[২২৭]

পুলসিরাত প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হলো– "মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হায়াতে জিন্দেগীকে পুলসিরাত বলা হয়।"[২২৮]

এ ধারার আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ তরীকা হলো– সুরেশ্বরী, এনায়েতপুরী, চন্দ্রপুরী, আটরশি, কুতুববাগী, রাজারবাগী, শাহতলী, ফুলেশ্বরী ও কাগতিয়া প্রভৃতি।

ঙ. শরীয়তনির্ভর সূফী ধারার[২২৯] বিভিন্ন তরীকা ও মারকায

বাংলাদেশে শরীয়তনির্ভর সূফী ধারায়ও বিভিন্ন তরীকা-উপতরীকা প্রচলন লাভ করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তাদের বহু মারকায ও খানকাহ গড়ে উঠেছে। তবে এ ধারার অনুসারীগণের মধ্যেও মিলমিশের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। নানা চিন্তা ও আমলের ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। এ ধারাটি আবার কয়েকটি প্রধান উপধারায় বিভক্ত। যেমন :

ঙ.১. দেওবন্দী উপধারা। ইতঃপূর্বে এ উপধারা সম্পর্কে আলোচনা এসেছে।

ঙ.২. বালাকোটি উপধারা। এ উপধারার প্রসিদ্ধ মারকাযগুলো হলো– ফুরফুরা, শর্ষিনা, জৌনপুর, ফুলতলী, সোনাকান্দা দারুল হুদা প্রভৃতি।

---

২২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩-৪৪

২২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

২২৯. এখানে 'শরীয়তনির্ভর সূফী ধারা' বলতে বোঝানো হয়েছে– এমন ধারা যার অনুবর্তীগণ বিশ্বাস করেন যে, শরীয়ত ও তরীকত দ্বীনের পরস্পর অবিচ্ছেদ্য দুটি অংশ। শরীয়ত হলো দ্বীনের বাহ্যিক অর্থাৎ কর্মমুখী ও ব্যাবহারিক রূপ আর তরীকত হলো আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অনুসৃত পথ। এ ধারার অনুসারী আলিমগণ তরীকতের নির্দিষ্ট আমলগুলোর পাশাপাশি শরীয়তের বিধিবিধান পালনের প্রতিও কমবেশি তাগাদা দেন।

https://nagorikpathagar.org

ঙ.৩. বেরেলভী উপধারা। ইতঃপূর্বে এ উপধারা সম্পর্কে আলোচনা এসেছে।

ঙ.৪. অন্যান্য উপধারা। যেমন– বাইতুশ শরফ, গারাংগিয়া দরবার প্রভৃতি।

তরীকতভিত্তিক সংগঠন

বাংলাদেশে তরীকতভিত্তিক নানা রাজনৈতিক সংগঠনও গড়ে উঠেছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন

'বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন' একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দল। এটি ২০০৫ সালে সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্তমানে তিনিই এ দলের নেতা।

২. জাকের পার্টি

'জাকের পার্টি' একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দল। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৮৯ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এর আগে ১৯৮৭ সালে 'জাকের সংগঠন' নামে এর যাত্রা শুরু হয়। আটরশির তৎকালীন পীর ফরিদপুরের বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে ১৯৮৯ সালে জাকের পার্টির ফলক উন্মোচন করেন। দলটির বর্তমান নেতা হলেন মোস্তফা আমীর ফয়সল মুজাদ্দেদী।

চ. মিশ্র ধারার দল-উপদলসমূহ

১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা বড়ো ধর্মীয় রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশে শরীয়াহভিত্তিক একটি ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এ দলের উদ্দেশ্য। এ দলের মূল প্রতিষ্ঠাতা হলেন সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.। তিনি ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট লাহোরের ইসলামিয়া পার্কে সামাজিক-রাজনৈতিক ইসলামী আন্দোলনের অংশ হিসেবে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' নামে দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর জামায়াতে ইসলামী মূলত ভারত ও পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের শাখা থেকে সৃষ্টি হয়। বর্তমানে এর আমীর হলেন ডা. শফিকুর রহমান ও মহাসচিব হলেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।

https://nagorikpathagar.org

দলটি শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার ও প্রশাসনের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনয়ন করার লক্ষ্যে জীবনের সব স্তরে প্রতিশ্রুতি রক্ষাশীল নেতৃত্ব গড়ার চেষ্টা করে। এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এর সদস্যদের ভোট দ্বারা নির্ধারিত হয়, যাঁরা নেতৃবৃন্দের সততা, দক্ষতা ও সাংগঠনিক বিচক্ষণতার দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁদের ভোট দেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এ দলটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো– এটি মিশ্র ধারার প্রতিনিধিত্বকারী একক ইসলামী দল। এখানে কমবেশি বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও মাযহাবের আলিমগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ রয়েছেন। তবে কমন কিছু বিষয়ে তাঁদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐকমত্য রয়েছে। তাঁদের মধ্যকার মিলমিশ ও পারস্পরিক সম্পর্কও সুগভীর। বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে এ দলটির একটি অনুপম কৃতিত্ব হলো– এটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ দলের আলিমগণের মধ্যে বড়ো ধরনের কোনো ভাঙন বা বিভক্তি দেখা দেয়নি। কখনও কোনো চিন্তা-বিশ্বাস কিংবা কার্য বা কৌশলগত মতপার্থক্য অথবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে কোথাও কোনো আলিম বা আলিমদের কোনো গ্রুপ এ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তাঁরা নতুন কোনো শক্তিশালী দল বা উপদল গড়ে তোলেননি বা গড়ে তুলতে সমর্থ হননি।

২. ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল)

'ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ' (সংক্ষেপে আইডিএল) বাংলাদেশের একসময়ের একটি প্রসিদ্ধ ইসলামী রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম ছিল। ১৯৭১ সালের পর ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হলে জামায়াতে ইসলামীও এর আওতায় পড়ে। পরে ১৯৭৬ সালের আগস্টে জিয়াউর রহমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত রাজনৈতিক দল অধ্যাদেশের ফলে ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠনে বাধা উঠে যায়। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আমীর ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহীম। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর মাওলানা আবদুর রহীম 'জামায়াতে ইসলামী' নামে কোনো সংগঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তখন তিনি এবং মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ১৯৭৬ সালের ২৪ আগস্ট ডেমোক্রেটিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) নামে একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম গড়ে তোলেন। পরে অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশে ফিরে এলে ১৯৭৯ সালের মে মাসে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' গঠিত হয়। কিন্তু এ সময় নানা কৌশলগত বিষয়ে মাওলানা আবদুর রহীমের সাথে জামায়াতে ইসলামীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মতপার্থক্য তৈরি হয়। ফলে তিনি জামায়াত থেকে বিদায় নেন এবং আইডিএল-এর প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দেন।

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু এ দলটি বেশিদূর এগোতে পারেনি। ১৯৮৪ সালে এসে এ দলটি ভেঙে যায়। বর্তমানে এ দলের কোনো কার্যক্রম দৃশ্যমান নেই।

ছ. জিহাদী ধারার দল-উপদলসমূহ

বাংলাদেশে নানা সময় জিহাদী ধারার কিছু দল ও গ্রুপ গড়ে উঠেছে। যদিও সময়ে সময়ে এ দল ও গ্রুপগুলোর কিছু কার্যক্রম নজরে পড়ে; কিন্তু তা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী ও সুপরিকল্পিত বলে মনে হয় না। এ দল ও গ্রুপগুলো কখনোই বাংলাদেশে শক্ত ভিত তৈরি করতে এবং জনগণের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়নি। তা ছাড়া সরকারের কঠোর পদক্ষেপের কারণে এগুলো প্রায়ই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এ ধারার দলগুলোকে প্রধান কয়েকটি উপধারায় ভাগ করা যায়। যেমন–

ছ.১. সালাফী উপধারা

এ উপধারার উল্লেখযোগ্য দল হলো জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ছ.২. দেওবন্দী উপধারা

এ উপধারার উল্লেখযোগ্য দল হলো হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ (হুজিবি)। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া অনেকেই আনসার-আল-ইসলামকেও এ উপধারার একটি গ্রুপ মনে করে থাকে।

ছ.৩. অন্যান্য উপধারা

বাংলাদেশে এমন কিছু দলও রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে সাধারণত মনে করা হয় যে, এগুলো জিহাদী বা বিপ্লবী ধারায় উদ্‌বুদ্ধ এবং এগুলোর বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে সন্ত্রাসের নানা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে 'হিযবুত তাহরীর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে এ দলের অনুসারীদের অধিকাংশই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সালাফী চিন্তাধারায় প্রভাবিত।

হিযবুত তাহরীর

'হিযবুত তাহরীর' একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল, যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফিলিস্তিনের জেরুজালেমের শরীয়াহ আদালতের বিচারপতি শাইখ তাকিউদ্দীন আন-নাবহানী হলেন এ দলের মূল প্রতিষ্ঠাতা।

https://nagorikpathagar.org

তিনি ১৯৫৩ সালে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে খিলাফতব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ দলের গোড়াপত্তন করেন। এ দলটি মনে করে, মুসলিম বিশ্বের সকল সমস্যার মূলে রয়েছে উম্মাহর মধ্যে খিলাফতব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং খিলাফতব্যবস্থাই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও শক্তির প্রতীক।

হিযবুত তাহরীর প্রতিষ্ঠার পর মধ্যপ্রাচ্য থেকে এ দল ধীরে ধীরে আফ্রিকা, ইউরোপ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ২০০১ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ দলটি তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

এ দলের অনুসারীদের ভাষ্যমতে, তারা খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোনো ধরনের সশস্ত্রপন্থায় বিশ্বাস করে না; বরং তারা একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিতেই কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বিশ্বাসী। তারা মনে করে, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর মাক্কী জীবনে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ঠিক সে কর্মপদ্ধতিতেই আবার খিলাফতব্যবস্থা ফিরে আসবে এবং এটাই এ কাজের ক্ষেত্রে একমাত্র সঠিক কর্মপদ্ধতি। কিন্তু দলটির নানা কার্যক্রম বিভিন্ন দেশে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে এবং তাকে একটি সন্ত্রাসী দল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে হিযবুত তাহরীরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আলিমগণের অনৈক্যের কারণসমূহ

এখন প্রশ্ন হলো– আলিমদের ঐক্য কেন নষ্ট হচ্ছে? তাঁদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভক্তি কেন ক্রমশ বেড়েই চলছে এবং এর নেপথ্যে কারণ কী? আমরা ১ম অধ্যায়ে ইফতিরাকের কারণসংক্রান্ত আলোচনায় এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। এখানে আমরা আলিমদের অনৈক্যের জন্য সংক্ষেপে আরও চারটি কারণ ব্যাখ্যা করব। এ চারটি কারণ হলো :

১. যালিম শাসকবর্গের ষড়যন্ত্র;

২. ভুল বোঝাবুঝি কিংবা দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য;

৩. প্রবৃত্তির অনুসরণ;

৪. 'ফিকহুল খিলাফ ওয়াল জামাআত' সম্পর্কে অসচেতনতা

https://nagorikpathagar.org

১. যালিম শাসকবর্গের ষড়যন্ত্র

উম্মতের আলিমদের ঐক্য নষ্টের জন্য বাহির থেকে একদল লোক সব সময় ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কাফির ও মুনাফিকরা দেশে-বিদেশে ইসলামী শক্তিকে দুর্বল ও ধ্বংস করতে উম্মতের বিরুদ্ধে নিরন্তর নানারূপ ষড়যন্ত্র করে থাকে। অনুরূপভাবে মুসলিম দেশগুলোতে যালিম শাসকরাও তাদের অন্যায়-অবিচারকে স্থায়ী করতে আলিমদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করে থাকে। তারা সব সময় আলিমদের বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়। তারা আলিমদের একতার শক্তি সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত। তারা জানে, আলিমদের ঐক্যের ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করে জাতির বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি। আর যখনই জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত হবে, তখন তাদের অন্যায়-অবিচারের সমূহ পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। কাজেই আলিমগণ যে পরিমাণ পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের প্রতি যত্নশীল হবেন, জাতিও সাংগঠনিক দিক থেকে ততটুকু সুসংহত হবে। এ অবস্থায় যে কেউ চাইলে সহজেই অন্যায়-অবিচার করতে পারবে না, দমন-পীড়ন চালাতে পারবে না। এ কারণে আলিমদের ভেতরে বিভেদ তৈরি করার জন্য শাসকবর্গ ও তাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সব সময় কৌশলে কাজ করে থাকে। সেটা কিছু আলিমকে ভাড়া করেও হতে পারে, অনলাইনে ও অফলাইনে নানা ধরনের ফাঁদ পেতেও হতে পারে। নিম্নে তাদের ষড়যন্ত্রের কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হলো :

- কিছু স্বার্থান্বেষী আলিমকে অর্থ বা পদের বিনিময়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা।
- কিছু প্রভাবশালী আলিমকে উদ্দেশ্যমূলক হাদিয়া-তুহফা প্রদান করা এবং এভাবে তাদের মনোবল নষ্ট করা।
- কিছু আলিমকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা এবং দুর্বল করে রাখা।
- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ও অর্থায়নে কিছু বিকৃত চিন্তার আলিম তৈরি করা এবং তাদেরকে নিজেদের এজেন্টরূপে ব্যবহার করা।
- আলিমদের বিভেদের মধ্যে জড়িয়ে রাখা এবং এক গ্রুপকে প্রশ্রয় দিয়ে অন্য গ্রুপকে ধ্বংস বা দুর্বল করার তদবীর করা।
- পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করতে উৎসাহিত করা এবং এজন্য পর্দার অন্তরাল থেকে দলগুলোকে ইন্ধন দেওয়া।

https://nagorikpathagar.org

প্রত্যেক যুগেই কমবেশি এরূপ অনেক আলিমের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়– যারা যালিম শাসকদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে এবং বুঝে হোক বা না বুঝে দ্বীন ও মিল্লাতের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এ জাতীয় আলিমরা প্রায়ই শাসকদের পেছনে পেছনে ঘোরাঘুরি করে, তাদের তোষামোদ ও লেজুড়বৃত্তি করে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। যখন শাসকরা নানা অন্যায়-অবিচার করে, তখন তারা তাদের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলে না, প্রতিবাদ করে না; বরং অনেক সময় তাদের এ অন্যায়-অবিচারের পক্ষাবলম্বন করে এবং নানা যুক্তি প্রদর্শন করে। এসবের পেছনে তাদের একান্ত উদ্দেশ্য থাকে, শাসকদের কাছে একটি অবস্থান বা পদ-পদবি লাভ করা কিংবা হাদিয়া-উপঢৌকন অর্জন করা। প্রায় সকল যুগে এ জাতীয় আলিমদের 'চাটুকার আলিম', 'তোষামুদে আলিম', 'মোসাহেব' (عالم مداهن) বা 'দরবারী আলিম' (عالم القصر) বলা হয়।

পক্ষান্তরে আমরা প্রত্যেক যুগে সত্যনিষ্ঠ আলিমে রব্বানীদের শাসকবর্গ থেকে যোজন যোজন দূরে থাকতে দেখি। তাঁরা যথাসম্ভব তাদের হাদিয়া-তুহফা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করতেন। বিভিন্ন হাদীসে এবং সালাফে সালিহীনের নানা বক্তব্যের মধ্যে শাসকবর্গের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও তাদের সামীপ্য অর্জনকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء .

"আর আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত কারীদের (অর্থাৎ আলিমদের) মধ্যে একটি শ্রেণি হলো, যারা (সান্নিধ্য ও কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে) আমীর-শাসকদের কাছে আনাগোনা করে।"[২৩০]

বর্ণিত আছে, প্রথম প্রথম সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. শাসকবর্গের নিকট যাতায়াত করতেন। পরে তাদের কাছে আনাগোনা ছেড়ে দেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, لو أتيتهم فلعلهم يجدون في أنفسهم-"যদি আপনি তাদের কাছে যান, তবে হয়তো তারা প্রভাবান্বিত হতো।" আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. জবাব দেন–

---

২৩০. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইলম, হা. নং : ২৩/২৫৬; শাইখ আলবানী রহ.-এর গবেষণামতে, হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে দুর্বল।

https://nagorikpathagar.org

أرهب إن تكلمت أن يروا أن الذي بي غير الذي بي وان سكت رهبت أن آثم

"আমি ভয় করি যে, যদি আমি কথা বলি, তবে তারা আমার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা করবে। আর যদি চুপ থাকি, তবে আমি পাপী হওয়ার আশঙ্কা বোধ করি।"[২৩১]

ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. বলেন– ফকীহদের জন্য ইবলীসের একটি চক্রান্ত হলো, শাসকবর্গের সাথে সংশ্রব, তাদের চাটুকারিতা, শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা। অনেক সময় তারা শাসক ও রাজা-বাদশাহদের এমন অনেক কাজেরও সুযোগ বা অনুমোদন দেয়, যেসব কাজের আসলেই তাদের জন্য সুযোগ বা অনুমোদন নেই। এরূপ পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের একান্ত উদ্দেশ্য থাকে দুনিয়ার কিছু স্বার্থ উদ্ধার করা। এ পথে তিনভাবে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয় :

এক. নেতারা বলবে– যদি আমি সঠিক পথে না থাকি, তবে ফকীহরা তো আমাদের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতেন। আর আমি কীভাবে সত্যের ওপর অধিষ্ঠিত হব না, তারা তো আমার সম্পদ থেকেই ভক্ষণ করে।

দুই. সাধারণ জনগণ বলবে যে, এই নেতা ও রাজা-বাদশাহ এবং তাদের সম্পদ ও কার্যকলাপের মধ্যে কোনো দোষ নেই। কারণ, অমুক অমুক ফকীহ তো সারাক্ষণ তাদের কাছেই অবস্থান করে।

তিন. ফকীহরা এভাবেই দ্বীনকে নষ্ট করে দেয়। ...

এ জাতীয় আলিমদের একটি স্বভাব হলো– তারা সমাজের অন্যায়, অনাচার ও অধর্মের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে না। এ কারণে তারা প্রায়শই শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা পেয়ে থাকে। আর শাসকরাও নিজেদের স্বার্থে তাদের ব্যবহার করে। এ সুযোগে এ আলিমরা শাসকদের কাছে প্রতিপক্ষ আলিমদের সমালোচনা করে, তাদের ভুলত্রুটিগুলো তুলে ধরে। এভাবে তারা প্রতিপক্ষ আলিমদেরকে শাসকদের সহযোগিতায় দমনের চেষ্টা করে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে প্রয়াস পায়।

---

২৩১. গাযালী, *ইহয়া*.., খ. ২, পৃ. ৩১১

https://nagorikpathagar.org

মোটকথা, ক্ষমতাবান ও শাসকদের কাছে আলিমদের আনাগোনা একটি বড়ো বিপজ্জনক বিষয়। কারণ, প্রথম যোগাযোগের সময় হয়তো নিয়ত ভালোই থাকে; কিন্তু এরপর তাদের সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদানের কারণে অথবা তাদের প্রতি লোভ-লালসা তৈরি হওয়ার কারণে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে এবং তারা তাদের চাটুকারিতা থেকে নিজেদের সংবরণ করতে পারে না; উপরন্তু সে তাদের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা ছেড়ে দেয়।[২৩২]

সুফইয়ান আস-সাওরী রহ. বলতেন–

ما أخاف من إهانتهم لي إنما أخاف من إكرامهم فيميل قلبي إليهم .

"তারা আমাকে অপমানিত করবে– এ আশঙ্কা আমি বোধ করছি না। বরং আমি এ আশঙ্কা বোধ করছি যে, তারা আমাকে সম্মান করবে। ফলে আমার অন্তর তাদের দিকে ঝুঁকে পড়বে।"[২৩৩]

ইবনুল জাওযী রহ. আরও বলেন–

"যখন কোনো আমীর কিংবা বাদশাহ থেকে কোনোরূপ যুলম প্রকাশ পেত, তখন আমাদের সালাফে সালিহীন তাদের থেকে দূরে সরে যেতেন। কিন্তু আমীর ও রাজা-বাদশাহরা বরারবই ফাতওয়া ও নানা কারণে তাদের প্রয়োজন অনুভব করত এবং দরবারে তাদের তলব করত। ফলে কালক্রমে আলিমদের মধ্যে দুনিয়াপূজারি একটি দল গড়ে ওঠে, যারা দুনিয়াবী স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে তাদের কার্যকলাপের পক্ষে নিয়মিত সাফাই গায় এবং যুক্তি প্রদর্শন করে।"[২৩৪]

২. ভুল বোঝাবুঝি কিংবা দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য

আলিমদের মধ্যকার অনৈক্যের অপর একটি প্রধান কারণ হলো– দ্বীনের শাখাগত বিষয়সমূহে কুরআন ও হাদীসের নানা বক্তব্য নিয়ে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক মতপার্থক্য ও ভুল বোঝাবুঝি।

---

২৩২. ইবনুল জাওযী, *তালবীসু ইবলীস*, পৃ. ১০৯-১১০

২৩৩. ইবনুল জাওযী, *তালবীসু ইবলীস*, পৃ. ১১০; ইবনু নায়িফ, *আল-মুফাসসাল ফী ফিকহিদ দাওয়াত...*, খ. ১৫, পৃ. ১৭৪

২৩৪. ইবনুল জাওযী, *তালবীসু ইবলীস*, পৃ. ১০৯-১১০

https://nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য যে, কখনও কুরআন-হাদীসের দ্ব্যর্থক কিংবা অস্পষ্ট কোনো বক্তব্যের মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়। আবার কখনও কখনও শারঈ দলীলসমূহের বাহ্যিক ভিন্নতা কিংবা প্রামাণিকতার ধরনের ভিন্নতায়ও আলিমদের মধ্যে মতভিন্নতা তৈরি হয়। আবার কখনও ভুল বোঝাবুঝির কারণেও এ মতপার্থক্য হতে পারে।[২৩৫] হানাফী, শাফিয়ী, হাম্বলী, মালিকী ও আহলে যাহির প্রভৃতি গোষ্ঠীর পরস্পর মতানৈক্য এ প্রকৃতির। বর্তমানে মাযহাবী-লামাযহাবী (সালাফী)দের মতানৈক্যগুলোও প্রায়ই এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এসব মতানৈক্য উম্মাহর বৃহৎ ঐক্যের অন্তরায় নয়।

একটি সংশয়ের অপনোদন

কিছু সালাফী মতাবলম্বী ভাই বলে থাকেন, চার মাযহাব মুসলমানদের চারটি বৃহৎ দলে বিভক্ত করে রেখেছে। মাযহাব না থাকলে সবাই এক প্ল্যাটফরমে থাকত। মুসলিম উম্মাহ নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হলে নানা মাযহাব ছেড়ে সালাফী হওয়ার বিকল্প নেই। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। বিজ্ঞ আলিমগণ মনে করেন, ইসলামে ঐক্য বলতে সকল আমলগত পদ্ধতির একতাকে বোঝায় না। শাখাগত আমলসমূহের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ভিন্নতা সাহাবী-তাবিঈর যুগ থেকে স্বীকৃত। এসব কখনও তাদের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করেনি। দ্বীন ও মিল্লাতের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে কেবল মৌলিক আকীদা, মৌলিক আমল ও সাংবিধানিক একতাই যথেষ্ট। এ কারণে সালাফে সালিহীন এ ব্যাপারে একমত যে, ফিকহী মাযহাবের ভিন্নতা ঐক্য নষ্টের উপলক্ষ্য নয়। সাহাবা কিরামের যুগেও ফিকহের নানা মাযহাব ছিল। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী ও ইবনুল বারা রহ.-এর বক্তব্যগুলো প্রণিধানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন–

لم يكن أحد من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس كان لكل واحد .

"রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীদের মধ্যে এমন তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন– যাদের প্রত্যেকেরই কিছু একান্ত অনুসারী ছিল, যারা ফিকহের

---

২৩৫. আমি আমার *তুলনামূলক ফিকহ* ১ম খণ্ড-এ ফকীহগণের মধ্যে মতভেদের কারণ ও উপলক্ষ্যসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

https://nagorikpathagar.org

ক্ষেত্রে তাঁদের নিজ নিজ অনুসৃত ব্যক্তির কথা অনুসরণ করত, কার্যকর করত। সেই তিনজন সাহাবী হলেন– আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, যায়দ ইবনু সাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.।"[২৩৬]

ইবনুল বারা রহ. বলেন–

لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقوله ويفتون الناس .

"এ তিনজনের মধ্যে প্রত্যেক জন্যের এমন কিছু অনুসারী ছিল, যারা তাঁদের নিজ নিজ অনুসৃত ব্যক্তির কথা মেনে চলত এবং তাঁর মতানুযায়ী লোকদের ফাতওয়া দিত।"[২৩৭]

অনেক বিজ্ঞ আলিম তো আরও মনে করেন যে, চার মাযহাব কর্তৃক প্রণীত উসূলের গণ্ডির ভেতরে থেকে ফিকহী বিতর্কের বিষয়টি মন্দ হয়নি; বরং একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। কারণ, প্রাথমিক যুগে উদ্ভূত চারটি প্ল্যাটফরমের ভেতরে না থেকে প্রত্যেক আলিম যদি নিজে উসূল তৈরি করে ইজতিহাদী মাসআলা ইস্তিম্বাত (বের) করতে থাকতেন, তাহলে যুগে যুগে ফিকহী বিতর্কের ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যাটফরম তৈরি হতে থাকত। তখন চারটি নয়; বরং হাজারটি মাযহাব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। তার একটি ছোট্ট প্রমাণ হলো– সালাফী ভাইদের দাবিমতো, তাদের নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব নেই। তারা মুসলিমদের এক প্ল্যাটফরমে আনতে মাযহাবী বিভক্তি ছেড়ে একত্র হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আহলে হাদীস শাইখগণ সকল মাসআলা বা চিন্তাভাবনায় এক হতে পারেননি। বিভক্তিতে তারা এবং তাদের অনুসারীরাও নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি :

ক. প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস আলিম সাইয়িদ সাবিক রহ.-এর *ফিকহুস সুন্নাহ* নামক কিতাবটি শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ.-এর সামনে এলে এর অনেক বিষয় তাঁর কাছে অস্বাভাবিক মনে হলো। এ কারণে তিনি এর ওপর টীকা লেখার প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং *তামামুল মিন্নাহ ফিত তালীকি আলা ফিকহিস সুন্নাহ* নামে তা লিখা শুরু করলেন। তিনি এর ভূমিকায় সাইয়িদ

---

২৩৬. ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ. ১৯, পৃ. ৩২৭; নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ৩৮৭

২৩৭. ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ. ১৯, পৃ. ৩২৭

https://nagorikpathagar.org

সাবিকের ভুলত্রুটির প্রকার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত সূচি উল্লেখ করেছেন, যাতে চৌদ্দটি প্রকার রয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

- সাইয়িদ সাবিক অসংখ্য যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে নীরব থেকেছেন।
- অন্যদিকে অনেক মারাত্মক যয়ীফ হাদীসকে শক্তিশালী বলেছেন।
- কিছু হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন, অথচ তা সহীহ অথবা এ হাদীসগুলো অন্য অনেক বিশুদ্ধ সনদেও বর্ণিত রয়েছে।
- সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতিতে কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন, অথচ ওই দুই কিতাবেই সে হাদীসগুলো নেই।
- কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা হাদীসের কোনো কিতাবেই নেই।
- কোনোরূপ মন্তব্য ছাড়াই কোনো কিতাবের উদ্ধৃতিতে কোনো হাদীস উল্লেখ করেছেন, অথচ খোদ ওই কিতাবের লেখকই তাতে হাদীসটি সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেছেন, যা তার সহীহ হওয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
- কখনও কখনও দলীল ছাড়া মাসআলা উল্লেখ করেছেন; কখনও কিয়াসের ভিত্তিতে মাসআলা প্রমাণ করেছেন, অথচ সে বিষয়ে সহীহ হাদীস বিদ্যমান; আবার কখনও ব্যাপকতাজ্ঞাপক দলীল উল্লেখ করেছেন, অথচ সেই মাসআলার সুনির্দিষ্ট দলীল রয়েছে।
- কখনও কখনও এমন মত বা সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যার প্রমাণ দুর্বল; অথচ বিপরীত মতটির দলিল শক্তিশালী।
- কখনও কখনও একই মাসআলায় পরস্পর সাংঘর্ষিক বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন; কোনো একটি মতকে তারজীহ দেননি।
- সবচেয়ে আপত্তিকর কাজ এই যে, যে কিতাব সুন্নাহ মোতাবেক আমলের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্য লেখা হয়েছে, তাতে এমন অনেক মাসআলা আছে, যা সহীহ হাদীসের বিপরীত। অথচ ওই সহীহ হাদীসগুলোর বিরোধী কোনো হাদীসও নেই।

শাইখ আলবানী রহ.-এর *তামামুল মিন্নাহ* টীকাগ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরও শাইখ সাইয়িদ সাবিক রহ. দীর্ঘ সময় জীবিত ছিলেন। কিন্তু দু-চারটি স্থান ব্যতীত তিনি *ফিকহুস সুন্নাহয়* কোনো পরিবর্তন করেননি। এর দ্বারা বোঝা যায়, তার দৃষ্টিতে শাইখ আলবানী রহ.-এর এই আপত্তিগুলো সঠিক নয়।

https://nagorikpathagar.org

এখন প্রশ্ন এই যে, উম্মতের বিভক্তির প্রধান কারণ যদি একেক মাযহাবের একেক মূলনীতি এবং ইমামদের তাকলীদই হয়, তবে একই ঘরানার এই দুই আলিমকে মতানৈক্য করতে উৎসাহিত করল কে?

খ. সালাফীদের শীর্ষ আলিমগণের মধ্যেও বিভিন্ন মাসআলায় মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন– নামাযের মধ্যে রুকূর পর কিয়ামের মধ্যে বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখার ব্যাপারে শাইখ আলবানী রহ.-এর অভিমত হলো– এটি সুস্পষ্ট বিদআত।[২৩৮] তাঁর এ মত সম্পর্কে ইবনু বায রহ. মন্তব্য করেন–

أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعةٌ ضلالة – خطأٌ ظاهر، لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة ..، ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطًا بينًا .

"তাঁর এ কথা একটি জাজ্বল্যমান ভুল। আমাদের জানামতে, তাঁর পূর্বে এরূপ কথা কোনো আলিমই বলেননি, তদুপরি তা সহীহ হাদীসের পরিপন্থি। ...তিনি এ মাসআলায় স্পষ্ট ভুল করেছেন।"[২৩৯]

সম্প্রতি الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز শিরোনামে ড. সাদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-বারীকের দুই খণ্ডের একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। এই কিতাবে তিনি প্রায় ১৬৬টির মতো মাসআলা উল্লেখ করেছেন, যেগুলোতে আহলে হাদীসের তিনজন শীর্ষ পর্যায়ের আলিম মতানৈক্য করেছেন। তাঁরা তিনজন হলেন– ইবনু বায, ইবনু সালিহ আল-উছাইমীন ও নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.। তাঁদের ওসব মতানৈক্য এখনও তাদের ভক্তদের মধ্যে চলমান। একেকজন একেক আলিমের মতামত গ্রহণ করছে।

গ্রন্থকার এখানে শুধু *কিতাবুর রাদাআহ* (দুগ্ধপান অধ্যায়) পর্যন্ত মাসআলাগুলো এনেছেন। আবার কিতাবের নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তিনজনের মধ্যকার সকল মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা এখানে উল্লেখ করা হয়নি; বরং প্রসিদ্ধ মাসআলাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও যদি এতে মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৬, তবে প্রত্যেক বিষয়ের মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা কততে গিয়ে ঠেকবে, তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

---

২৩৮. আলবানী, *সিফাতু সালাতিন নবী সা.*, পৃ.

২৩৯. ইবনু বায, *মাজমূ ফাতাওয়া ইবনি বায*, খ. ১১, পৃ. ১৩৭-৮

https://nagorikpathagar.org

এখন প্রশ্ন হলো– সালাফী শীর্ষ আলিমদের মধ্যে এত ইখতেলাফ সৃষ্টি হলো, তাদের ভক্তরা একেকজন একেক আলিমের মতামত গ্রহণ করলে তাতে কোনো অসুবিধা হলো না, উম্মতের ঐক্য নষ্টের কথাও এলো না, তাহলে মাযহাবী আলিমদের মতানৈক্যে ঐক্য নষ্টের কথা আসে কীভাবে?

গ. কুতুবী, সুরুরী, মাদখালী, ওয়াহাবী, মুহাম্মাদী, সালাফী ইত্যাদি নামে শুধু আরব বা ভারতে নয়, আমাদের বাংলাদেশেও আহলে হাদীসের অনেক গ্রুপ রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। অনেক সময় এসব বিষয়ে তাদের এক গ্রুপকে অন্য গ্রুপের সমালোচনা করতেও দেখা গেছে। শোনা যায়, দুই বাংলা মিলে তাঁদের মোট ১৯টির মতো গ্রুপ রয়েছে। নিম্নে তাঁদের কিছু মতানৈক্য উল্লেখ করা হলো :

- শাইখ আলবানীর মতে, জাহরী নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে।[২৪০] কিন্তু বাংলাদেশের আসাদুল্লাহ গালিবের মতে, জোরে-আস্তে উভয় কিরাআতের নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয; না পড়লে নামায হবে না।[২৪১]

- শাইখ আকরামুজ্জামান সম্পাদিত গ্রন্থে এসেছে– জোরে-আস্তে উভয়ভাবে বিসমিল্লাহ পড়া সহীহ সনদে বর্ণিত।[২৪২] কিন্তু আসাদুল্লাহ গালিবের মতে, নামাজে বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার কোনো ভিত্তি নেই।[২৪৩]

- আকরামুজ্জামান সম্পাদিত বইয়ে এসেছে, রুকু পেলে রাকআত পাওয়া যায়।[২৪৪] কিন্তু আসাদুল্লাহ আল গালিবের মতে, রুকু পেলে উক্ত রাকাত পাওয়া হবে না।[২৪৫]

---

২৪০. আলবানী, *সিফাতু সালাতিন নবী সা.*, পৃ. ৮৩

২৪১. গালিব, আসাদুল্লাহ, *ছালাতুর রাসূল সা.*, পৃ. ৮৮

২৪২. আকরামুজ্জামান, *ছালাত আদায়ের পদ্ধতি*, পৃ. ২৮

২৪৩. গালিব, *ছালাতুর রাসূল সা.*, পৃ. ৮৬

২৪৪. আকরামুজ্জামান, ছালাত আদায়ের পদ্ধতি, পৃ. ৩৩

২৪৫. গালিব, *ছালাতুর রাসূল*, পৃ. ৯৬

https://nagorikpathagar.org

- আসাদুল্লাহ গালিবের মতে, জানাযার নামাজে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।[২৪৬] শাইখ আলবানীর মতে সুন্নাত।[২৪৭]

- শাইখ আলবানী লিখেছেন– নামায ফরয বিশ্বাস করার পর অলসতাবশত নামায ছেড়ে দিলে তাকে কাফির বলা যাবে না।[২৪৮] কিন্তু খলীলুর রহমান বিন ফজলুর রহমান আলাদা পুস্তিকা লিখে সালাত পরিত্যাগকারীকে কাফির ফাতওয়া দিয়েছেন।[২৪৯]

- ড. সাইফুল্লাহ বলেন, ছয় তাকবীরে ঈদের সালাত পড়া সুন্নাহসম্মত। কিন্তু মুযাফফর বিন মুহসিন ও আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বলেন, ছয় তাকবীরের কোনো প্রমাণ নেই।[২৫০]

- ড. সাইফুল্লাহ বলেন, তারাবীহ নামায বিশ রাকাত পড়া যায়– তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মুযাফফর বিন মুহসিন ও আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ বলেন, আট রাকাতের বেশি তারাবীহ নামায পড়া যাবে না। এর কোনো প্রমাণ নেই।[২৫১]

- শাইখ মুরাদ বিন আমজাদ ও আবু সুমাইয়া মতিউর রহমান বলেন, সারা পৃথিবীতে একই সময় ঈদ করতে হবে। যারা সৌদিতে ঈদের দিন রোযা রেখেছে, তারা হারাম কাজ করেছে। অন্যদিকে শাইখ আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল বলেছেন, একই দিনে ঈদকারীরা কাদিয়ানীদের বংশধর।[২৫২]

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম– যদি মাযহাব সকল অনৈক্যের মূল হতো, তবে মাযহাব থেকে বের হয়ে অবশ্যই তাঁরা ঐক্য গড়তে পারতেন। কিন্তু তা সম্ভবপর হয়নি। কারণ, যেমনিভাবে হাদীসের ভিন্নতা রয়েছে, তেমনি মানুষের

---

২৪৬. গালিব, *ছালাতুর রাসূল*, পৃ. ২১৩

২৪৭. আলবানী, *সিফাতু সালাতিন নবী সা.*, পৃ. ১১১

২৪৮. আলবানী, *সলাত পরিত্যাগকারীর হুকুম*, তাওহীদ পাবলিকেশন্স

২৪৯. খলীলুর রহমান, *জামাআতে সালাত ত্যাগকারীর পরিণতি*, আত তাওহীদ প্রকাশনী

২৫০. ইউটিউবে আপলোডকৃত ভিডিও

২৫১. ইউটিউবে আপলোডকৃত ভিডিও

২৫২. ইউটিউবে আপলোডকৃত ভিডিও

https://nagorikpathagar.org

চিন্তাধারা ও গবেষণা পদ্ধতিও বৈচিত্র্যময়। যদি শরীয়তের সবকিছুই স্পষ্ট বর্ণিত থাকত, কোনো ধরনের মতানৈক্যের সম্ভাবনা না থাকত, তবে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে নিষেধ করার কোনো অর্থ ছিল না। কাজেই বোঝা যায়, হাজারো মতানৈক্য আসবে; কিন্তু মুসলিমদের জামাআত ছেড়ে যাওয়া যাবে না, ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সা.-এর যুগেও মতানৈক্য পাওয়া যায়; কিন্তু তিনি সেগুলোর কারণে বিরোধকে সমর্থন করেননি। সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বলেন–

سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن قال شعبة أظنه قال: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا

"একবার আমি যেমনটা রাসূলুল্লাহ সা. থেকে শুনেছি, এর বিপরীতে এক ব্যক্তিকে একটি আয়াত পড়তে শুনলাম। ফলে আমি তার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, দুজনই সঠিক। শুবা রহ. বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এ কথাও বলেছেন– তোমরা মতানৈক্য করো না। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীরা মতানৈক্য করেই ধ্বংস হয়েছে।"[২৫৩]

মুজতাহিদ ইমামগণের যুগেও বৈচিত্র্যের সঙ্গে ঐক্যের উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশিষ্ট ফকীহ ইউনুস আস-সাদাফী [১৭০-২৬৪ হি.] রহ. বলেন–

ما رأيت أعقل مِن الشَّافعي، ناظرته يومًا في مسألة، ثمَّ افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي، ثمَّ قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وإن لم نتَّفق في مسألة

"আমি ইমাম শাফিয়ী রহ. থেকে অধিক জ্ঞানী, বুদ্ধিমান কাউকে দেখিনি। একদিন একটি মাসআলায় আমার সাথে তাঁর বিতর্ক হলো। অতঃপর আমরা আলাদা হয়ে গেলাম, তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে হাত ধরে বললেন, আবু মুসা! আমরা মাসআলায় একমত হতে না পারলেও ভাই হতে তো সমস্যা নেই?!"[২৫৪]

---

২৫৩. বুখারী, আস-সহীহ, হা. নং : ২৪১০

২৫৪. যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, খ. ১০, পৃ. ১৬

https://nagorikpathagar.org

মোটকথা, আমাদের সালাফে সালিহীন (পূর্বসূরি) ও দ্বীনের গবেষণাধর্মী নানা উপজাত বিষয়ে (فروع) মতপার্থক্য করেছেন। তবে তাঁদের সে মতপার্থক্যে কোনো প্রকারের জিদ, হঠকারিতা ও গোঁড়ামির স্থান ছিল না। তাঁদের মতবিরোধ তাঁদের মধ্যে অন্তরের সামান্যতম দূরত্বও তৈরি করেনি, তাঁদের নানা দলে-উপদলে বিভক্তও করেনি। বরং এ মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। পরমতসহিষ্ণুতা ছিল তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলাই বাহুল্য, তাঁদের এরূপ ইজতিহাদভিত্তিক উদারনৈতিক মতপার্থক্য বহু ক্ষেত্রে উম্মতকে প্রশস্ততাও দান করেছে। এ কারণে অনেকেই তাঁদের এ মতপার্থক্যকে উম্মতের জন্য রহমতরূপেও বিবেচনা করেছেন।[২৫৫] ইসলামের পঞ্চম খলীফা সাইয়িদুনা উমার ইবনু আবদিল আযীয [৬১-১০১ হি.] রহ. সাহাবা কিরাম রা.-এর মতবিরোধ সম্পর্কে বলেন–

مايسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة .

"রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণের মধ্যে মতভিন্নতা না থাকাটা আমার কাছে আনন্দের বিষয় নয়। কেননা, যদি তাঁরা কোনো বিষয়ে মতানৈক্য না করতেন, তাহলে (পরবর্তীদের জন্য) কোনো ছাড়ই থাকত না।"[২৫৬]

অর্থাৎ, এরূপ অবস্থায় উত্তরসূরিরা অনেক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ অবস্থায় পড়ে যেত। কেননা, যদি তাঁরা সব বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করতেন, তাহলে যে কেউ কোনো বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করলে সে পথভ্রষ্টরূপে পরিগণিত হতো। এখন যেসব বিষয়ে তাঁরা মতানৈক্য করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে যেহেতু তাঁরা প্রত্যেকেই অনুসরণীয় ইমাম, তাই প্রত্যেকের জন্য এ অবকাশ রয়েছে যে,

---

২৫৫. শাতিবী, আবূ ইসহাক ইবরাহীম, *আল-মুওয়াফাকাত*, (দারু ইবনি আফফান, ১৯৯৭), খ. ৫, পৃ. ৭৫

২৫৬. আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ১, পৃ. ৪০৪; ইবনু তাইমিয়াহ, আহমাদ, *মাজমূউল ফাতাওয়া*, (রিয়াদ : দারুল ওয়াফা, ২০০৫), খ. ৩০, পৃ. ৮০

https://nagorikpathagar.org

তিনি যে কারও অনুসরণ করতে পারেন। এজন্য অন্ততপক্ষে কাউকে পথভ্রষ্ট বলা যাবে না। বিশিষ্ট ফকীহ তাবিঈ আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মদ [৩৭-১০৭ হি.] রহ. বলেন–

كان اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نفع الله به، فما عملت منه من عمل لم يدخل نفسك منه شيء.

"রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীগণের মতপার্থক্য আল্লাহ তাআলার কল্যাণকর বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। তুমি (তাঁদের মধ্যে) যার মতানুযায়ী যে আমলই করো না কেন, এতে তোমার মনের মধ্যে কোনো অপ্রসন্ন ভাব সঞ্চার হবে না।"[২৫৭]

এ বিষয়টি আমি আমার *তুলনামূলক ফিকহ* ১ম খণ্ডের ২য় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আগ্রহী পাঠকগণ তা অধ্যয়ন করতে পারেন।

৩. প্রবৃত্তির অনুসরণ

আলিমদের মধ্যকার অনৈক্যের অপর একটি প্রধান কারণ হলো– প্রবৃত্তির অনুসরণ। ইতঃপূর্বে ১ম অধ্যায়ে আমরা ইফতিরাকের কারণ প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। এখানে আমরা আলিমদের অনৈক্যের কারণ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এ কথা তুলে ধরতে চাই– কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যসমূহের বাহ্যিক দ্বন্দ্ব কিংবা মর্ম উদ্‌ঘাটনের বিচিত্রতা আলিমগণের অনৈক্যের মূল কারণ নয়; বরং অনেক সময় আলিমগণ বিভিন্ন দল ও গ্রুপে ভাগ হয়ে যান তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায়। যেমন– রাজনৈতিক অঙ্গনে মান-অভিমান, জেদের জেরে অথবা অর্থ, খ্যাতি কিংবা পদবির লোভে বহু দল গঠিত হয়, আবার একেকটি দল নানা উপদল ও গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তেমনি আলিমরাও জিদ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে কিংবা মানসম্মান, খ্যাতি বা পদ-পদবির লোভে বহু দল-উপদল ও গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েন। অনেক আলিম কেবল এই ধারণা নিয়েও ঐক্যের পথে হাঁটতে চান না– নিজেদের দল ও মাসলাককে যতদিন টিকিয়ে রাখা যাবে, ততদিন পূর্বসূরিদের নাম করে লোকসমাজে সম্মান পাওয়া যাবে। সকলেই এক হয়ে গেলে আমার কিংবা আমার পূর্বসূরিদের অবস্থান সংকীর্ণতায় পড়ে যেতে পারে।

---

২৫৭. আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ১, পৃ. ৪০৪

https://nagorikpathagar.org

আবার এমন কিছু আলিমও রয়েছেন, যারা স্বভাবগতভাবেই মতপার্থক্যপ্রবণ ও বিভেদপ্রয়াসী। অন্যের সাথে বিভেদ ও মতপার্থক্য করা তাদের মজ্জাগত স্বভাব। বিভেদ ও মতপার্থক্য করেই তারা স্বাদ অনুভব করেন। তাদের স্বভাব হলো এমন– শীতকালে যদি বলা হয়, 'এখন ঠান্ডা পড়ছে'; তারা বলবে– 'না, আজ গরম'। মতপার্থক্য করতে হয়, বিভেদ করতে হয়; তাই করা হয়। বিভেদ ও মতপার্থক্যের আগুন জ্বালানোই যেন এদের প্রধান কাজ। এ জাতীয় কলহপ্রিয় লোকদের কারণেও আলিমসমাজে মতপার্থক্য ও অনৈক্যের ডামাডোল বেজে ওঠে।

৪. 'ফিকহুল খিলাফ ওয়াল ইজতিমা' সম্পর্কে অসচেতনতা

আলিমদের মধ্যকার অনৈক্যের অপর একটি কারণ হলো– 'ফিকহুল খিলাফ' (ইখতিলাফের সংজ্ঞা, প্রকার, হুকুম, কারণ, শিষ্টাচার ও নিয়মাবলি প্রভৃতি) ও 'ফিকহুল ইজতিমা ওয়াল জামাআত' (ঐক্যের সংজ্ঞা, ভিত্তি, পরিধি, প্রকার, হুকুম ও নিয়মাবলি প্রভৃতি) সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। আমাদের অনেক আলিমই সচেতন নন যে, কোন ধরনের মতপার্থক্য বৈধ ও নির্দোষ এবং কোন ধরনের মতপার্থক্য বৈধ নয় বা হারাম? বিরোধী মতাবলম্বীকে কোন কোন ক্ষেত্রে মাযূর মনে করা হবে আর কোন কোন ক্ষেত্রে মাযূর মনে করা হবে না? কখন তাদের 'কাফির' বা 'বাতিল' কিংবা 'বিদআতী' বলা যাবে আর কখন বলা যাবে না? শরীয়তের ثوابت (স্থির বিষয়গুলো) ও متغيرات (পরিবর্তনশীল বিষয়গুলো) কী কী এবং এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী ...? ইখতিলাফের শিষ্টাচারগুলো কী কী? অনুরূপভাবে ইত্তিহাদ ও জামাআত বলতে কী বোঝায়? ইখতিলাফ ও ইফতিরাফের মধ্যে পার্থক্য কী? বিভেদ ও অনৈক্যের ক্ষতি ও অনিষ্টগুলো কী কী? প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে, অনৈক্যের শেষের তিনটি কারণে সৃষ্ট দল ও গ্রুপগুলোর মধ্যে বৃহৎ স্বার্থে ঐক্য সম্ভব। কারণ, তারা শাসকবর্গের ধোঁকায় পড়েনি কিংবা তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়নি। তারা অনেকটা সত্যানুবর্তী। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে প্রকাশ্যত তারা সকলেই একমত।

আলিমদের অনৈক্যের পরিণাম

আলিমদের অনৈক্যের অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে এবং এর পরিণামও ভয়াবহ। মৌলিক বিষয়গুলোতে যারা ঐকমত্য পোষণ করেন, তাদের সাথে

https://nagorikpathagar.org

শাখাগত মতানৈক্যের বিষয় নিয়ে শত্রুতা রাখা সমীচীন নয়। বলাই বাহুল্য, যদি আলিমগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হন, তবে উম্মতের শক্তি হ্রাস পাবে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য কমে আসবে। কাফির-মুনাফিকদের গভীর ষড়যন্ত্রকে পাত্তা না দিয়ে নিজেদের মধ্যে একপক্ষ অপর পক্ষকে ঘায়েল করার খেলায় মত্ত থাকলে ধীরে ধীরে উম্মত দুর্বল হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় কেউ বা কোনো পক্ষই কাফির-মুনাফিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পাবে না। এমনকি কখনও একপক্ষ অপর পক্ষকে শায়েস্তা করতে কখনও কখনও কাফিরদের সাহায্য নিতেও পিছপা হবে না। ইতিহাস সাক্ষী, আলিমগণের অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার কারণে উম্মত অতীতেও নানা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও যে নানা ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে– তা বলাই বাহুল্য। নিম্নে আমরা এ ক্ষতিগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

ক. আলিমদের সামাজিক প্রভাব ও মর্যাদা খর্ব

ইসলামের দিকে দাওয়াত, সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে বাধা প্রদান আলিমদের একটি গুরুদায়িত্ব। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন–

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত– যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবে। এরাই একান্ত সফলকাম।"[২৫৮]

এ আয়াতে যে দলের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা সর্বাগ্রে উদ্দেশ্য হলো আলিমগণ। তাঁদের দায়িত্বই হলো মানুষকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান, সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে বাধাদান। বলাই বাহুল্য, আলিমগণ তাঁদের এ দায়িত্ব তখনই সুচারুরূপে পালন করতে পারেন, যদি তাঁরা ঐক্যবদ্ধ থাকেন। অর্থাৎ, এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য আলিমদের যেমন প্রয়োজন দৃঢ় নৈতিক শক্তি, তেমনি প্রয়োজন বৈষয়িক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও

২৫৮. আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলে ইমরান) : ১০৪

https://nagorikpathagar.org

সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। যদি তাঁরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন হন, তবে স্বভাবতই তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব হয়ে যাবে এবং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে বলিষ্ঠভাবে কথা বলা এবং সামাজিক অন্যায়-অনাচারের প্রতিবাদ করা দুরূহ হবে। এ কারণে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই যে, আলিমগণ লোকদের ভালো কাজের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করেন, ওয়ায-নসীহত করেন ঠিকই; কিন্তু সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান বলতে যা বোঝায়, অধিকাংশই তা এখন প্রায়ই ছেড়ে দিয়েছেন; পাপাচারী ও সন্ত্রাসীদের রোষানল থেকে আত্মরক্ষার জন্য অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে কথা বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন। ফলে যে পরিমাণে আলিমদের ওয়ায-নসীহত-দাওয়াত বাড়ছে, সেই পরিমাণে সমাজে সত্য ও ন্যায়ের চর্চা বৃদ্ধি হচ্ছে না। উপরন্তু অন্যায় ও অপরাধের হার ক্রমশ বেড়েই চলছে। অনেক আলিমই আবার প্রয়োজনীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির অভাবে ঝামেলা এড়াতে সমাজ সংশোধন ও মেরামতের চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার ফিকির ছেড়ে দিয়েছেন। এর প্রধান কারণ হলো– আলিমদের চিন্তাধারায় ও কর্মপন্থায় ঐক্য গড়ে ওঠেনি। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, শক্তির ভিত্তিই হলো ঐক্য। আজ ঐক্য না থাকার কারণে মসজিদের ইমামগণ যেখানে সমাজের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে তাঁরা মসজিদ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নিয়মিত ধমক খাচ্ছেন, নেতৃত্বের পরিবর্তে শাসিত হচ্ছেন।

কেন আলিমগণ ধমক খাচ্ছেন? কেন শাসিত হচ্ছেন? এর পেছনে অন্যতম কারণ হলো, তাঁদের অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা। এর ফলে তাঁদের মস্তিষ্কে সমাজ সংশোধন ও মেরামতের চিন্তা স্থান পাচ্ছে না; বরং চাকরির চিন্তাই একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাই চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা একদিকে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিতে পারছেন না, অপরদিকে নিজেদের মর্যাদা ও প্রভাব বিলীন করে চলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

"তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করো না। অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে।"[২৫৯]

---

২৫৯. আল-কুরআন, ৮ (সূরা আল-আনফাল) : ৪৬

https://nagorikpathagar.org

এ আয়াত থেকে জানা যায়, শুধু আলিম সমাজ কেন, গোটা উম্মতের জন্যও এ বক্তব্য প্রযোজ্য। কাজেই আলিমগণ যদি পরস্পর তর্ক-বিবাদে জড়িয়ে পড়েন এবং দলাদলি করেন, তবে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যে ক্ষুণ্ন হবে, তা বলাই বাহুল্য। আর এ ভঙ্গুর অবস্থান নিয়ে সমাজ সংশোধন ও মেরামতের চিন্তা কোনো কার্যকর ফল বয়ে আনবে না– তা বলাই চলে।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সূফী ফুদাইল ইবুন ইয়াদ [১০৫-১৮৭ হি.] রহ.-এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন–

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ أَكْرَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَشَحُّوا عَلَى دِينِهِمْ وَأَعَزُّوا الْعِلْمَ وَصَانُوهُ وَأَنْزَلُوهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَخَضَعَتْ لَهُمْ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ وَانْقَادَتْ لَهُمُ النَّاسُ وَكَانُوا لَهُمْ تَبَعًا وَعَزَّ الْإِسْلَامُ وَأَهْلُهُ، وَلَكِنَّهُمْ أَذَلُّوا أَنْفُسَهُمْ وَلَمْ يُبَالُوا بِمَا نَقَصَ مِنْ دِينِهِمْ إِذَا سَلِمَتْ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ وَبَذَلُوا عِلْمَهُمْ لِأَبْنَاءِ الدُّنْيَا لِيُصِيبُوا بِذَلِكَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، فَذَلُّوا وَهَانُوا عَلَى النَّاسِ ، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فأعظم بها مصيبة.

"যদি আলিমরা নিজেরাই নিজেদের সম্মান করত, দ্বীনের ব্যাপারে উদ্গ্রীব হতো, ইলমকে মর্যাদা দিত, তা হিফাযত করত এবং তাকে আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে ব্যবহার করত, তাহলে প্রচণ্ড প্রতাপশালীদের গর্দান তাদের সামনে নত হয়ে যেত, জনগণ তাদের আনুগত্য করত এবং তাদের একান্ত অনুসারী বনে যেত। অধিকন্তু, ইসলাম ও মুসলমানরা শক্তিশালী হতো। কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের সম্মান রাখতে পারেনি। যদি তাদের দুনিয়ার কোনোরূপ স্বার্থ বিঘ্নিত না হয়, তাহলে দ্বীনের কী ক্ষতি হলো– তা নিয়ে তারা কোনোরূপ চিন্তা করে না এবং দুনিয়াদারদের স্বার্থ রক্ষার কাজে ইলমকে ব্যবহার করেছে, যাতে তারা তাদের আয়ত্তাধীন সুবিধাগুলো অনায়াসে লাভ করতে পারে। এর ফলে তারা নিজেরাও মানুষের সামনে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হলো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন! কত ভীষণ বিপদ!"[২৬০]

---

২৬০. ইবনুল হাজ্জ, *আল-মাদখাল*, খ. ১, পৃ. ২০১; আবশিহী, *আল-মুস্তাতরাফ*, খ. ১, পৃ. ২১

https://nagorikpathagar.org

খ. আলিমদের ব্যাপারে জঘন্য কুৎসাচর্চা

আলিমদের অনৈক্য ও বিভক্তির অন্য একটি মারাত্মক ক্ষতি হলো দেশের আলিম সমাজ ও দাঈগণকে নিয়ে জঘন্য কুৎসাচার। বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে এ প্রবণতা অনেক বেশি বৃদ্ধি লাভ করেছে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই আলিমদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা দ্বীন ও শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় জানা এবং সমস্যাবলির সমাধান লাভের জন্য তাঁদের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু যখন তারা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের নানা কথা বলতে দেখে এবং তাঁদের একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে দেখে, তখন তাঁদের প্রতি তারা অন্তরে যে আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ লালন করত, তা ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। উপরন্তু, তাঁদের প্রতি লোকদের ঘৃণা দানা বাঁধতে থাকে। এ সুযোগে ধর্মহীন ও বিদ্বেষী লোকেরা আলিমদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ব্যাপকভাবে সমাজে প্রচার করতে থাকে।

বর্তমানে এ অবস্থা এতই চরমে পৌঁছেছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি দ্বীনের কোনো বিষয়ে জানার জন্য গ্রহণযোগ্য আলিমের অনুসন্ধান করতে ইন্টারনেটে প্রবেশ করে, তবে সে দেখতে পাবে– প্রসিদ্ধ প্রত্যেক আলিম বা দাঈর ব্যাপারে কমবেশি কুৎসা ও নিন্দাচার বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেক ভিন্নমতের আলিম ও দাঈকে হয় ইসলামের দুশমন, ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের দালাল কিংবা গুমরাহ-বাতিল অথবা চরিত্রহীন বলে চিত্রিত করা হয়েছে। এতে ভিন্নমতের অনুসারীরা আনন্দিত হলেও সাধারণ ধর্মানুরাগী মুসলিমরা, বিশেষ করে তরুণরা খুবই বিভ্রান্ত হচ্ছে। সমাজের আলিমগণ সকলেই খারাপ, অর্বাচীন, কিছুই বোঝেন না, ...এরূপ চিন্তা তরুণদের আলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। এ সুযোগে ভ্রান্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো এবং অন্যান্য ধর্ম বা মতের প্রচারকরা এদের সহজেই গ্রাস করতে ও বিভ্রান্ত করতে সুযোগ পাচ্ছে।

গ. উম্মতের বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি নষ্ট

উম্মতের অভিভাবক হিসেবে উম্মতের মধ্যকার বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি ধরে রাখার প্রধান দায়িত্ব বর্তায় আলিমদের ওপর। তাঁরা উম্মতের সকলকেই দ্বীনের সূত্রে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন– এই হলো আলিমদের প্রতি দ্বীনের একান্ত কামনা। কিন্তু এ দায়িত্ববান ব্যক্তিরা নিজেরাই যখন অনৈক্য ও

https://nagorikpathagar.org

তর্ক-বিবাদে জড়িয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন চিন্তানৈতিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন, তখন আর উম্মতের বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি যে অটুট থাকবে না– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারা আলিমদের অনুসরণে বিভিন্ন দল-উপদল ও গোষ্ঠীতে বিভাজিত হয়ে পড়ে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংহতির চরম অবনতি ঘটে।

ঘ. উম্মতের দ্বিধাগ্রস্ততা ও বিভ্রান্তি

আলিমগণ হলেন ইলমে নববীর প্রকৃত ধারক ও বাহক, উম্মতের দিশারি ও পথনির্দেশক। সত্য প্রকাশ ও সত্যপথের নির্দেশনা দান এবং মিথ্যার স্বরূপ উন্মোচন তাঁদের একান্ত দায়িত্ব। যুগে যুগে আলিমগণ প্রত্যেকটি মিথ্যা ও বিকৃতির সমুচিত জবাব দিয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে ক্ষুরধার কলম চালিয়েছেন। এভাবে তাঁরা ইলমে নববীর ময়দানে স্তূপীকৃত প্রত্যেকটি মিথ্যাচার, বিকৃতিসাধান ও অপব্যাখ্যার জঞ্জাল থেকে তাকে পবিত্র করেন, মুক্ত করেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

يحمل هَذَا الْعلمَ منْ كُلِّ خلفٍ عدوله، ينفون عَنهُ تَحْرِيف الغالينَ ، وانتحال المبطلينَ وَتَأْويل الْجَاهِلين.

"এ ইলম বহন করবে প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মের ন্যায়পরায়ণ লোকেরাই। তারা এ ইলম থেকে অতিরঞ্জনকারীদের বিকৃতি, ভণ্ডদের মিথ্যাচার ও অজ্ঞ-জাহিলদের অপব্যাখ্যা দূরীভূত করবে।"[২৬১]

কিন্তু আলিমগণ নিজেরাই যখন নানা মত ও পথের কথা বলবেন, সত্যের সাথে মিথ্যাকে জড়াবেন এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বেন, তখন উম্মত চরম সিদ্ধান্তহীনতায় পতিত হবে। তাদের অনেকের পক্ষে সহজেই এটা পরখ করা সম্ভব হবে না যে, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা; কোনটি আসল আর কোনটি নকল; কোন দলটি সত্যাশ্রয়ী আর কোন দলটি মিথ্যাবলম্বী। ফলে উম্মতের একটি বড়ো অংশ সঠিক দিশা না পেয়ে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হবে, ভণ্ড ও মিথ্যুকদের মিথ্যা প্রচারণায় প্রতারিত হবে এবং পুণ্য মনে করে এমন অনেক আমল করবে, যা মূলত শিরক ও বিদআতের পর্যায়ভুক্ত।

---

২৬১. তাবারানী, *মুসনাদুশ শামিয়ীন*, হা. নং : ৫৯৯; তাহাভী, *মুশকালুল আছার*, হা. নং : ৩২৬৯

https://nagorikpathagar.org

এ কারণে বলা চলে, বর্তমানে দ্বীন ও শরীয়তের যে বিপর্যস্ত অবস্থা এবং উম্মতের যে বিভ্রান্তি প্রতিনিয়ত বাড়ছে, তার প্রধান উপলক্ষ্য হলো আলিমদের দলাদলি ও বিভাজন। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক [১১৮-১৮১হি.] রহ. কতই-না বাস্তব কথা বলেছেন–

وَهَل أفْسَدَ الدِّينَ إلا الملوكُ ... وَأحبارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا؟

"দ্বীনের যা কিছু নষ্ট হয়েছে, তা রাজা-বাদশাহ, অসৎ আলিম ও দরবেশরাই করেছে।"[২৬২]

৬. শিরক-কুফর ও বিদআতের চর্চা বৃদ্ধি

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের সমাজে দ্বীনের বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস পোষণ এবং নানা সুন্নাত পরিপালনের ক্ষেত্রে আলিমদের মধ্যে উদ্ভূত তর্ক-বিতর্ক, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠছে। এর সুবাদে একদিকে শিরক-কুফর ও বিদআতের প্রচারকরা অনেকটা নিরাপদে তাদের প্রচারণা চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে, অপরদিকে শীআ, কাদিয়ানী, বাহাঈ ও আহলে কুরআন প্রভৃতি ভ্রান্ত দলগুলোর মিশনারি কর্মকাণ্ড ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। উপরন্তু, খ্রিষ্টান মিশনারিরা হাজার হাজার মুসলিমকে ধর্মান্তরিত করতে পারছে।

আলিমগণ পরস্পরের মতভেদ খণ্ডন, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে ব্যস্ত থাকার কারণে উপর্যুক্ত সকল বিষয় হয় তাঁদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে অথবা নজরে আসলেও নিজেদের বিভেদের কারণে এগুলোর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন কিংবা গুরুত্ব দিতে পারছেন না। এমনকি অনেক সময় তাঁরা এ ধরনের অনেক বিষয়ের গুরুত্বারোপের বিরোধিতাও করছেন। কেউ বলছেন– 'অমুক দলের অনুসারীরা মূলত কাফির। কাজেই তারা কাদিয়ানী, বাহাঈ, শীআ বা খ্রিষ্টান হলেই কি আর না হলেই কি!' আবার কেউ বলেছেন– 'অমুক মতের অনুসারীরা তো মুসলিম নামের কলঙ্ক, তাদের কাদিয়ানী বা খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়াই ভালো। হয় তারা আমাদের আকীদা-বিশ্বাস অবলম্বন করে সঠিক

২৬২. ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৪, পৃ. ৩৮; কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৮, পৃ. ১২০

https://nagorikpathagar.org

ইসলাম অনুসরণ করুক অথবা খ্রিষ্টান হয়ে ইসলামের কলঙ্ক দূর করুক!' আর কেউ বলছেন– 'এখন কাদিয়ানী, বাহাঈ বা খ্রিষ্টান ধর্মান্তর নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই; বরং আগে বাতিল ঠেকাও।'[২৬৩]

চ. সামাজিক অনাচার ও অপরাধ বৃদ্ধি

আলিমদের মধ্যে যে পরিমাণে বিভেদ ও দলাদলি বাড়তে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও প্রভাব খর্ব হয়ে যায়। ফলে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করা এবং অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে যাদের সরব হওয়ার কথা, তাঁদের আওয়াজ যখন ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে যায়, তখন সমাজে একদিকে সত্য ও ন্যায়ের চর্চা হ্রাস পেতে শুরু করে, অপরদিকে অন্যায়-অনাচার ও অপরাধের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নতুন নতুন ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ ، وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ ، مَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى ، عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ ، مِنْهُمْ خَرَجَتِ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ.

"অচিরেই লোকদের কাছে এমন একটি সময় আসবে, যখন ইসলামের কেবল নামটাই অবশিষ্ট থাকবে আর কুরআনের কেবল বাহ্যিক পঠন-পাঠনই বহাল থাকবে। এ সময় তাদের মসজিদগুলো (ঠিকই সুরম্য ইমারত ও সাজসজ্জা দ্বারা) আবাদ থাকবে, তবে সেগুলো হিদায়াতশূন্য হবে আর তাদের আলিমরা হবে আসমানের নিচে সর্বনিকৃষ্ট। তাদের থেকে ফিতনার উদ্ভব হবে এবং পুনরায় তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।"[২৬৪]

---

২৬৩. জাহাঙ্গীর, আবদুল্লাহ, *জামায়াত ও ঐক্য*, পৃ. ১৪

২৬৪. আবূ বাকর আদ-দাইনূরী, *আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম*, হা. নং : ৫১৯; বাইহাকী, *শুআবুল ঈমান*, হা. নং : ১৭৬৩; হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল।

https://nagorikpathagar.org

ছ. দ্বীনী বিষয়গুলো নিয়ে পারস্পরিক হানাহানি

আলিমদের অনুসারীদের একদলের সাথে অন্য দলের বিভেদ ও দূরত্ব ক্রমশ এভাবে বেড়ে চলছে যে, কোথাও কোথাও তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক চরম শত্রুতায় রূপ নিচ্ছে। একদল অন্য দলের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ লালন করে থাকে। উপরন্তু, হক প্রতিষ্ঠা ও ভিন্নমত খণ্ডনের নামে কখনও কখনও তাঁদের একদলকে অন্য দলের ওপর ভীষণ চড়াও হতেও দেখা যায়। কোনো কোনো এলাকায় মসজিদে উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে মারামারি ও হানাহানির ঘটনাও ঘটছে। এখনই এর রেশ টেনে ধরতে না পারলে সমাজে ধর্মীয় বিভেদ আরও প্রকট আকারে ছড়িয়ে পড়ছে।[২৬৫]

জ. উম্মতের পতন

আলিমদের অনৈক্য ও দলাদলি উম্মতের পতন ও ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ। উল্লেখ্য যে, একটি জাতির আলিমগণ যখন পরস্পর মতভেদ ও দলাদলিতে লিপ্ত হয়, তখন সেই জাতির লোকেরাও তাদের অনুসরণে নানা দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ছোটো থেকে বড়ো বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করে। ফলে তাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে উম্মতের জন্য সময়োপযোগী কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের মোকাবিলা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। ছোটো ছোটো বিষয়ে বিভেদ ও বিতর্কের আড়ালে চাপা পড়ে যায় অনেক মৌলিক ও জরুরি বিষয়। এভাবে এ প্রতিযোগিতাশীল বিশ্বে বিবদমান উম্মত একদিকে প্রতিযোগিতায় তাদের অবস্থান ধরে রাখতে পারে না এবং নিজেদের গৌরব ও স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে, অপরদিকে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ও সামরিক অবস্থায় প্রতিনিয়ত ধস নামতে শুরু করে। সুতরাং একপর্যায়ে তারা অন্যদের গোলাম ও ক্রীড়নকে পরিণত হয়।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামের মধ্যযুগে হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর শুরু থেকে বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীগণ পারস্পরিক দ্বন্দ-সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘ সময় ধরে তাদের মধ্যে সংঘর্ষও চলে। এসব মাযহাবী সংঘাত ও কোন্দলের মাঝে হিজরী ৩৯৮, ৪৮৩ ও ৬৫৫ সালে শীআ ও

---

২৬৫. জাহাঙ্গীর, আবদুল্লাহ, *জামায়াত ও ঐক্য*, পৃ. ১৫

https://nagorikpathagar.org

সুন্নীগণের মধ্যে সংঘর্ষে ভয়াবহ লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড চলে এবং বহু বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়। এ ধরনের দলাদলি ও সংঘাত ক্রমে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর সুযোগ নিয়ে চেঙ্গিস খান ও হালাকু খান বাগদাদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

*****

https://nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

ঐক্যের সম্ভাব্য প্রক্রিয়া

প্রশ্ন হচ্ছে– আলিমগণ কি আদৌ ঐক্যবদ্ধ হতে পারবেন না? তাঁরা কি পরস্পরের ওপর ধর্মীয় বা আর্থসামাজিক অথবা রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ওপর ভিত্তিশীল নয়– এমন একটি আত্মিক, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন না? তাঁদের পক্ষে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও অকাট্য বিধিবিধানের ওপর ভিত্তিশীল একটি বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলা কি আদৌ সম্ভব হবে না?

অনেকেরই ধারণা হলো, আলিমগণ কখনোই ঐক্যবদ্ধ হতে পারবেন না। বলা হয় যে, اتفق العلماء على أن لا يتفقوا-"আলিমগণ এ মর্মে একমত যে, তারা (কোনো বিষয়ের ওপরই) ঐকমত্য পোষণ করবেন না।"

কিন্তু আমরা এ নৈরাশ্যবাদীদের দলভুক্ত নই। আমরা সর্বদা এ আশা লালন করি যে, এমন একটি সময় আসবে, যখন বৃহত্তর আলিম সমাজ উম্মতের সমন্বয়সাধ্য স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হবে, একই প্ল্যাটফরমে জমায়েত হবে। আমরা এখানে তাঁদের যে ঐক্যের কথা বলছি, তা দ্বারা উদ্দেশ্য অবশ্যই এ নয় যে, সকলেই নিজ নিজ পছন্দের দল, মাসলাক, মাযহাব ও চিন্তা পরিত্যাগ করে একটা বৃহত্তর জামাআতের অনুসরণ করবে। এটি যদিও নীতিগতভাবে কাম্য ও অতি প্রশংসনীয়; তবুও তা নানা কারণে বর্তমানে সম্ভব নয় কিংবা দুরূহ। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, সকলেই– যাঁরা যে দল বা গোষ্ঠীরই হোন না কেন, যে মাযহাবের অনুসারীই হোন না কেন– উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণের প্রয়োজনে দলীয় ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সমন্বয়সাধ্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে, সম্মিলিত কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, বিপদাপদে প্রত্যেকেই অন্য দল, মাসলাক ও মাযহাবের ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াবে, তাদের সাহায্য করবে।

https://nagorikpathagar.org

বর্তমানে আলিমদের মধ্যে চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তাতে যে কারও এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া অমূলক নয় যে, তাঁদের মধ্যে না নির্দিষ্ট চিন্তা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোনো ঐক্য গড়ে উঠতে পারে, না নির্দিষ্ট আমল ও কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন দাঁড়ায়— বর্তমানে আলিমদের মধ্যে কীসের ভিত্তিতে এবং কোন ধরনের কাঠামো নিয়ে ঐক্য তৈরি হবে? এ কথা বলাই বাহুল্য, ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রে সমকালীন চিন্তাচেতনা থেকে সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। তবে তা নেওয়া হবে দ্বীন ও মিল্লাতের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে বাহ্যিক আঙ্গিকতার ক্ষেত্রে; দ্বীনের মূল চেতনা ও নিগূঢ় সত্যসমূহের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, এটা কারও জন্য বৈধ নয় যে, যুগের দোহাই দিয়ে ও সময়ের দাবির কথা বলে ইসলামের নিগূঢ় সত্যসমূহ থেকে কোনো একটি সত্যকেও পরিবর্তন করা। কারণ, ইসলামের সত্যসমূহ হচ্ছে সর্বতোভাবে অকাট্য, সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনযোগ্য। উল্লেখ্য যে, এরূপ বাহ্যিক আঙ্গিক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য দল ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে না চিন্তা-বিশ্বাসগত মিল থাকার প্রয়োজন রয়েছে, না আমলের মিল থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এরূপ ঐক্য সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও ভিন্ন চিন্তা ও মতাবলম্বীদের সাথেও গড়ে তোলা যায়। এমনকি প্রয়োজনে উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষেত্রবিশেষে নির্দিষ্ট কতিপয় কমন বিষয়ের ওপর অমুসলিমদের সাথেও ঐক্য গড়ে তোলা যেতে পারে। যেমন– রাসূলুল্লাহ সা. মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পর দ্বীন ও মিল্লাতের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট কতিপয় কমন বিষয়ের ওপর সেখানকার কাফির ও ইয়াহুদীদের সাথে ঐক্য ও সমঝোতা গড়ে তুলেছিলেন।

নিম্নে আলিম সমাজের ঐক্য বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যে পথ, কাঠামো ও রূপরেখা অবলম্বন করা উচিত বলে আমরা মনে করছি, সেগুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

ঐক্যের চেতনা বৃদ্ধি

আলিমদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য উম্মতের চিন্তাশীল লোকদের সর্বপ্রথম যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, তা হলো– তাঁদের মধ্যে ঐক্যের চেতনা বৃদ্ধি করতে হবে। একদিকে তাকওয়া, ইখলাস ও সততার কমতি, কানাআত (অল্পে তুষ্টি)-এর অভাব, অপরদিকে অর্থসম্পদ, মানসম্মান ও পদ-পদবি অর্জনের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বর্তমান অজস্র আলিমের চরিত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ।

https://nagorikpathagar.org

তদুপরি যোগ্য ও মানসম্পন্ন আলিমদের সংখ্যাও অতি নগণ্য। এসব কারণে ব্যক্তিগত বা দলীয় অথবা গোষ্ঠীগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেতনা খুব কমসংখ্যক আলিমের মধ্যে রয়েছে। তাঁরা প্রায়ই নিজের সুখ-শান্তি, উন্নতি ও ভোগবিলাস নিয়ে ব্যস্ত থাকেন; উম্মাহকে নিয়ে চিন্তা করার খুব বেশি গরজ অনুভব করেন না। দলমত-নির্বিশেষে আলিমগণ একে অপরের ভাই ও একই লক্ষ্যাভিসারী– এ কথাও তাঁরা ভুলতে বসেছেন এবং তাঁদের পারস্পরিক সহনশীলতা ও সংবেদনশীলতার অনুভূতিও অনেকটা ভোঁতা হয়ে গেছে। এ কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে তাঁদের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি ও চেতনা উজ্জীবিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

ক. উলামা সমাবেশের আয়োজন করা

আলিমদের মধ্যে ঐক্যের চেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল ও মতের আলিমদের নিয়ে ঘনঘন সমাবেশ, সেমিনার ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে। এ সভাসমূহে উম্মাহর বর্তমান অবস্থা এবং শত্রুদের নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও তৎপরতা; আলিমদের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা; উম্মাহর প্রতি তাঁদের দায়িত্ব-কর্তব্য, তাঁদের অবহেলা, নৈতিক অবক্ষয় ও দলাদলি এবং এর পরিণতিসমূহ প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করতে হবে। অধিকন্তু, অতীতে যুগে যুগে আলিমদের বিভেদ ও অনৈক্যের কারণে উম্মাহর কী কী ক্ষতি সাধিত হয়েছিল এবং নিজেরাও কী ধরনের পরিণতি ভোগ করছেন, প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে তুলে ধরতে হবে।

উম্মাহর চিন্তাশীল প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ ও বৃহত্তর ইসলামী দলগুলো এ উদ্যোগগুলো গ্রহণ করতে পারে।

খ. আলিমদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা

আমাদের সমাজে অধিকাংশ আলিম আর্থিকভাবে সচ্ছল নন; কেউ কেউ আবার দারিদ্র্যসীমার নিচেও অবস্থান করে। এ অবস্থায় যেখানে তাঁদের সদা নিজের জীবন-জীবিকা অর্জনের সংগ্রামে ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়, সেখানে এ ধরনের আলিম খুঁজে পাওয়া কঠিন, যাঁরা নিজের জীবিকা অর্জনের ব্যস্ততার পর উম্মাহর জন্য কাজ করবে, চিন্তা করবে। বরঞ্চ তাঁদের কারও কারও অবস্থা তো

https://nagorikpathagar.org

এতই দুঃখজনক যে, তারা এ জীবন-জীবিকার জন্য নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকেও বিক্রি করতে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করেন না! এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا-"অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয় হলো, দারিদ্র্য কুফর অবলম্বনের কারণ হতে পারে।"[২৬৬]

উম্মাহর চিন্তাশীল ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ, ইসলামিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বৃহত্তর ইসলামী দল ও সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনসমূহ আলিমদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য নানা স্থায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে এবং প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা করতে পারে।

গ. মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার করা

আমাদের দেশে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় দুটি ধারা চালু রয়েছে– একটি হলো কওমী ধারা, অপরটি হলো আলিয়া ধারা। এ দুটি ধারায় যারা পড়া শেষ করেন, তাদের সাধারণত আলিম বলা হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো– এ দুটি ধারার মাদরাসাসমূহে প্রচলিত সিলেবাস শেষ করে অধিকাংশ শিক্ষার্থী একজন প্রকৃত আলিম হওয়ার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না বললে অত্যুক্তি হবে না। ফলে তাদের সত্যিকার অর্থে আলিম নামে আখ্যায়িত করাও দুরূহ। আমার পর্যবেক্ষণমতে, সর্বোচ্চ দশ থেকে বিশ ভাগ শিক্ষার্থী সেই মৌলিক যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন। এদের আলিম বলতে হবে, বলাটা উচিত। তবে আমাদের সমাজে বাকি নব্বই থেকে আশি ভাগ ছাত্রও আলিম হিসেবে পরিচিত। এটা আমাদের জন্য একটা বড়ো দুর্ভাগ্য ও ফিতনার অন্যতম কারণ। আমাদের সমাজে প্রকৃত যোগ্য আলিম কয়জন আছেন– এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে বিগত শতাব্দীর প্রখ্যাত শাইখ ড. আবদুস সালাম বিন বারজিস রহ.-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যে। তিনি বলেন–

> "নিশ্চয় 'আলিম' বলে ডাকা যায়– এমন লোকের সংখ্যা খুবই অল্প। এটা অতিরঞ্জন হবে না যে, যদি বলা হয়– এমন ব্যক্তি বর্তমানে বিরল। এর কারণ হলো, একজন আলিমের কতগুলো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর বর্তমানে নিজেদের ইলমের সাথে সংযুক্তকারী অধিকাংশের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশই পাওয়া

২৬৬. কাদাঈ, *মুসনাদুশ শিহাব*, হা. নং : ৫৮৬

https://nagorikpathagar.org

যায় না। সুতরাং একজন আলিম সে নয়, যে একজন সুবক্তা; একজন আলিম সে নয়, যে একটি কিতাব সংকলন করে অথবা একটি পাণ্ডুলিপির তাহকীক করে। আর শুধু এসব কারণেই যদি কাউকে আলিম বোঝানো হয়, তাহলে আলিম নন– এমন অনেকেই আলিম হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যাবেন। আর বর্তমানে সাধারণ জনগণের অনেকেই আলিম নন– এমন লোকদের বাগ্মিতা ও লেখালেখির কাছে নিজেদের বিনম্র করেছে। সুতরাং এই বিষয়গুলো (বাগ্মী হওয়া, কিতাব সংকলন করা, পাণ্ডুলিপির তাহকীক করা ইত্যাদি) তাদের কাছে একটি বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে গেছে। সত্যিকারার্থে একজন আলিম হলেন তিনি, যিনি শারঈ ইলমের ব্যাপারে বিজ্ঞ এবং কিতাব ও সুন্নাহর হুকুম-আহকামের সাথে পরিচিত, নাসিখ-মানসূখ, মুতলাক-মুকাইয়্যাদ, মুজমাল-মুফাসসারের মতো বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত এবং যিনি সেসব ব্যাপারেও সালাফের বক্তব্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, যেসব ব্যাপারে তাঁরা মতপার্থক্য করেছেন।"[২৬৭]

কাজেই মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে কীভাবে সংস্কার করলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী যোগ্য আলিম হিসেবে গড়ে উঠবে– তা নিয়ে উম্মাহর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে ভাবতে হবে, ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বলাই বাহুল্য, যোগ্য আলিমগণ থেকেই একান্ত আশা করা যায় যে, তাঁরা উম্মাহ-চেতনা ধারণ করবেন এবং ঐক্যের জন্য কাজ করবেন; যদিও ব্যতিক্রম কিছু থাকবে।

ঘ. আলিমদের নৈতিক মান বৃদ্ধি করা

একজন আলিমকে তার ইলমী যোগ্যতার পাশাপাশি কিছু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ধারক হতে হয়। তিনি মুত্তাকী, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত, হালাল উপার্জনকারী, সৎসাহসী, সদালাপী, বিনয়ী ও চরিত্রবান হবেন এবং বিদআতী, অসৎ, প্রবৃত্তিগামী ও স্বার্থপূজারি, চাটুকার ও দাম্ভিক হবেন না ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এসব গুণ প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যেই থাকা আবশ্যক; তবে একজন আলিম যেহেতু একদিকে নবীর ওয়ারিস, অপরদিকে উম্মতের অভিভাবক, তাই তাঁর মধ্যে এসব গুণ আরও ভালোভাবেই থাকা আবশ্যক।

---

২৬৭. আবদুস সালাম, *মান হুমুল উলামা* শীর্ষক অডিয়ো ক্লিপ থেকে সংগৃহীত, সোর্স: সালাফিটক (salafitalk) ডট নেট।

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো– আমাদের মাদরাসাগুলো যোগ্য আলিম তৈরিতে যেভাবে অনেকাংশে ব্যর্থ হচ্ছে, অনুরূপভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন আলিম তৈরিতেও বহুলাংশে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের মধ্যে অবশ্যই বহু খ্যাতিমান ওয়ায়িয, সুবক্তা ও আলোচক রয়েছেন, কওমী বা আলিয়া ডিগ্রিধারী অথবা ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ও পিএইচ.ডি ডিগ্রিধারীগণ রয়েছেন কিংবা প্রখ্যাত ওয়ায়িয, লেখক ও গবেষকগণ রয়েছেন। আমরা কখনও কি ভেবে দেখেছি, কয়জনের মধ্যে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে? বাস্তব অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক।

কাজেই আমাদের মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোথায় কোথায় গলদ রয়েছে, কেন মাদরাসাগুলো থেকে মুখলিস আলিম ও দাঈ তৈরি হচ্ছে না কিংবা হলেও তাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প কেন? এসব বিষয় নিয়ে উম্মাহর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভাবতে হবে এবং এজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, আলিমগণ যোগ্য হওয়ার পাশাপাশি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন হলেই আশা করা যায় যে, তাঁরা উম্মাহ-চেতনার ধারক হবেন এবং ঐক্যের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করবেন।

চিন্তা-বিশ্বাসগত ঐক্য বা সমন্বয়

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, চিন্তা-বিশ্বাসগত দিক থেকে আমাদের দেশের আলিমগণ নানা ধারায় বিভক্ত। কেউ দেওবন্দী, কেউ সালাফী, কেউ বেরেলভী, কেউ বাতিনী সূফী, কেউ যাহিরী সূফী, কেউ জিহাদী; তাঁদের মধ্যে কেউ আবার গোঁড়া, কেউ মধ্যপন্থি, কেউ উদারপন্থি। কাজেই আলিমদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁদের হয়তো সকল গোষ্ঠীগত বিভেদ ও অনৈক্যের উর্ধ্বে উঠে অথবা সকল চিন্তা-বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অভিন্ন দ্বীনী সূত্রসমূহের ভিত্তিতে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এটি ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক শক্তিশালী ও প্রভাবশালী উপাদান। এ মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :

এক. দেশের সকল দল ও মতের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নিয়ে একটি উচ্চমানের শক্তিশালী জাতীয় উদার গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। উম্মাহর চিন্তাশীল ও সকলের নিকট মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগণ এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। এ প্রতিষ্ঠান বিশদ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে হয়তো প্রতিটি বিষয়ে এক ও অভিন্ন সিদ্ধান্ত পেশ করবে বা বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

https://nagorikpathagar.org

আমরা মনে করি, সকলকেই এ প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে কোনোরূপ ব্যতিক্রম বা বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা যাবে না। উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থে ইসলামের বিভিন্ন মত ও দলের অনুসারীদের অভিন্ন লক্ষ্যে ও অভিন্ন পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর তা হলেই আলিমদের মধ্যে বিরাজমান বিভেদ-অনৈক্য ও ঘৃণা-বিদ্বেষের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে।

দুই. অথবা তা যদি একান্তই সম্ভব না হয়, তবে সমস্ত ভেদাভেদ ও অনৈক্যের উর্ধ্বে উঠে উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে ইসলামের শাশ্বত ও নিগূঢ় অকাট্য সত্যসমূহের ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। রাসূলুল্লাহ সা. একটি হাদীসে একজন মুসলিমের ন্যূনতম পরিচয় দিয়েছেন। অন্তত সেটি যদি আমাদের আলিমগণ মেনে চলতে পারেন, তাহলে দলমতের উর্ধ্বে উঠে অনেককেই আপন করে নেওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়, অনেককেই বুকে টেনে নেওয়া সম্ভব হয়। তিনি বলেছেন–

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ.

"যে ব্যক্তি আমাদের মতো সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় আর আমাদের জবাই করা প্রাণী খায়, সে মুসলিমই; যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারিতে খিয়ানত করো না।"[২৬৮]

আলিমগণ যদি এ হাদীসে বর্ণিত মানদণ্ডকে উদারমনে গ্রহণ করে তাঁদের ভ্রাতৃত্বের গণ্ডিকে প্রশস্ত করতে পারেন, তাহলে বিভেদ ও অনৈক্য এমনিতে অনেকটা হ্রাস পাবে, ইনশাআল্লাহ। সকলকেই এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সত্যিকার মুসলিমদের কাজ হলো, যতটুকু সম্ভব অন্য মুসলিম ভাইদের কাছে টানা; পারতপক্ষে দূরে ঠেলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মুফতি মুহাম্মদ শফী [১৩১৪-১৩৯৬ হি.] রহ. বলেন–

"...যদি আমরা ইসলামের বুনিয়াদী উসূল ও মৌলনীতি সংরক্ষণ এবং নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার স্রোত মোকাবিলাকে সত্যিকার অর্থে মূল লক্ষ্য মনে করি, তাহলে এটিই সেই ঐক্যের বিন্দু, যেখানে এসে

---

২৬৮. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-কিবলাহ, হা. নং : ১/৩৮৪

https://nagorikpathagar.org

মুসলমানদের সব ফের্কা ও দল একত্র হয়ে কাজ করতে পারে আর তখনই এ স্রোতের বিপরীতে কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কার্যকর হতে পারে। কিন্তু বাস্তব অবস্থার দিকে তাকালে বলতে হয়, এই মূল লক্ষ্যটি আমাদের দৃষ্টি থেকে গায়েব হয়ে গেছে। এ কারণে আমাদের সমস্ত সামর্থ্য এবং জ্ঞান ও গবেষণার সমুদয় শক্তি নিজেদের ইখতিলাফী মাসআলায় ব্যয় হচ্ছে। ..."[২৬৯]

ভারত উপমহাদেশে আলিমগণের ঐক্যপ্রচেষ্টা

পাকিস্তান ও ভারতে আলিমদের মধ্যে সকল ভেদাভেদ ও দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার বহু নজির রয়েছে। যেমন– ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর দাপটের সময় সকল ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান 'মজলিসে মুশাওয়ারাত' নামে একটি প্ল্যাটফরমে সমবেত হয়েছিল। সে সময় তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণে তাদের তিনটি বড়ো দাবি আদায় হয়েছিল। এগুলো হলো : ক. মুসলিম পারিবারিক আইনে হস্তক্ষেপ করা যাবে না; খ. উর্দু ভাষাকে শাসনতন্ত্রে দেওয়া মর্যাদায় বহাল রাখতে হবে; গ. আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া যাবে না।

১৯৫১ সালের জানুয়ারিতে এক নাজুক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের বিভিন্ন মাসলাক ও আদর্শের ৩১ জন আলিম মিলিত হয়ে ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি রচনা করার বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উল্লেখ্য যে, ওই ৩১ জনের মধ্যে দেওবন্দী, আহলে হাদীস, জামায়াতে ইসলামী ও বেরেলভীসহ কোনো মহলই বাদ ছিল না। এমনকি তাঁদের মধ্যে ৪ জন শীআ আলিমও ছিলেন। পরবর্তীকালে এই দফাগুলোর ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে ইসলামী সংবিধান রচিত হয়। যদিও ক্ষমতাসীন চক্র বিভিন্ন অজুহাতে তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানে জেনারেল পারভেজ মোশাররফের শাসনামলে মাওলানা ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে কওমী, শাহ আহমদ নূরানীর নেতৃত্বে সুন্নী ও কাজী হুসাইন আহমদের নেতৃত্বে জামাআত নিজ নিজ মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে 'মজলিসে মুত্তাহিদে আমেলা' (এমএমএ) নামে একটি জোট গড়ে তোলেন। এ জোটটি ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় নির্বাচন করে পার্লামেন্টে বৃহত্তর বিরোধী দলে পরিণত হয়েছিল। কাজেই বোঝা যায়,

---

২৬৯. আবদুল মালিক, *উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা*, পৃ. ৯৬

https://nagorikpathagar.org

উম্মাহর বৃহত্তর প্রয়োজনে কমন ইস্যুগুলোতে এভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে কোনো বাধা নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতেও এই ধরনের ঐক্য গঠন করার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। তাই আলিমদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য না হওয়ার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ থাকতে পারে না।

বাংলাদেশেও বিভিন্ন ধারার আলিমদের মধ্যে এরূপ ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা যে একেবার হয়নি তা নয়; তবে নানা কারণে এ প্রচেষ্টাগুলো ভন্ডুল হয়ে যায়। ১৯৮১ সালে ঢাকার টিএন্ডটি কলোনি মসজিদে বিভিন্ন দল ও মতের প্রায় ৩০০ জন বিশিষ্ট আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদের একটি সম্মেলনে 'ইত্তিহাদুল উম্মাহ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এ প্রচেষ্টা বেশি দূর আগায়নি। ১৯৮৪ সালে হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বেও কয়েকটি ইসলামী দলের একটি রাজনৈতিক ঐক্যমঞ্চ গঠিত হয়। অবশ্যই এ মঞ্চ এক বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। ১৯৮৯ সালে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্য আরও কয়েকজন বিশিষ্ট আলিম মিলে সকল ইসলামী দলের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেন, তবে সে চেষ্টাও সাফল্যের মুখ দেখেনি।

১৯৯৭ সালে মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব হুজুর)-এর নেতৃত্বেও আলিমদের মধ্যে একটি বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়। তাঁর উদ্যোগে ১৭ ও ১৮ মার্চ, ১৯৯৮ সালে ঝালকাঠি সালেহিয়া মাদরাসা ময়দানে একটি সর্বদলীয় ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে তিনি তাঁর উদ্‌বোধনী ভাষণে 'ইত্তিহাদ মাআল ইখতিলাফ' (মতানৈক্যসহ ঐক্য)-এর নীতির ভিত্তিতে সকল শ্রেণির মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বীনের খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার আহ্বান জানান।[২৭০] এ সম্মেলনে গৃহীত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয় :

১. যারা বিভিন্নভাবে ইসলামের খিদমত করে যাচ্ছেন, যেমন– দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, খানকাহ ও তালীমের মাধ্যমে, রাজনীতি ও সেবাকর্মের মাধ্যমে– তাঁরা এমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করবেন না কিংবা এমন কোনো বক্তব্য বা অভিমত প্রকাশ করবেন না, যাতে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য, বিভেদ ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।

---

২৭০. গোলাম আযম, *বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টার ইতিহাস*, পৃ. ৭০

https://nagorikpathagar.org

২. তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে 'আল-ইত্তিহাদ মাআল ইখতিলাফ'-এর ভিত্তিতে নিজেদের মাঝে ইস্পাতদৃঢ় ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে ইসলামবিরোধী চক্রের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।[২৭১]

১৯৯৮ সালে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের সাবেক খতীব মাওলানা উবাইদুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিল গঠিত হয়। তিনি বিভিন্ন সময় আলিমদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছু মহলের অসহযোগিতার কারণে তাও সফল হয়নি। ৪ আগস্ট, ২০০৫ সালের জাতীয় দৈনিক সংগ্রামে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি তাঁর ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল না হওয়ার পেছনে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেন। পরে অবশ্যই এর সাথে তিনি আরও একটি যোগ করে এর কারণ মোট ছয়টি বলে উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে :

১. এক দল অপর দলকে বিদ্রুপ করা;

২. নিজের দোষ না দেখে অন্যের দোষ তালাশ করা;

৩. প্রতিপক্ষকে গালি দেওয়া ও মন্দ উপাধিতে তিরস্কার করা;

৪. নিজস্ব ধারণাবশত বিনা প্রমাণে অভিযোগ করা;

৫. আত্মগর্ব ও অহংকারবশত ধারণা করা যে, শুধু আমরাই ঠিক; অন্য সকলেই ভ্রান্ত ও ইসলামের দুশমন;

৬. কারও সাথে পরামর্শ ছাড়াই যা ইচ্ছা করে ফেলা।[২৭২]

বৃহত্তর ঐক্য গঠনের অন্তরায়সমূহ ও উত্তরণের পথ

ক. নিজেদের একান্ত হক ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের বাতিল মনে করা

আমাদের প্রত্যেকটি ধারা ও দলের আলিমদের একটি সাধারণ স্বভাব হলো– তাঁরা প্রত্যেকটি বিষয়ে নিজ নিজ ধারা ও দলের চিন্তা-বিশ্বাস ও রায়ের ওপর এত বেশি আস্থাশীল হন ও তৃপ্তি বোধ করেন যে, তাঁরা নিজ নিজ ধারা ও দলের চিন্তা-বিশ্বাস ও রায়কেই একমাত্র হক ও চূড়ান্ত মনে করেন এবং অন্য

২৭১. গোলাম আযম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

২৭২. গোলাম আযম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০-১

https://nagorikpathagar.org

ধারা ও দলের রায় ও চিন্তাগুলোকে বাতিল ও মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেন। এভাবে নিজেকে ও নিজের দলকে একমাত্র হক দাবি করা এবং ভিন্ন মতাবলম্বী আলিম ও দলকে বাতিল মনে করা একটি মারাত্মক প্রবণতা– যা একদিকে তাঁদের চরম অহংকারী ও অসহিষ্ণুতে পরিণত করছে, অপরদিকে আলিমদের মধ্যে বিভেদ-বিভাজন বৃদ্ধি করছে।

দুঃখের ব্যাপার হলো– যারা নিজেদের ভুলত্রুটি বুঝতে সক্ষম নন, তারাই মূলত ভুলত্রুটির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভুলত্রুটিকে নির্ভুল ও সঠিক মনে করে থাকেন, মতপার্থক্যের জন্ম দেন, দলাদলি শুরু করেন। খাওয়ারিজ, জাহমিয়্যাহ, মুতাযিলা, জাবরিয়্যাহ, কাদরিয়্যাহ, মুরজিয়াহ, রাফিযা, বাতিনিয়্যাহ প্রভৃতি সম্প্রদায় মূলত ভুলত্রুটিগুলোকে লালন করেই বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস লালনকারীদের সাথে মতানৈক্য ঘটিয়ে বিভিন্ন উদ্ভট মতের জন্ম দিয়েছে। তাদের অভিমতগুলো যে ভুলের ওপরই ভিত্তিশীল– তা তারা উপলব্ধি করতে না পারায় এসব ভুল থেকে ফিরে এসে তাওবার সুযোগটুকুও তারা লাভ করতে পারেনি। সারাজীবনই ভুলত্রুটির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। এরূপ ধারণা ও দাবি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

من قال : أنا في النار فهو مؤمن ، ومن قال : أنا في الجنة فهو في النار ، ومن قال : أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا

"যে ব্যক্তি (নিজের পাপ ও ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো স্মরণ করত আল্লাহ তাআলার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে) বলে যে, আমি জাহান্নামেরই উপযোগী; সে-ই প্রকৃত মুমিন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (নিজের ঈমান ও আমলের ওপর আত্মতৃপ্ত হয়ে) বলে যে, আমি জান্নাতী; সে জাহান্নামেই যাবে। আর যে ব্যক্তি (নিজের ঈমান ও আমলের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে অহংকারবশত) দাবি করে যে, আমি একজন হক্কানী, সত্যিকার মুমিন; সে প্রকৃতপক্ষে কাফিরই।"[২৭৩]

আমরা মনে করি, আমাদের দেশে ইতঃপূর্বে উল্লেখিত আলিমদের বিদ্যমান ধারাগুলোর প্রত্যেকটিরই যেমন বিশেষ অবদান রয়েছে, তেমনি প্রত্যেকের মধ্যে কমবেশি ত্রুটিবিচ্যুতিও রয়েছে। যেকোনো সত্যানুসন্ধিৎসু নিরপেক্ষ

২৭৩. তাবারী, *তাহযীবুল আছার*, হা. নং : ২০২১

https://nagorikpathagar.org

গবেষক তা নিরূপণ করতে সক্ষম হবেন; কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো– প্রত্যেকটি ধারা কিংবা দলের অনুসারী আলিমগণ সাধারণত এটা স্বীকার করতে মোটেও রাজি নন যে, তাদের মধ্যে কোনো ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে; বরং সকলের একান্ত দাবিই হলো, তাঁরাই একমাত্র হক; বাকিরা সব বাতিল ও গুমরাহ কিংবা ভুলে নিমজ্জিত। তদুপরি যেসব আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে তাঁদের মধ্যে হরহামেশা মতভেদ হতে দেখা যায়, সাধারণত সেসব আকীদা-বিশ্বাসের প্রকৃতিও এমন যে, যা তাঁদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য গড়তে অন্তরায় হওয়ার মতোও নয়।

আলিমদের একজনের বিরুদ্ধে অপরজনের দাবি ও ফাতওয়া নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক বিশিষ্ট মনীষী মনে করেন যে, আলিমদের একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনের বক্তব্য বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্য হবে না। সাইয়িদুনা ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زروبها

"তোমরা আলিমদের ইলমের কথা কান পেতে শোনো; তবে তাদের একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনের কথা বিশ্বাস করো না। কারণ, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মেষগুলো তাদের খোঁয়াড়ে একে অপরের প্রতি যেরূপ অসহিষ্ণু হয়ে থাকে, তার চেয়েও আলিমগণ পরস্পর একে অপরের প্রতি বেশি অসহিষ্ণু হন।"[২৭৪]

মালিক ইবনু দীনার [মৃ. ১৩১ হি.] রহ.-ও বলেন–

يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شئ إلا قول بعضهم في بعض

"আলিম ও কারীদের কথা প্রত্যেক বিষয়ে গ্রহণ করা যাবে; তবে তাদের একজনের বিরুদ্ধে অপরজনের কথা (বাছবিচার ছাড়া) গ্রহণ করা যাবে না।"[২৭৫]

---

২৭৪. ইবনু আদী, *আল-কামিল*, খ. ১, পৃ. ১২; সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৯; ইবনু হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১, পৃ. ২১

২৭৫. সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৯; ইবনু হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ১, পৃ. ২১

https://nagorikpathagar.org

এ কারণে পূর্ববর্তী বিশিষ্ট আলিমগণ মানবিক সীমাবদ্ধতার কারণে যেসব বিরোধে জড়িয়েছিলেন, সেই ধরনের অনেক মতবিরোধকে পরবর্তী অনেক আলিম গণনায় আনেননি। যেমন– আবূ নুআইম আল-ইস্পাহানী [৩৩৬-৪৩০ হি.] রহ. হাফিয ইবনু মান্দাহ [৩১০-৩৯৫ হি.] রহ.-এর ব্যাপারে বলেন–

اختلط في آخر عمره ... وتخبط في أماليه، ونسب إلى جماعة أقوالًا في المعتقدات لم يعرفوا بها .

"শেষ বয়সে তিনি কথাবার্তা এলোমেলো করে ফেলতেন... এবং তাঁর লেখালেখিতে তালগোল পাকিয়ে ফেলতেন। অধিকন্তু, তিনি ইতিকাদসংক্রান্ত নানা বক্তব্য এমন অনেকের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যেগুলো সম্পর্কে তাঁরা অবহিতও নন।"

আবূ নুআইম রহ.-এর এ কথা প্রসঙ্গে তাঁকে উদ্দেশ্য করে হাফিয যাহাবী [৬৮৩-৭৪৮ হি.] রহ. মন্তব্য করেন–

لا يعبأ بقولك في خصمك للعداوة المشهورة بينكما، كما لا يعبأ بقوله فيك فقد رأيت لابن منده مقالًا في الحط على أبي نعيم من أجل العقيدة أقذع فيه، وكل منهما صدوق غير متهم بحمد الله في الحديث.

"আপনাদের মধ্যকার মশহুর বৈরিতার কারণে আপনার কথাও আপনার প্রতিপক্ষের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নয়, যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তাঁর (ইবনু মান্দাহ রহ.) কথাবার্তা আপনার ব্যাপারে। আকীদাগত কারণে আবূ নুআইম রহ.-এর নিন্দায় ইবনু মান্দাহ রহ.-এর একটি বক্তব্য আমি দেখেছি। তিনি সেখানে বিশ্রী ভাষায় তাঁর সমালোচনা করেছেন। অথচ হাদীসের ক্ষেত্রে আলহামদু লিল্লাহ দুজনেই সত্যবাদী এবং কোনোরূপ অভিযুক্ত নন।"[২৭৬]

আকীদার প্রকারভেদ ও স্বরূপ

ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসগুলোকে প্রধানত দু-ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :

এক. মৌলিক ও অকাট্য আকীদাসমূহ

দুই. অপ্রধান ও যন্ননির্ভর আকীদাসমূহ

---

২৭৬. যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ. ৩, পৃ. ১৫৮; সুয়ূতী, *তাবাকাতুল হুফফায*, পৃ. ৮২

https://nagorikpathagar.org

এক. মৌলিক ও অকাট্য আকীদাসমূহ

ইসলামের সকল মৌলিক আকীদা কুরআন ও হাদীসের অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সুপ্রমাণিত।[২৭৭] এক্ষেত্রে কারও মতপার্থক্য করার সুযোগ নেই। ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো হলো– এ প্রকৃতির আকীদার অন্তর্ভুক্ত। আর এ জাতীয় বিষয়সমূহে আমাদের আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য খুব একটা নেই বললেই চলে। এ সকল মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের অস্বীকার স্পষ্ট কুফর কিংবা শিরকরূপে গণ্য। কাজেই যারা এ সকল মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস অস্বীকার বা বিকৃত করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্য না রাখা ঐক্যের ধারণার পরিপন্থি নয়। ঐক্যের প্রশ্ন তো কেবল মুসলিমদের সাথেই সম্পর্কিত; কাফির ও মুশরিকদের সাথে নয়; বরং কাফির ও মুশরিকদের সাথে অনৈক্য ও দূরত্ব রক্ষাই ঈমানের দাবি। তারা যেহেতু ভিন্ন আদর্শের, তাই তাদের সাথে মতভেদ হওয়াটাই বাস্তবসম্মত। তবে রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রয়োজনে কাফির ও মুশরিকদের সাথে সন্ধি ও সমঝোতার প্রয়োজন হলে দ্বীন ও উম্মতের স্বার্থ অক্ষত রেখে শরীয়তের নির্দেশনা অনুসারে তা হতে পারে।

দুই. অপ্রধান ও যন্ননির্ভর আকীদাসমূহ

ইসলামের এমন কিছু আকীদাও রয়েছে, যেগুলো মৌলিক আকীদার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এগুলো কোনো অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সুপ্রমাণিতও নয়। ইসলামের ব্যাখ্যানির্ভর কিংবা সত্যনিষ্ঠ আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ চিন্তা-বিশ্বাসগুলো এ প্রকৃতির আকীদার অন্তর্ভুক্ত। যেমন– রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন কি না– এ প্রসঙ্গে কেউ বলেছেন, দেখেছেন; আবার কেউ বলেছেন, দেখেননি। অনুরূপভাবে মৃতরা জীবিতদের কথা শোনে কি না? এ প্রসঙ্গে অধিকাংশের অভিমত হলো– তারা শোনে না; কারও কারও অভিমত হলো– তারা শোনে। এ ধরনের আকীদার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের অন্তরায় নয়।

শাইখ ইবনু সালিহ আল-উছাইমীন [মৃ. ১৪২১ হি.] রহ. বলেন–

... حتى إنهم كانوا يختلفون في مسائل كبيرة، وفي مسائل عقدية، وعملية..

ومع ذلك لا يضلل بعضهم بعضاً.

---

২৭৭. ইসলামের মৌলিক আকীদাগুলো কী কী– এ প্রসঙ্গে আলোচনা পরে আসছে।

https://nagorikpathagar.org

"...এমনকি তাঁরা (সালাফ) তো বড়ো বড়ো বিষয় নিয়েও তো মতভেদ করেছেন, বিশ্বাসগত ও ব্যবহারগত বিষয়গুলো নিয়ে মতভেদ করেছেন। ...এতৎসত্ত্বেও তাঁরা তো একজন অন্যজনকে গুমরাহ বলেননি।"[২৭৮]

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো– আকীদার এ সকল শাখাগত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে অতীতেও এ জাতীয় আলিমদের নানা দল-উপদলে বিভক্ত করেছে, বর্তমানেও এ বিষয়গুলোই তাঁদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করে চলেছে।

খ. শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান

যেসব কারণে একটি সমাজে অশান্তি ও বিভেদ সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মনে করা, আত্মগুণাভিমান। এটি অত্যন্ত নিকৃষ্টতম ও ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি। বস্তুত এ শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যবোধের কারণেই সমাজের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও মানামানি উঠে যায়। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. তিনটি ধ্বংসাত্মক বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ "-(একটি ধ্বংসাত্মক বিষয় হলো,) নিজেকে নিজে বুযুর্গ ও শ্রেষ্ঠ মনে করা। এটা সর্বাপেক্ষা জঘন্য।"[২৭৯] অথচ শরীয়তের নির্দেশ হলো, প্রত্যেকেই অপরকে– ছোটো হোক বা বড়ো– ভালো নজরে দেখবে।

অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার হলো– এ মারাত্মক ব্যাধিটি এখন আমাদের আলিমদের ব্যাপকভাবে গ্রাস করেছে। তাঁদের একটি সাধারণ চরিত্র হলো, তাঁদের অনেকেই কথার্বাতায় ও বেশভূষায় নিজেদের শ্রেষ্ঠ আলিম ও ফকীহ হিসেবে জাহির করতে পছন্দ করেন এবং অন্য আলিমদের জ্ঞানের স্বীকৃতি দিতে রাজি হন না; বরং তাদের তুচ্ছ করে উপহাস করেন। ইলমের এরূপ অহমিকা ও আত্মতুষ্টি একটি অতীব ঘৃণ্য চরিত্র। এটি একজন আলিমকে চরম অহংকারী ও অসহিষ্ণুতে পরিণত করে, অপরদিকে তাঁদের মধ্যে বিভেদ-বিভাজন বৃদ্ধি করে। এর পরিণতিও ভয়াবহ।

---

২৭৮. উছাইমীন, *লিকাউল বাবিল মাফতূহ*, খ. ৫৭, পৃ. ১৫

২৭৯. বাইহাকী, *শুআবুল ঈমান*, হা. নং : ৬৮৬৫; এ হাদীসটি হাসান। এ অর্থে বিভিন্ন সূত্রে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়ে এসেছে।

https://nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

..ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا من أفقه منا من أعلم منا ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير قالوا: لاَ ، قال أولئك منكم من هذه الأمة فأولئك هم وقود النار.

"...অতঃপর এমন কিছু লোকদের উদ্ভব ঘটবে, যারা কুরআন পড়বে, কুরআনের জ্ঞান লাভ করবে। তারা এভাবে দম্ভোক্তি করবে যে, আমাদের চেয়ে বড়ো কারী কে আছে? আমাদের চেয়ে বড়ো ফকীহ আর কে আছে? কে আছে আমাদের চেয়ে বড়ো আলিম?! রাসূল সা. সাহাবীগণ থেকে জিজ্ঞেস করলেন– 'এ জাতীয় লোকদের মধ্যে কি কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে?' তাঁরা জবাব দিলেন– 'না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারা এসব লোক?' তিনি জবাব দিলেন– 'তারা এ উম্মতের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকেই জন্ম নেবে। এসব লোক হলো জাহান্নামের ইন্ধন।'"[২৮০]

সাইয়িদুনা উমার রা. বলেন–

إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه ، ومن قال : أنا عالم فهو جاهل.

"আমি তোমাদের বেলায় যে বিষয়ের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা আশঙ্কা বোধ করছি, তা হলো– ব্যক্তির নিজের চিন্তা ও রায়ের ওপর আত্মতুষ্টি। (মনে রেখো,) যে ব্যক্তি নিজেকে আলিম বলে দাবি করবে, সে প্রকৃতই জাহিল (মূর্খ)।"[২৮১]

উল্লেখ্য যে, মর্যাদাগত দিক থেকে আলিমদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় এবং প্রত্যেক শ্রেণির সাথে কিছু বিশিষ্ট আচরণ রয়েছে।

এক. যে সকল আলিমকে বয়সে বড়ো কিংবা জ্ঞানেগুণে বা দ্বীনদারীতে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। এ শ্রেণির আলিমদের সাথে যখন দেখাসাক্ষাৎ হবে, তখন তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বকে অকপটে স্বীকার করে নেওয়া এবং তাঁদের যথাযথ ইজ্জত-সম্মান করা উচিত।

---

২৮০. তাবারানী, *আলমুজামুল আওসাত*, হা. নং : ৬২৪২; হাদীসটি *মুসনাদু আবী ইয়ালা* ও *মুসনাদুল বাযযার* প্রভৃতি গ্রন্থেও রয়েছে। হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে দুর্বল; তবে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়ে এসেছে।

২৮১. ইবনু হাজার, *আল-মাতালিবুল আলিয়াহ*, হা. নং : ৩০৭৯

https://nagorikpathagar.org

দুই. যে সকল আলিমকে বয়সে কিংবা জ্ঞানে-গুণে নিজের সমপর্যায়ের ভাবা হয়, তাদেরও সম্মান করা উচিত। কেননা, হতে পারে যে, তাঁরা এমন কিছু গুণের অধিকারী, যা সে জানে না। অপরদিকে সে নিজে তো নিজের যোগ্যতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকে। তাই নিজের দুর্বলতার দিকে নজর করে এ শ্রেণির আলিমদেরও বড়ো ভাবা ও সম্মান করা উচিত।

তিন. যে সকল আলিম নিজের চেয়ে বয়সে ছোটো। এ সকল আলিমকে যেমন দয়া ও স্নেহের নজরে দেখা উচিত, তেমনি নিজের এ দুর্বলতার কথাও অকপটে স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন যে, তাদের গুনাহ আমার থেকে অনেক কম। কেননা, আমি তো দুনিয়ায় তাদের আগেই এসেছি এবং তারা শরীয়তের বিধিনিষেধের আদিষ্ট হওয়ার আগে না জানি আমি কত গুনাহেই লিপ্ত হয়েছি! যদি এমন কোনো লোকের সাক্ষাৎ হয় যে, যার দ্বীনদারী খুব কম এবং তার ব্যাপারে ব্যাখ্যার অবকাশও কম থাকে, তাহলে সে নিজের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে যে সকল ইবাদাত ও ভালো কাজ করার তাওফীক লাভ করেছে, সেগুলোর জন্য আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করবে। অধিকন্তু, সে এ অবস্থায় আল্লাহর নিকট তার পরিসমাপ্তি কামনা করবে। কেননা, সে কি এ কথা জানে যে, কোন অবস্থায় তার পরিসমাপ্তি ঘটবে?

সুতরাং কোনো অবস্থাতেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও বুযুর্গ ভাবা এবং কথাবার্তায়, আচার-আচরণে ও বেশভূষায় এরূপ কিছু প্রদর্শন করা মোটেই সমীচীন নয়। এ কারণে যে ধরনের পোশাক পরলে বা বেশভূষা ধারণ করলে গৌরব ও শাইখীভাব প্রকাশ পায়, নিজেকে পদস্থ ব্যক্তি বলে মনে হয় অথবা নিজেকে বুযুর্গ ব্যক্তি বলে ধারণা হয়, সে ধরনের পোশাক পরা ও বেশভূষা ধারণ করা জায়িয নয়। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

"যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

এরপর তিনি এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে অহংকারের ব্যাখ্যা প্রদান করেন এভাবে-الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.-"অহংকার বলতে বোঝায় সত্যকে অস্বীকার করা এবং লোকদের তুচ্ছজ্ঞান করা।"[২৮২]

---

২৮২. মুসলিম, *আস-সহীহ*, কিতাবুল ঈমান, হা. নং : ২৭৫

https://nagorikpathagar.org

গ. পারস্পরিক খিদমতের স্বীকৃতির অভাব

আমাদের আলিমদের মধ্যে একেকজন একেক ধরনের দ্বীনী খিদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। অনেকেই মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন, তাদের মধ্যে কেউ আলিয়া মাদরাসাগুলোতে, আবার কেউ কওমী মাদরাসাগুলোতে শিক্ষকতা করেন; অনেকেই মসজিদগুলোতে ইমামত ও খিতাবতের দায়িত্ব পালন করেন; অনেকেই দাওয়াত-তাবলীগের ময়দানে মেহনত করেন; অনেকেই মাঠে-ময়দানে ওয়ায করেন; অনেকেই খানকাহগুলোতে ইসলাহ ও ইরশাদের কাজ করেন; অনেকেই রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কাজ করেন; অনেকেই লেখালেখি ও গবেষণায় নিমগ্ন সময় ব্যয় করেন, ...। আমরা মনে করি, এসবই দ্বীনের একেকটি বড়ো বড়ো খিদমত। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো– সাধারণত যারা যে ধরনের খিদমতে নিয়োজিত আছেন, তাঁরা সেই খিদমতের গুরুত্বটা যেভাবে অনুধাবন করেন, এতটা অন্যান্য খিদমতের ব্যাপারে অনুধাবন করেন না। প্রায় আলিমই নিজের খিদমতকে দ্বীনের একান্ত শ্রেষ্ঠ খিদমতরূপে গণ্য করেন এবং অন্যদের খিদমতগুলোকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। অথচ সকলের খিদমতের গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি না করলে দ্বীনের খাদেমদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত ও ঐক্যবোধ সৃষ্টি হতে পারে না।

আমরা মনে করি, এরূপ মনোভাবের প্রধান কারণ হলো– জ্ঞানের স্বল্পতা ও প্রান্তিক মনোবৃত্তি। কাজেই এ সমস্যা নিরসনের জন্য উম্মাহর চিন্তাশীল বিজ্ঞ আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন অঙ্গনে খিদমতরত আলিমদের নিয়ে ঘন-ঘন উলামা সমাবেশ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে পারেন।

ঘ. নেতৃত্বের পদ

বিভিন্ন ধারা ও দলের আলিমগণ যেসব কারণে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন না, তন্মধ্যে একটি মৌলিক কারণ হলো– নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল বা সকলের নেতা হওয়ার খাহেশ। আমার কিংবা আমার পছন্দের কারও নেতৃত্ব যাতে ছুটে না যায় অথবা আমার বা আমার দলের লোকদের নেতৃত্ব লাভের পথ যাতে খোলা থাকে, সে কারণে অনেকেই মতভেদ তৈরি করে এবং দলাদলি জিইয়ে রাখে। মতপার্থক্য ও বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার উর্ধ্বে উঠলে তো দলাদলি থাকে না, তাহলে আমার মাতব্বরির কী হবে– এ চিন্তা অনেককে ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

https://nagorikpathagar.org

বস্তুতপক্ষে আমি বা আমার পছন্দের কেউ আমার দলে বা জোটে যে পদটি অলংকৃত করে আছি, এ পদটিতে আমাকে কিংবা আমার পছন্দের দলমতের কাউকে থাকতেই হবে– এটি একটি শয়তানী চিন্তা, ইবলিসী উসকানি। আপনার বা আপনার দলমতের বাইরের কেউ তো দ্বীনকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে আপনাদের চেয়েও আরও ভালো ভূমিকা রাখতে পারেন– এ সম্ভাবনা তো থাকে; কিন্তু অনেকেই তা মেনে নিতে চান না। অধিকন্তু, ইসলামের দৃষ্টিতে সাধারণত পদ চেয়ে নেওয়াও যে একটি অপরাধ– সেই কথা তাঁরা বেমালুম ভুলে যান।

আবার তাঁদের অনেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা ও বড়াই এতই প্রবল যে, তারা সহজে একে অপরের যোগ্যতাকে স্বীকার করে নিতে চান না, নেতারূপে মেনে নিতে প্রস্তুত হন না। প্রত্যেকেই নিজেকে কিংবা নিজের দলের কাউকে নেতৃত্বের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য ভাবেন, নিজেই নেতা হতে চান এবং এ কথা ভেবে দেখারও গরজ অনুভব করেন না যে, নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা তার বা তার দলের লোকদের কতটুকু রয়েছে। আর কেউ তো আছেন, তিনি আজীবন নেতা হিসেবেই থাকতে চান। বস্তুতপক্ষে আমি সবচেয়ে যোগ্য, আমিই সবচেয়ে বেশি জানি– এমনটি বাজে ধারণা অনেককেই বিপথে তাড়িত করে। এ কারণে অন্য কারও মতের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ লোপ পায়, অন্যের মতকে সারশূন্য জ্ঞান করা শুরু করে। আর নিজের মনে ঘুরপাক খাওয়া মতকেই সর্বোৎকৃষ্ট ধারণা করে, গোঁ ধরে বসে থাকে– যা তাকে অন্যদের মতামতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অন্যদের সাথে অহেতুক ও ভিত্তিহীন মতপার্থক্য করার পথে ঠেলে দেয়।

দুঃখের ব্যাপার হলো– এ সমস্যার সমাধান খুব সহজে সম্ভব নয়, যদি তাঁদের মধ্যে তাকওয়া ও ইখলাসের কমতি থাকে। এ কারণে এর সমাধান এভাবে করা যায়, যাতে নেতৃত্ব নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনোরূপ সমস্যা সৃষ্টি না হয়, সে লক্ষ্যে সভাপতি ও সেক্রেটারি ইত্যাদি পদের পরিবর্তে মজলিসে সাদারাত (সভাপতিমণ্ডলী) ও সেক্রেটারিয়েট গঠন করা যেতে পারে এবং সেখানে প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে একেকজন করে সদস্য থাকবে। মজলিসে সাদারাতের সদস্যগণের সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করার জন্য এক বছর একেকজনকে মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

https://nagorikpathagar.org

বৃহত্তর ঐক্যের ভিত্তি

আলিমদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্যের প্রশ্ন আসার পর অনেকেই চিন্তা করেন, ঐক্যের ভিত্তিটা হবে কী? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি– তিনটি বিষয় ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এগুলো হলো– মৌলিক আকীদার ঐক্য, মৌলিক আমলের ঐক্য ও মৌলিক দলীলের ঐক্য।

ক. মৌলিক আকীদা :

১. আল্লাহ তাআলাকে তাঁর সমস্ত নাম ও গুণসহ একমাত্র সত্যিকার ইলাহরূপে মেনে নেওয়া। এক্ষেত্রে সালাফে সালিহীন ও সর্বসমাদৃত ইমাম চতুষ্টয়ের অনুসৃত চিন্তা গ্রহণ করাটা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং সকলের ঐক্যের জন্য সহায়ক।

২. ফেরেশতাকুলের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস রাখা।

৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং কুরআনকে শেষ কিতাব হিসাবে মান্য করা।

৪. সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং মুহাম্মাদ সা.-কে শেষ নবী হিসেবে মান্য করা।

৫. আখিরাতে পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি বিশ্বাস রাখা।

৬. তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

উপর্যুক্ত সকল বিষয় ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। রাসূলুল্লাহ সা. একটি হাদীসে ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন–

(الإيمان هو:) أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

"ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা এবং তাকদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করা।"[২৮৩]

২৮৩. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, হা. নং : ১০২

https://nagorikpathagar.org

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে যেকোনো একটির সাথেও যে ব্যক্তি বা যে দল ঐকমত্য পোষণ করতে পারবে না, সে মুসলিম থাকবে না। মুসলিম না হলে তাদের সাথে ঐক্যের কোনো প্রশ্নও আসবে না। যেমন– কাদিয়ানী গ্রুপ। এরা মুহাম্মাদ সা.-কে সর্বশেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করে না।

খ. মৌলিক আমল :

১. তাওহীদ ও রিসালাতের ঘোষণাদান।

২. সালাত কায়েম করা।

৩. সামর্থ্যবান হলে প্রতিবছর যাকাত আদায় করা।

৪. সামর্থ্যবান হলে হজ পালন করা।

৫. মাহে রামাদানে সাওম পালন করা।

এ পাঁচটি আমল হলো ইসলামের বুনিয়াদ। রাসূলুল্লাহ সা. একটি হাদীসে ইসলামের মৌলিক আমলগুলোর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন–

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

"ইসলামের ভিত্তি রচিত হয় পাঁচটি বিষয়ের ওপর। এগুলো হলো এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. হলেন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল; সালাত কায়েম করা; যাকাত আদায় করা, বাইতুল্লাহর হজ করা ও রামাদানে সাওম পালন করা।"[২৮৪]

উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি বা যে দল এ পাঁচটি আমল ফরয হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করবে না বা এগুলো নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে, সে আর মুসলিম থাকবে না।

গ. মৌলিক উৎস : কুরআন ও হাদীস

সকল মুসলিমকেই যেকোনো সমস্যা সমাধানে এই দুটির শরণাপন্ন হতে হবে। তবে এগুলোতে স্পষ্ট সমাধান পাওয়া না গেলে পরবর্তী কার্যপ্রণালি হিসেবে

---

২৮৪. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, হা. নং : ৮; মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, হা. নং : ১২২ (মাতন : সাহীহ মুসলিম)

https://nagorikpathagar.org

উম্মতের প্রথম সারির বিজ্ঞজনদের সম্মিলিত মতামত এবং সম্মিলিত মতামত না পাওয়া গেলে কুরআন-হাদীসের অনুরূপ বিধান থেকে গৃহীত কিয়াসও দলীল হিসেবে বিবেচিত হবে।

এ উৎসগুলোর ব্যাপারে কথা হলো– যদি কেউ কুরআন ও মুতাওয়াতির (অর্থাৎ অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিশুদ্ধ) হাদীসকে দলীল হিসেবে অস্বীকার করে, তবে সে মুসলিম থাকবে না। তবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়– এরূপ হাদীসকে যদি কেউ অস্বীকার করে, অনুরূপভাবে কেউ ইজমা বা কিয়াসকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফির হবে না। বিজ্ঞ ইমামগণের মধ্যে কেউ কেউ তো ইজমার বাস্তব অস্তিত্বও অস্বীকার করেছেন। ইমাম আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا"-যে ব্যক্তি ইজমার দাবি করল, বস্তুতপক্ষে সে মিথ্যাচার করল। কারণ, হয়তো লোকেরা মতবিরোধ করেছে, (যা সে জানতে পারেনি)।[২৮৫]

আকীদাগত ভ্রান্তি কি বৃহত্তর ঐক্যের অন্তরায়

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, মর্ম কিংবা প্রামাণিকতার দিক থেকে অকাট্য নয় কিংবা দ্বীন ও শরীয়তের যে বিষয়গুলো সর্বজনজ্ঞাত নয়– এ জাতীয় আকীদা-বিশ্বাস আলিমদের বৃহত্তর একতার সামনে কোনো অন্তরায় হতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, সাহাবী ও তাবিঈগণ আকীদাবিষয়ক মতভেদকে অত্যন্ত নিন্দনীয় জানা সত্ত্বেও এতৎসংক্রান্ত নানা বিষয়ে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিতদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যবোধের চেতনা লালন করতেন। ইসলামের ইতিহাসে খারিজীরা ছিল একটি প্রধান ভ্রান্ত ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়। তারা সাহাবা কিরাম রা.-কে অত্যন্ত খোঁড়া ও অমূলক যুক্তি দিয়ে কাফির ফাতওয়া দিত এবং তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও তাঁদের হত্যা করা বৈধ মনে করত। পক্ষান্তরে সাহাবা কিরাম রা. তাদের কাফির আখ্যায়িত করা এবং যুদ্ধক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র তাদের হত্যা করা থেকে বিরত থেকেছেন। তাঁরা তাদের ঈমান, আমল ও আবেগের যথাসম্ভব মূল্যায়ন করেছেন।

---

২৮৫. যারকাশী, *আল-বাহরুল মুহীত*, খ. ৩, পৃ. ৪৮৯; ইবনু আমীরিল হাজ্জ, *আত-তাকরীর ...*, খ. ৩, পৃ. ১১০

https://nagorikpathagar.org

সাইয়িদুনা আলী রা.-কে খারিজীদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, أكُفَّارٌ هُم؟-'এরা কি কাফির?' তিনি বললেন, مِنَ الكُفْرِ فَرُّوا-'এরা তো কুফরি থেকেই বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে।' এরপর জিজ্ঞেস করা হলো: أفَمُنَافِقُونَ هُمْ؟-'তাহলে তারা কি মুনাফিক?' তিনি বললেন, إنَّ المُنَافِقِينَ لا يذكُرُونَ الله إلا قليلاً . وهؤلاء يذكُرُون الله بُكْرَةً وأصِيلاً-'মুনাফিকরা খুব কমই আল্লাহ তাআলার যিকর করে। আর এরা তো সকাল-বিকাল আল্লাহ তাআলার যিকর করে থাকে।' এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, ؟ ما هُمْ-'তাহলে তারা কী?' তিনি উত্তরে বললেন, قومٌ أصابَتْهُم فِتنَةٌ فَعَمُوا فيها وصَمُّوا .-'তারা হলো এমন একটি সম্প্রদায়, যারা ফিতনার মধ্যে জড়িত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে।'[২৮৬]

অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. ও অন্য সাহাবীগণও তাদের ব্যাপারে এরূপ মত পোষণ করেন। অধিকন্তু, সাহাবা কিরাম রা. যুদ্ধের ময়দানের বাইরে তাদের পেছনে সালাত আদায়সহ অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন।

বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা.-সহ অনেক সাহাবীই নাজদাহ আল-হারূরীর পেছনে সালাত আদায় করতেন এবং তাঁরা খারিজীদের সাথে মুসলমানদের মতোই পরস্পর কথাবার্তা বলতেন, আলাপ করতেন।[২৮৭] আরও বর্ণিত আছে, সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. প্রসিদ্ধ খারিজী নেতা নাজদাহ আল-হারূরীর নানা প্রশ্নের জবাব দেন;[২৮৮] অধিকন্তু তিনি ও অপর খারিজী নেতা নাফি ইবনুল আযরাক দুজনই দুজন মুসলিমের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মতোই একে অপরের সাথে আলাপ করেন এবং দুজনই কুরআনের মাধ্যমে একে অপরের কথা খণ্ডন করেন।[২৮৯]

---

২৮৬. আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা. নং : ১৮৬৫৬; ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াহ ফী গরীবিল হাদীস..*, খ. ৩, পৃ. ৩৭০

২৮৭. আসিমী, *আলু রাসূলিল্লাহ সা. ওয়া আউলিয়াউহু*, পৃ. ১৫৪

২৮৮. মুসলিম, *আস-সহীহ*, হা. নং : ৪৭৮৭-৪৭৯২

২৮৯. তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, আহাদীসু আবদিল্লাহ ইবনি আব্বাস রা., হা. নং : ১০৫৯৭

https://nagorikpathagar.org

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবূ সুলাইমান আল-খাত্তাবী [৩১৯-৩৮৮ হি.] রহ. বলেন–

قد أجْمَعَ عُلماءُ المسلمين على أن الخَوارِجَ على ضَلالَتِهِم فرقةٌ من فِرق المُسلمين وأجازُوا مُنَاكَحَتهم وأكْلَ ذَبَائحهم وقَبولَ شَهادَتهم وانهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام .

"সকল আলিমই এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, খারিজীদের নানা গুমরাহী সত্ত্বেও তারা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত একটি দল। তাদের সাথে বিয়েশাদি, তাদের জবাইকৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ প্রভৃতি জায়িয বলে আলিমগণ মত দিয়েছেন। তাদের কাফির বলে আখ্যায়িত করা যাবে না, যে যাবৎ তারা ইসলামের মূলভিত্তিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।"[২৯০]

কাজেই বোঝা যায়, ইসলামের মৌলিক ভিত্তিসমূহের ওপর অটল রয়েছে– এমন প্রত্যেকটি দল ও মতের লোকদের সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং তাদের নিয়ে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে কোনো অসুবিধা নেই, যদিও তারা আকীদা ও আমলগত নানারূপ বিদআতে নিমজ্জিত হয়।

বর্তমানে উম্মতের মধ্যে অসংখ্য দল ও মত গড়ে উঠেছে, আবার প্রত্যেকটি দল ও মতের অনুসারীরা নিজেদের একান্ত হক ও অন্যদের বাতিল বা ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করছে। বাহ্য দৃষ্টিতে অবস্থা এতটা শোচনীয় যে, পরস্পর একদল অপর দলের বিরুদ্ধে ফাতওয়া ও বিষোদ্‌গারের কারণে উম্মতের মধ্যে কোন দলটি হক, আর কোন দলটি ভ্রান্ত– তা নিরূপণ করা সত্যিই কঠিন ও জটিল হয়ে পড়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থে কমন ইস্যুগুলোতে বিভিন্ন দল ও মতের অনুসারীরা একই প্ল্যাটফরমে আসতে না পারে এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তাহলে অচিরেই এ উম্মত আরও ক্ষতির সম্মুখীন হবে, বিশ্বকে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মানসম্মান যা কিছু এখনও বাকি আছে, তাও ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমরা আমাদের সালাফে সালিহীনকে বরাবরই লক্ষ করেছি যে, ভ্রান্ত দলগুলোর চরম বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাঁরা সর্বাপেক্ষা বেশি উদারতা প্রদর্শন

২৯০. ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াহ ফী গরীবিল হাদীস..*, খ. ৩, পৃ. ৩৭০; ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ. ১২, পৃ. ৩০০; যারকানী, *শারহুল মুওয়াত্তা*, খ. ২, পৃ. ২৭-৮

https://nagorikpathagar.org

করেছেন এবং ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা নানা বিষয়ে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিতদের প্রতি যথাসাধ্য ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যবোধের চেতনা লালন করতেন।

আমরা দেখতে পাই যে, খারিজীসহ বিভিন্ন ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের সূত্রে বর্ণিত রয়েছে– এ ধরনের বহু হাদীস উম্মতের বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেছেন। যেমন : খারিজী নেতা ইমরান ইবনু হিত্তান [মৃ. ৮৪ হি.] রহ.– যিনি সাইয়িদুনা আলী রা.-এর হত্যাকারীর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন[২৯১]– তাঁর সূত্রে বর্ণিত দুটি হাদীস ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহতে (হা. নং : ৫৪৯৭ ও ৫৬০৮) উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে খারিজী মতাবলম্বী দাউদ ইবনুল হুসাইন [মৃ. ১৩৫ হি.] রহ.– যাঁর প্রতি কাদরিয়া মতাবলম্বনের অভিযোগও রয়েছে[২৯২]– তাঁর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহতে (হা. নং : ২০৭৪) এবং ইমাম মুসলিম (রাহ) তিনটি হাদীস তাঁর সহীহতে (হা. নং : ১৩১৮, ৩৯৭৩, ৪০১৬) উল্লেখ করেছেন। ভ্রান্ত মতাবলম্বী বিদআতীদের হাদীস গ্রহণ প্রসঙ্গে হাফিয ইবনু হাজার রহ. বলেন–

والتحقيقُ أنه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ ببدعةٍ؛ لأن كلَّ طائفةٍ تدعي أن مخالفيها مبتدعةٌ، وقد تُبالغ فتكفِّر مخالفيها، فلو أُخِذَ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميعِ الطوائفِ. فالمعتمد أن الذي تُرَدُّ روايته مَن أنكر أمراً متواتراً مِن الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا مَن اعتقدَ عكسَهُ، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضَبْطُهُ لِما يرويه، مع ورعه وتقواه، فلا مانع مِن قبوله.

"এ প্রসঙ্গে যথার্থ কথা হলো, কোনো বিদআতের কারণে তাকফীর করা হয়ে থাকে– এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা হবে না। কেননা, উম্মতের প্রত্যেকটি দল তো তার প্রতিপক্ষ দলগুলোকে বিদআতী বলে আখ্যায়িত করে থাকে, আবার কখনও

---

২৯১. ইবনু হাজার, *নুযহাতুন নাযার ...*, পৃ. ২৬৭; বাদরুদ্দীন, *আন-নুকাত আলা মুকাদ্দামাতি ইবনিস সালাহ*, খ. ৩, পৃ. ৪০০

২৯২. ইবনু হিব্বান, *আছ-ছিকাত*, খ. ৬, পৃ. ২৮৪, রা. নং : ৭৭৪৮; যাহাবী, *মীযানুল ইতিদাল*, খ. ৩, পৃ. ১০

https://nagorikpathagar.org

অতিরঞ্জন করে তাদের তাকফীরও করে থাকে। কাজেই তাদের এ দাবিগুলোকে যদি সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তো উম্মতের সকল দলের তাকফীর সাব্যস্ত হবে। (অর্থাৎ, এরূপ হলে তো দুনিয়াতে মুমিন বলতে আর কেউ রইল না)। সুতরাং এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কথা হলো– সেই ব্যক্তির রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যান করা হবে, যে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহুলভাবে বর্ণিত ও সর্বজনজ্ঞাত দ্বীন ও শরীয়তের কোনো বিষয়কে অস্বীকার করবে কিংবা এর বিপরীত আকীদা পোষণ করবে। কাজেই যে ব্যক্তি এরূপ নন, তদুপরি তিনি যদি তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো স্মৃতিতে নির্ভুলভাবে ধারণ করে রাখেন এবং এর সাথে তিনি পরহেযগার ও আল্লাহভীরু হন, তাহলে তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই।"[২৯৩]

ইমাম আবূ দাউদ রহ. তো এতটুকু বলেছেন যে, إنه ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج-"প্রবৃত্তিপূজারি বিদআতীদের মধ্যে খারিজীদের চেয়ে অধিকতর সহীহ হাদীস বর্ণনাকারী আর কেউ নেই।" এরপর তিনি ইমরান ইবনু হিত্তান ও আবূ হাসসান আল-আরাজ রহ. প্রমুখের কথা তুলে ধরলেন।[২৯৪] বিশিষ্ট হাদীসগবেষক হাতিম ইবনু আযিফ রহ. বলেন–

أننا عرفنا من أهل السنّة والجماعة أنهم أكثر الناس إنصافاً واعتدالاً، فهذا البخاري يروي عن عمران بن حطّان –الخارجي الداعية–، لكن لما عرف صدقه روى عنه، ويروي عن من رُمي بالقدر، ويروي عن المرجي، وعن الشيعي، بل حتى عن الرافضي

"আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি, তাঁরা অধিকতর ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণকারী। এই তো ইমাম বুখারী রহ. খারিজী নেতা ইমরান ইবনু হাত্তান রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর সততা সম্পর্কে জানতে পেরে তাঁর

২৯৩. ইবনু হাজার, *নুযহাতুন নাযার*, পৃ. ১২৭; সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাভী*, খ. ১, পৃ. ৩২৪

২৯৪. যাহাবী, *মীযানুল ইতিদাল*, খ. ৩, পৃ. ২৩৬; সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাভী*, খ. ১, পৃ. ৩২৬

https://nagorikpathagar.org

কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এভাবে তিনি এমন অনেক ব্যক্তি থেকেও হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের প্রতি কাদরিয়ার মতাবলম্বনের অভিযোগ রয়েছে। অধিকন্তু, তিনি মুরজী ও শীআ, এমনকি রাফিযী থেকেও হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।"[২৯৫]

মাযহাবী ঐক্য বা সমন্বয়

ইতঃপূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ফিকহী বিষয়গুলোকে নিয়ে পরস্পর বিবাদে জড়ানো, কট্টরতা দেখানো ও দলাদলি করা সমীচীন নয়। কারণ, এ জাতীয় বিষয়গুলোতে মতপার্থক্যের কারণ দলীলগুলো হয় দ্ব্যর্থক কিংবা অস্পষ্ট, ব্যাখ্যানির্ভর অথবা সাংঘর্ষিক। ফলে এসব দলীলের মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় অথবা আবার কখনও হাদীসের বাহ্যিক দ্বন্দ্ব কিংবা প্রামাণিকতার ধরনের ভিন্নতায়ও আলিমদের মধ্যে মতভিন্নতার সৃষ্টি হয়। আবার কখনও দলীলসংক্রান্ত অজ্ঞতা বা ভুল বোঝাবুঝির কারণেও এ মতপার্থক্য হতে পারে।[২৯৬]

আমাদের সালাফে সালিহীন (পূর্বসূরি) ও মুজতাহিদ ইমামগণ দ্বীনের গবেষণাধর্মী শাখাগত মাসআলাসমূহে মতপার্থক্য করেছেন। তবে তাঁদের সে মতপার্থক্যে কোনো প্রকারের জিদ, হঠকারিতা ও গোঁড়ামির স্থান ছিল না। তাঁদের মতবিরোধ তাঁদের মধ্যে অন্তরের সামান্যতম দূরত্বও তৈরি করেনি, তাঁদের নানা দলে-উপদলে বিভক্তও করেনি। বরং এ মতপার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। পরমতসহিষ্ণুতা ছিল তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাজেই বলা যায়– ফিকহী মতপার্থক্য আলিমদের বৃহত্তর ঐক্যের জন্য কোনো অন্তরায়ই নয়। এরূপ মতপার্থক্যের মধ্যেও বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলা যায়। আমরা ১ম অধ্যায়ে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য সত্ত্বেও ইমামগণের মধ্যকার সম্প্রীতির কথা তুলে ধরেছি।

উল্লেখ্য যে, শাইখ ইবনু বায, শাইখ ইবনু উছাইমীন ও শাইখ আলবানী রহ.-এর মধ্যকার মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোকে নিয়ে রচিত ও দুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থ 'الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز'। গ্রন্থটি সৌদি

---

২৯৫. হাতিম, *আত-তাখরীজ ওয়াল আসানীদ*, পৃ. ৯৬

২৯৬. আমি আমার *তুলনামূলক ফিকহ* ১ম খণ্ড-এর ২য় অধ্যায়ে ফিকহী মতানৈক্যের কারণগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আগ্রহী পাঠকগণ তা অধ্যয়ন করতে পারেন।

https://nagorikpathagar.org

আরব থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এর শুরুতে সেখানকার বড়ো বড়ো শাইখ ভূমিকা লিখেছেন। তাঁদের সকলের অভিমত হলো– শাখাগত বিষয়সমূহে যে মতভেদ, তা সহনীয়। এর ভিত্তিতে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। এ ধরনের মতভেদের পরও ঐক্য ও সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে প্রত্যেককে অন্য একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) ও তানভী (কাজের রকমফের) এক নয়। এরূপ বহু আমল আছে– যা কয়েক রকমভাবে করলেও চলে। বরং কখনও এ রকম, আর কখনও ওই রকমভাবে আমল করাই সুন্নাত। আমলের এ রকমফের কিন্তু আসলে মতভেদের কারণ নয়। বরং তা উম্মাহর জন্য সহজ ও প্রশস্ত করার লক্ষ্যে শরীয়ত মৌলিকভাবেই এমন একাধিক প্রকারের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছে। আসলে এ তানভীই হলো উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ। বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু আবী কাইস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

> "একবার আমি আয়িশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সা. সালাতুল বিতর প্রথম রাতে পড়তেন, নাকি শেষ রাতে? তিনি জবাব দিলেন, তিনি [রাসূলুল্লাহ সা.] কখনও প্রথম রাতে পড়তেন, আবার কখনও শেষ রাতে পড়তেন। আমি বললাম, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি দ্বীনের (ব্যাপারে) প্রশস্ততা রেখেছেন। আবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (সালাতুত তাহাজ্জুদে) সশব্দে কিরাআত পড়তেন নাকি নৈঃশব্দে? তিনি জবাব দিলেন, তিনি কখনও সশব্দে পড়তেন, কখনও নৈঃশব্দে। আমি বললাম, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি দ্বীনের (ব্যাপারে) প্রশস্ততা রেখেছেন। অতঃপর আবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি রাতের প্রথম ভাগে নাপাকীর গোসল করতেন, নাকি শেষ রাতে? তিনি জবাব দেন, কোনো রাতে তিনি প্রথমভাগে গোসল করতেন, আবার কোনো কোনো রাতে শেষভাগে গোসল করতেন। আমি বললাম, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি দ্বীনের (ব্যাপারে) প্রশস্ততা রেখেছেন।"[২৯৭]

উল্লেখ্য যে, আমাদের আলিমদের মধ্যে অনেকেই ইখতিলাফ ও তানভী-এর মধ্যে পার্থক্য না করে তর্ক-বিবাদে জড়িয়ে পড়েন।

---

২৯৭. মুসলিম, *আস-সহীহ*, হা. নং : ৭৩১; তিরমিযী, আস-সুনান, হা. নং : ২৯২৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. নং : ২৪৪৫৩

https://nagorikpathagar.org

আলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য বা সমন্বয়

সকল দল ও মতের আলিমগণ নিজেদের মধ্যে উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থে ও প্রয়োজনে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে পারে। এর মানে এ নয় যে, আলিমদের প্রত্যেকটি ধারা ও দল-উপদলকে নিজ নিজ দল ও চিন্তা ত্যাগ করে একটি অভিন্ন জামাআত বা কাঠামোর মধ্যে আসতে হবে; বরং এর মর্ম হলো উম্মতের কেবল রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে আলিমগণ অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা এবং একই ধরনের নীতি গ্রহণ করা।

রাজনৈতিক ঐক্য বা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সব সময় সকল আলিমকে– তিনি যে ধারা বা দলেরই হোন না কেন– কাফির ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কথা সব সময় মাথায় রাখতে হবে। ওরা আমাদের কোনো ধারা, গোষ্ঠী বা দল-উপদল বোঝে না। ইসলাম বা আলিমমাত্রই তাদের টার্গেট। তাই বিচ্ছিন্নতার সকল পথ বন্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। আর মনে এই স্পৃহা রাখতে হবে যে, যেখানে রাসূলুল্লাহ সা. মদীনায় অবস্থাভেদে ইয়াহুদীদের সাথেও ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন, মুনাফিকদের পরিচয় জানা সত্ত্বেও মুসলিম জামাআতে রেখেছিলেন, সেখানে আমরা আমাদের মুসলিম ভাইদের কিছু ভুলকে আলোচনার টেবিলে রেখে বৃহৎ স্বার্থে ঐক্য গড়তে পারব না কেন? আল্লাহ আমাদের বোঝার তাওফিক দান করুন!

বৃহত্তর ঐক্যের পথ সুগম করতে করণীয়

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মর্ম কিংবা প্রামাণিকতার দিক থেকে অকাট্য নয়– এমন শাখাগত আকীদা-বিশ্বাস কিংবা আমল যেমন আলিমদের বৃহত্তর ঐক্যের জন্য বাধা নয়, তেমনি ফিকহী মতানৈক্যও আলিমদের ঐক্যের পথে বাধা হতে পারে না। কাজেই যিনি বা যারা যেই ধারার বা গোষ্ঠীরই হোন না কেন, তিনি বা তাঁরা আমাদের মুসলিম ভাই, যে যাবৎ তিনি বা তাঁরা মৌলিক আকীদা, মৌলিক আমল ও মৌলিক দলীলগুলোর ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেন। আমাদের মধ্যে যাতে কোনোরূপ বিভেদ ও অনৈক্য তৈরি না হয়, তাই আমাদের সকলকেই কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে :

ক. পরস্পর মূল্যায়ন করা

ইসলামের বিভিন্ন মাসলাক ও দলের অনুসারীগণের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– পারস্পরিক মূল্যায়ন।

https://nagorikpathagar.org

সকলেই ইসলামের সামগ্রিক কাঠামো এবং মৌলিক বিশ্বাস, দলীল ও আমলের ঐক্যের মধ্যে অবস্থান করে বিভিন্ন মত, চিন্তা-গবেষণা ও কর্মকে স্বীকৃতি দেবে এবং পরস্পরের মত ও কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সংলাপের আন্তরিক পরিবেশ তৈরি করবে। অমূলক ধারণার ভিত্তিতে আক্রমণাত্মক ও নেতিবাচকভাবে একে অপরের মত ও কর্মকে খণ্ডন করার পরিবর্তে সঠিক যুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে পর্যালোচনার মাধ্যমে একে অপরকে মূল্যায়ন করবে।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে– আমাদের পূর্বসূরি ইমাম ও বিজ্ঞ আলিমগণ বিভিন্ন বিষয়ে, এমনকি চিন্তা-বিশ্বাসগত কিংবা কর্মগত নানা বড়ো বড়ো বিষয়েও পরস্পর মতপার্থক্য করেছেন এবং এগুলো নিয়ে তাঁদের মধ্যে নানা স্কুল (চিন্তানৈতিক গোষ্ঠী) ও মাযহাবও গড়ে উঠেছে। এতৎসত্ত্বেও তাঁদের একজন অন্যজনের ইজতিহাদ ও চিন্তার যথাযথ মূল্যায়ন করতেন, একজন অপরজনের যোগ্যতা ও কর্মের স্বীকৃতি দিতেন, পরস্পর একে অপরকে যথাযোগ্য সম্মান দিতেন। ফলে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও এগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাঁদের মধ্যে কোনো দলাদলি ও দূরত্ব তৈরি হয়নি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো– আমাদের আলিমদের একটি সাধারণ স্বভাব হলো, তাঁরা নিজ নিজ পছন্দের ব্যক্তি, মত, দল ও মাসলাকের বাইরে কারও যোগ্যতা কিংবা কাজের স্বীকৃতি দিতে বড়োই কার্পণ্য করেন। প্রত্যেকেই নিজের ও দলের সকল চিন্তা ও কর্মকে সহীহ ও হক মনে করলেও অন্যজনের কিংবা অন্য দলের চিন্তা ও কর্মের– যদিও তা নিরপেক্ষ বিবেচনায় সঠিক ও হকও হয়– কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। এরূপ মনোভাবের কারণে একদিকে বিভিন্ন দল ও মতের আলিমদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হচ্ছে, অপরদিকে তাঁদের মধ্যে বিভেদ-বিভাজন ক্রমেই বেড়েই চলছে।

খ. নিয়মিত মতবিনিময় করা

কাউকে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে ফিরিয়ে রাখার একটি কার্যকর প্রতিষেধক হলো– তার মনে যা আছে, তা নির্বিঘ্নে পুরো ব্যক্ত করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। কারণ, তার মনের মধ্যে যে ভুলভ্রান্তি আছে, তা নিরূপিত হলেই দূর করা সহজতর হয় এবং সেখানে সঠিক চিন্তাটি প্রতিস্থাপন করাও সহজ হয়। এতে মতভেদ ও অনৈক্যের আগুন ক্রমে নির্বাপিত হয়ে যেতে পারে। আমাদের একটি প্রধান সমস্যা হলো– আমাদের হৃদয়গুলো এতই সংকীর্ণ যে,

https://nagorikpathagar.org

আমরা অন্যের মনে কী কথা আছে, তার কথার যুক্তি ও দলীল কী, তা জানা ও বোঝার জন্য ধৈর্যসহকারে তার নিকট থেকে শুনতে অভ্যস্ত নই। উলটো আমরা আমাদের মনের কথাটাই তার ওপর চাপিয়ে দিতে চাই। এ কারণে আমাদের মধ্যে ক্রমশ মতপার্থক্য ও অনৈক্য বেড়েই চলছে।

কুরাইশ সর্দার উতবাহ ইবনু রাবীআহ ছিল একজন কট্টর মুশরিক। তার বক্তব্য অসত্য ও বাতিল হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সা. ধৈর্য ধরে তার সবটুকু শুনলেন, অতঃপর বললেন, قُلْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ أَسْمَعْ-"হে আবুল ওয়ালীদ, (তোমার আরও কী কিছু বলার আছে?) থাকলে বলো, আমি শুনছি।"[২৯৮] এখানে রাসূলুল্লাহ সা. তাকে সত্যপথের দিকে দাওয়াত দিতে চেয়েছেন, তাই তিনি কৌশলী হয়ে উদার মন নিয়ে তাকে মন উজাড় করে কথা বলার অবারিত সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তার চিন্তাচেতনা কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত, তা নির্ণয় করে সঠিক চিকিৎসা তিনি দিতে চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সা.-এর এ দাওয়াতী পদ্ধতি সত্যিই অপূর্ব, চমৎকার! তিনি যদি একজন মুশরিক নেতার সাথে এমনটি উদার আচরণ করতে পারেন, তাহলে আমরা আলিমগণ একে অন্যের সাথে তা করতে বাধা কোথায়? আসুন! আমরাও মনটাকে উদার করি, অন্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিই, অন্যের মনের কথা উজাড় করে বলার পরিবেশ তৈরি করি, তাহলে দেখা যাবে– আমাদের বহু মতপার্থক্য এমনিতেই দূরীভূত হয়ে যাবে। এ মহৎ উদ্দেশ্যে নানা মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন মত ও দলের বিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান আলিমগণকে নিয়ে নিয়মিতভাবে পারস্পরিক মতবিনিময় সভা ও সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে।

গ. পরমতসহিষ্ণুতা

নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সদ্‌ভাব গড়ে তোলার জন্য পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা অতীব প্রয়োজনীয়। সকল আলিমই তো মানুষ, তাদের মধ্যে যেকোনো বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ও চিন্তা থাকতে পারে– এটাই স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে যেকোনো সমাজে বসবাস করা কঠিন। এ কারণে তর্কিত বিষয়ে প্রত্যেকের যেমন প্রতিপক্ষের কথা ও যুক্তি শোনার মতো মানসিকতা থাকতে হয়, তেমনি তা শুনে সহ্য করার মতো মনোবৃত্তিও তাকে লালন করতে হয়।

---

২৯৮. ইবনু ইসহাক, *সীরাতু ইবনি ইসহাক*, পৃ. ১৮৭; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ*, খ. ১, পৃ. ২৯২

https://nagorikpathagar.org

যদি আলিমদের মধ্যে এ গুণটির যথাযথ চর্চা থাকে, তাহলে বিভিন্ন মত ও পথের আলিমগণ একে অন্যের কাছে আসতে পারবেন, পরস্পর অবাধে মিশতে পারবেন। এর ফলে তাঁদের মধ্যকার অনেক দূরত্বও ঘুচে যাবে। ইতঃপূর্বে আমরা ১ম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে, আমাদের পূর্বসূরি মুজতাহিদ ইমাম ও বিজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও পরমতসহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে তাঁরা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁরা মনভরে একে অপরের কথা ও যুক্তি শুনতেন এবং পরস্পর সমীহ করে চলতেন। এ কারণে তাঁদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও এগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাঁদের মধ্যে কোনো দলাদলি ও দূরত্ব তৈরি হয়নি।

ঘ. পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ির পথ পরিহার করা

কারও মধ্যে বা কোনো দলের মধ্যে ভুল থাকলে তাঁর বা দলের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে, দলীল-প্রমাণভিত্তিক পর্যালোচনা চলতে পারে; কিন্তু পরস্পর গীবত বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। এতে ভুলের সংশোধন তো হয় না; বরং হিতে বিপরীতে হয়। এতে মতানৈক্য শত্রুতায় রূপ নেয় এবং পরস্পর দূরত্ব বাড়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (١٢)﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে নিয়ে কোনো উপহাস না করে। কেননা, এমনও হতে পারে– (যাদের উপহাস করা হচ্ছে,) তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম। আবার নারীরাও যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে। কারণ, যাদের উপহাস করা হয়, হতে পারে তারা উপহাসকারিণীদের চেয়ে অনেক ভালো। (আরও মনে রাখবে,) একজন আরেকজনকে (অযথা) দোষারোপ করবে না, আবার একজন আরেকজনকে খারাপ নাম

https://nagorikpathagar.org

ধরেও ডাকবে না। কারণ, ঈমান আনার পর কাউকে খারাপ নামে ডাকা একটা বড়ো ধরনের অপরাধ। যারা এ আচরণ থেকে ফিরে না আসবে, তারা হবে (সত্যিকার) যালিম। হে ঈমানদারগণ, তোমরা বেশি বেশি অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, কিছু কিছু (ক্ষেত্রে) অনুমান (আসলেই) অপরাধ এবং একে অপরের (দোষ খোঁজার জন্য তার) পেছনে গোয়েন্দাগিরি করো না, একজন আরেকজনের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? (অবশ্যই) তোমরা এটা ঘৃণা করে থাকো। (এসব ব্যাপারে) তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাওবা কবূল করেন এবং তিনি একান্ত দয়ালু।"[২৯৯]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে যেসব দোষ ত্যাগ করতে বলা হয়েছে, সেগুলো হলো– পরস্পর বিদ্রুপ করা, নিন্দা করা, মন্দ নামে ডাকা, খারাপ ধারণা করা, গোপন বিষয় অনুসন্ধান করা ও গীবত করা। এ দোষের মধ্যে প্রত্যেকটিই পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য ও অনৈক্য তৈরি ও বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এ কারণে এসব দোষ পরিহার করে আলিমগণ নিজেদের মধ্যকার মতপার্থক্য ও অনৈক্যের ক্ষেত্র অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারেন। এর পরিবর্তে তাঁরা নিজেদের সমস্যাগুলোকে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি মধ্য দিয়েই সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

"আর যারা তাঁর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা.)-এর সাথে রয়েছে, তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল।"[৩০০]

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের রঙে নিজেদের সাজাতে হলে একদিকে পরস্পরের মধ্যে মহব্বত বাড়াতে হবে, সহনশীলতার সবক নিতে হবে, মতানৈক্যের জায়গাগুলো একদিকে রেখে ঐক্যের জায়গাগুলো খুঁজতে হবে, অপরদিকে পরস্পর গীবত ও কাদা ছোড়াছুড়ি থেকে বিরত থাকতে হবে।

---

২৯৯. আল-কুরআন, ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত) : ১০-১২

৩০০. আল-কুরআন, ৪৮ (সূরা আল-ফাতহ) : ২৯

https://nagorikpathagar.org

তাহলে দেখা যাবে– প্রায় ৯০-৯৫% জায়গায় আমরা একমত। কিছু শাখাগত আকীদা ও আমলের পদ্ধতিগত মতপার্থক্য দেখা যায়, যা মাত্র শতকরা ৫-১০%। এর অধিকাংশও আবার মনগড়া নয়; উপযুক্ত দলীলের ভিত্তিতেই মতানৈক্য তৈরি হয়েছে। এগুলোতে আবার এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলো আকীদার বিষয় নয়; কিন্তু সেগুলোকে আমরা আকীদার বিষয় বানিয়ে নিয়েছি। অনেক বিষয় এমনও আছে, যেগুলো আসলে সুপ্রমাণিত আমলই নয়, সেগুলোকেও আমরা সুপ্রমাণিত আমল মনে করে হরহামেশা তর্ক করে যাচ্ছি।

৬. পাবলিক প্লেসে বিরোধসংক্রান্ত আলোচনা বর্জন করা

যেসব বিষয়ে আলিমদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ও ইজতিহাদী বিরোধ রয়েছে, সেসব বিষয়ের আলোচনা কেবল অ্যাকাডেমিক অঙ্গন ও ফোরামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এ জাতীয় মতপার্থক্য ও বিরোধকে পাবলিক প্লেস, পত্রপত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এনে ফলাও করা যাবে না। সকলকেই মাহফিলের মাইকে প্রতিপক্ষকে আক্রমণাত্মক কথা বলা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ও বহসের চ্যালেঞ্জ করা পরিহার করতে হবে, উম্মতের আলিমদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতানৈক্য চলে আসছে, চলবে; বহস কিংবা মাইকে হুংকার দেওয়ার মাধ্যমে অতীতে কখনও ইখতিলাফ বন্ধ হয়নি, বন্ধ হবেও না; বরং এসব কাজের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ও দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে। এসব আলোচনা কেবল নিজেদের দারস ও গ্রন্থ লেখালেখি কিংবা অ্যাকাডেমিক ফোরামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। শাইখ ইবনু তাইমিয়াহ রহ. বলেন–

وَالْوَاجِبُ أَمْرُ الْعَامَّةِ بِالْجُمَلِ الثَّابِتَةِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَمَنْعُهُمْ مِنْ الْخَوْضِ فِي التَّفْصِيلِ الَّذِي يُوقِعُ بَيْنَهُمْ الْفُرْقَةَ وَالِاخْتِلَافَ فَإِنَّ الْفُرْقَةَ وَالِاخْتِلَافَ مِنْ أَعْظَمِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ .

"ওয়াজিব হলো নস (কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য) ও ইজমা দ্বারা যে বাক্যগুলো সুপ্রমাণিত, সাধারণ লোকদের তা আদেশ করা এবং এসব বিষয়ে তাদের এমন বিশদ আলোচনায় যাওয়া থেকে বিরত রাখা– যা তাদের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ তৈরি করবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল যে সকল বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন, তন্মধ্যে অধিকতর জঘন্য একটি বিষয় হলো বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ।"[৩০১]

৩০১. ইবনু তাইমিয়াহ, *মাজমূউল ফাতাওয়া*, খ. ১২, পৃ. ২৩৭

https://nagorikpathagar.org

মোটকথা, পারস্পরিক বিরোধের বিষয়গুলোকে সাধারণ জনগণের সামনে নিয়ে আসা চরম গর্হিত কাজ। এতে আলিমদের মধ্যকার মতপার্থক্য ও বিরোধ সাধারণ জনগণের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ জনগণ আলিমদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেতে সাহস পায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার হলো– আমাদের অনেক আলিম, বিশেষ করে মাঠের ওয়ায়িয ও ইউটিউবার শাইখগণ প্রতিনিয়ত এ গর্হিত কাজ সদর্পে করে যাচ্ছেন। বলতে গেলে, বর্তমান ওয়ায মাহফিল এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলোতে বিতর্কিত বিষয়গুলোই তাঁদের আলোচনার প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে অনৈক্যের পাশাপাশি সাধারণ জনমনে বিরাট বিভ্রান্তি যেটি ছড়িয়ে পড়ছে তা হলো– এসব বিষয়ের যে দিকটি কেউ মেনে চলছে, তার বিপরীত দিকটিকে তারা গুমরাহী ও ইসলামের শত্রুতা মনে করছে। ফলে আমাদের যে শক্তি-সামর্থ্য কুফর, নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা ও সমাজে বাড়তে থাকা অশ্লীলতার মোকাবিলায় ব্যয় হতে পারত, তা এখন পরস্পর কলহ-বিবাদে ব্যয় হচ্ছে।

চ. শর্তারোপ না করা

উপর্যুক্ত মৌলিক আকীদা ও মৌলিক আমলের দিক থেকে সমমনা ব্যক্তি ও দলগুলোর সাথে ঐক্য গড়তে একপক্ষ থেকে অপর পক্ষের ওপর কোনো শর্তারোপ করা সমীচীন নয়। এক টেবিলে বসার আগে অনেককে বিভিন্ন শর্তের ঢিল ছুড়তে দেখা যায়। তাদের মনে রাখা উচিত– বিভিন্ন চিন্তা ও মতের কারণেই তো তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধারা ও দল গড়ে উঠেছে। যদি সকলই একই চিন্তা ও মতের অনুসারী হতো, তাহলে তো বিভিন্ন ধারা ও দলও গড়ে উঠত না এবং ঐক্যেরও প্রশ্ন আসত না। তাদের এ কথাও মনে রাখা উচিত– প্রত্যেক দলেরই তো কমবেশি ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে। কাজেই শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ঐক্য হয় না। অন্যের শর্ত মেনে টেবিলে বসাকে সবাই নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে করে। এ রকম শর্তের সুযোগ দিলে সবাই শর্তের ফুলঝুরি নিয়ে বসবে।

ছ. যথাসম্ভব মতপার্থক্য ও তর্ক-বিবাদ এড়িয়ে চলা

মতপার্থক্য, বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় কিংবা বেহুদা মতপার্থক্য এবং ছোটোখাটো বিষয়ে মতপার্থক্য যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। অনুরূপভাবে যেসব বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে একাধিক মত প্রচলিত রয়েছে, সেসব বিষয়েও যথাসম্ভব বিরোধ পরিহার করে চলতে হবে। এরূপ মতপার্থক্য ও

https://nagorikpathagar.org

বিরোধ অযথা বিতর্কের জন্ম দেয়। এ ধরনের মতপার্থক্য ও বিরোধে প্রায়ই তথ্য পরিবর্তনের অনুশীলন হয়ে থাকে, যা মিথ্যার নামান্তর। তদুপরি তা পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করে এবং একে অপরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ ছড়ানোর ক্ষেত্র তৈরি করে। এতে অলক্ষ্যে গীবতচর্চা শুরু হয় এবং গোয়ার্তুমি ও গোঁড়ামির মতো ব্যাধি সংক্রমিত হতে থাকে। একপর্যায়ে নানা দল-উপদল সৃষ্টি হয়ে উম্মাহকে ক্ষতির মুখে ঠেলে দেয়। এ কারণে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. উম্মাতকে মতপার্থক্য ও বিরোধ থেকে বেঁচে থাকতে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন– আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

> "একদিন অতি প্রত্যুষে আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে গেলাম। এ সময় তিনি কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে দু-ব্যক্তির মধ্যকার মতানৈক্যের শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তিনি আমাদের মাঝে বের হয়ে আসলেন, এ সময় তাঁর চেহারায় রাগের আভা ফুটে উঠছিল। তিনি বললেন, إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ. 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তো কেবল এজন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা আল্লাহ তাআলার কিতাব নিয়ে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছিল'।"[৩০২]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. পারস্পরিক মতপার্থক্য ও বিরোধ নিরসনে যে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা ফুটে উঠেছে। সাথে সাথে মতপার্থক্য ও বিরোধ যে পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে ছেড়েছে এবং এ উম্মতকেও ধ্বংস করবে– তার একটি হুঁশিয়ারিও তিনি এখানে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। সুতরাং মতপার্থক্য ও বিরোধ যে প্রলয়ংকরী ও বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাস্তবেও দেখা যায়, এ মতপার্থক্য ও বিরোধই হলো সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ফিতনা। ইতিহাসে যত বিপর্যয় ঘটেছে, তার সবটুকু প্রায়ই মতপার্থক্য ও বিরোধের বীজতলায় জন্ম নেওয়া। সাহাবা কিরাম রা.-এর একটি অনুসৃত সুন্নাত ছিল, কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য ও বিরোধ থেকে বেঁচে থাকার সামান্যতম সুযোগ থাকলেও তাঁরা মতপার্থক্য এড়িয়ে চলতেন, কোনোরূপ বিবাদে জড়িয়ে পড়তেন না। যেমন– হজের সময় মিনাতে সালাত ইতমাম (পূর্ণ আদায়) করা হবে নাকি কসর করা হবে– তা নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে দুটি মত চালু ছিল। সাইয়িদুনা উসমান রা. ইতমাম-এর মত পোষণ করতেন,

---

৩০২. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইলম, হা. নং : ১/৬৯৪৭

https://nagorikpathagar.org

পক্ষান্তরে সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. কসর-এর মত পোষণ করতেন এবং উসমান রা.-এর উপর্যুক্ত মতের ত্রুটিও বর্ণনা করতেন। কিন্তু উসমান রা. তাঁর খিলাফতকালে একবার হজের সময় মিনাতে সালাত আদায় করছিলেন, সে সময় ইবনু মাসউদ তাঁর পেছনে গিয়ে চার রাকআত পূর্ণ সালাত আদায় করলেন। এটা দেখে লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করলে তখন তিনি বলেন, .اَلْخِلَافُ شَرٌّ-"বিরোধ করা মন্দ কাজ।"[৩০৩]

এ হাদীসে ইবনু মাসউদ রা. সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিরোধ মূলত একটি নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কাজ। অযথা বা অপ্রয়োজনীয় বিরোধিতায় কল্যাণ বলতে কিছু নেই। তাই সামান্য সুযোগ থাকলেও যেকোনো মতপার্থক্য ও বিরোধ এড়িয়ে চলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ইতঃপূর্বে ১ম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, মুজতাহিদ ইমামগণ অনেক সময় আমলের ক্ষেত্রে নিজস্ব মত পরিহার করে (শারঈ দলীলনির্ভর) সমাজে প্রচলিত রীতির প্রতি লক্ষ রাখতেন, যাতে তা নিয়ে সমাজের লোকদের মধ্যে অযথা বাড়াবাড়ি শুরু না হয় এবং তাদের ঐক্য ও সংহতির মধ্যে চিড় না ধরে। কাজেই বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে যেমন বিভিন্ন দল ও মতের আলিমদের অপ্রয়োজনীয় বা বেহুদা মতপার্থক্য ও তর্ক-বিবাদ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে, তেমনি যেসব বিষয়ে তাঁদের মধ্যে একাধিক মত প্রচলিত রয়েছে, সেসব বিষয়ে উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির কথা চিন্তা করে বিরোধের উর্ধ্বে উঠে যথাসম্ভব (শারঈ দলীলনির্ভর) সমাজের প্রচলিত রীতির ওপর আমল করতে হবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তর্ক-বিবাদ করে কখনও সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারণ, প্রথমত তর্ক-বিবাদের ক্ষেত্রে কারও উদ্দেশ্য হকের অনুসন্ধান থাকে না; বরং প্রত্যেকের একান্ত উদ্দেশ্য থাকে নিজের মতকেই প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা। দ্বিতীয়ত, তর্ক-বিবাদের ক্ষেত্রে বাচাল ও যুক্তিবাদী লোকগুলো অনেক সময় কথা ও বুদ্ধির জোরে জিতে যায়, যদিও হক তাদের পক্ষে না থাকে। কাজেই দ্বীনের বিষয় নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হওয়া শোভনীয়ও নয়। এর কুফল এতই ক্ষতিকর যে, এটি একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করে দেয়। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এরূপ প্রতিক্রিয়া খুবই মারাত্মক।

---

৩০৩. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-মানাসিক, হা. নং : ৭৭/১৯৬২; হাদীসটি সহীহ।

https://nagorikpathagar.org

এর কারণে মানুষের অন্তর কঠিন হয় এবং পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। মালিক ইবনু আনাস রহ. বলেন–

الْمِرَاءُ يُقَسِّي الْقُلُوبَ وَيُوَرِّثُ الضَّغَائِنَ .

"তর্ক-বিবাদ অন্তরগুলোকে কঠিন বানিয়ে দেয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম দেয়।"[৩০৪]

তর্ক-বিবাদ এমন একটি দুশ্চরিত্র, যাকে সালাফে সালিহীন খুব ঘৃণাই করতেন এবং এ থেকে অনেক দূরে থাকতেন।

ইমাম আওযাঈ রহ. বলেন–

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا أَعْطَاهُمُ الْجَدَلَ ، وَمَنَعَهُمُ الْعَمَلَ .

"যখন আল্লাহ তাআলা কোনো জাতির অকল্যাণ চান, তখন তাদের তর্ক-বিবাদে লাগিয়ে দেন এবং আমল থেকে দূরে রাখেন।"[৩০৫]

সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. বলেন–

ولن يصيب رجل حقيقة الإيمان حتى يترك المراء، وهو يعلم أنّه صادق .

"কারও পক্ষে কখনোই ঈমানের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, যে যাবৎ-না সে তর্ক-বিবাদ ছেড়ে দেয়। অথচ সে জানে যে, সে সত্যবাদী।"[৩০৬]

আমরা জানি, ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন বিতর্কে অত্যন্ত পারদর্শী এবং বিচক্ষণ বিতার্কিকদের একজন। যারা সত্য ও হককে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিতর্ক করতেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম ও বিখ্যাত; কিন্তু তিনি তাঁর ছেলে হাম্মাদ রহ.-কে বিতর্ক করতে নিষেধ করেন। তখন তাঁর ছেলে তাঁকে বলেন, كنت تناظر فيه وتنهانا عنه!-"আপনাকে আমি বিতর্ক করতে দেখছি, অথচ আপনি আমাদের নিষেধ করছেন! উত্তরে তিনি বলেন–

---

৩০৪. গাযালী, *ইহয়াউ উলূমিদ্দীন*, খ. ৩, পৃ. ১১৭

৩০৫. মাওয়ারদী, *আদাবুদ দুনইয়া ওয়াদ দ্বীন*, পৃ. ৫৪

৩০৬. আহমাদ, *আয-যুহদ*, পৃ. ৩৬৬

https://nagorikpathagar.org

كنا نناظر وكان على رؤوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا، وأنتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم، ومن أراد أن يزل صاحبه، فقد أراد أن يكفر، ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر

"আমরা যখন বিতর্ক করতাম, তখন আমাদের প্রতিপক্ষের পদস্খলন ঘটতে পারে– এ আশঙ্কায় এমন করে বসতাম, যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। আর বর্তমানে তোমরা বিতর্ক করো আর চাও যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের পদস্খলন ঘটুক। অনন্তর যে ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের পদস্খলন কামনা করে, প্রকারান্তরে সে তার কুফরী কামনা করল। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের কুফরী কামনা করল, তাহলে সে প্রতিপক্ষের কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার আগে নিজেই কুফরীতে লিপ্ত হলো।"[৩০৭]

বিভিন্ন হাদীসেও তর্ক-বিবাদ পরিহার করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

اَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ مُحِقًّا .

"আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পাশে একটি ঘরের যিম্মাদার, যে তর্ক-বিবাদ পরিহার করে চলে, যদিও সে সত্যাবলম্বী হয়।"[৩০৮]

সাইয়িদুনা মুসলিম ইবনু ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

اِيَّاكُمْ وَالْمِرَاءَ فَاِنَّهَا سَاعَةُ جَهْلِ الْعَالِمِ وَبِهَا يَبْتَغِي الشَّيْطَانُ زَلَّتَهُ .

"তোমরা তর্ক-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, তর্ক-বিবাদ আলিমের অবিবেচকতার মুহূর্ত। এর মাধ্যমে শয়তান তার পদস্খলন কামনা করে।"[৩০৯]

---

৩০৭. ইবনুল বাযযাযী, *মানাকিবুল আবী হানীফাহ*, খ. ১, পৃ. ১২১; আবূ যুহরা, *আবূ হানীফাহ : হায়াতুহু ওয়া আসরুহু*, পৃ. ২৮

৩০৮. আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-আদাব, হা. নং : ৮/৪৮০২; হাদীসটি হাসান। কোনো কোনো সূত্রে হাদীসটি এভাবে এসেছে, بنى من ترك المراء وهو صادق ، بنى الله له بيتا في وسط الجنة-"যে ব্যক্তি সত্যাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক-বিবাদ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলার তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থানে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।" (আজুররী, *আখলাকুল উলামা*, পৃ. ৪৪)

https://nagorikpathagar.org

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, তর্ক-বিবাদ একটি গর্হিত স্বভাব, যা আলিমে রব্বানীগণ সতর্কভাবে এড়িয়ে চলেন। পক্ষান্তরে আলিমে সূ-রা যেকোনো বিষয় নিয়ে– ছোটো হোক কিংবা বড়ো– অতি উৎসাহভরে তর্কে জড়িয়ে পড়ে, লক্ষ-কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে এবং যেকোনোভাবে নিজের মত ও চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস চালায়।

জ. ইকামতে দ্বীনের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকা

'ইকামতে দ্বীন' (ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা) ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। অন্তত এ প্রশ্নে সকলকেই সবসময় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বীনের প্রধান ও মৌলিক বিষয় নয়– এরূপ শাখা-প্রশাখাবিষয়ক নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন কারণে আলিমগণের মধ্যে দলীলভিত্তিক মতপার্থক্য হতে পারে, কার্যত হয়েছেও। এ জাতীয় বিষয়গুলোতে মতপার্থক্য এড়াতে পারলে ভালো, কিন্তু সম্ভব না হলে তা মোটের ওপর নিষিদ্ধ নয়; বরং সীমিত পরিসরে শর্তসাপেক্ষে বৈধ। তবে দ্বীনের প্রধান ও মৌলিক বিষয়াদিসহ ইকামতে দ্বীনের বিষয়ে কোনোরূপ দলাদলি ও বিভেদ সৃষ্টি করা চরমভাবে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

"তিনি তোমাদের জন্য সে দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি আপনার কাছে ওহীরূপে পাঠিয়েছি, উপরন্তু যার আদেশ আমি ইবরাহীম মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম। (এদের সবাইকে আমি বলেছিলাম,) তোমরা এ জীবনব্যবস্থা (সমাজে) প্রতিষ্ঠিত করো এবং (কখনও) এতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।"[৩১০]

এ আয়াতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হলো, আল্লাহ তাআলা 'ইকামতে দ্বীন'-এর কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করত এক্ষেত্রে যেকোনোরূপ দলাদলি ও পরস্পর

---

৩০৯. দারিমী, *আস-সুনান*, হা. নং : ৩৯৬; রিওয়ায়াতটি সূত্রগত দিক থেকে সহীহ।

৩১০. আল-কুরআন, ৪২ (সূরা আশ-শূরা) : ১৩

https://nagorikpathagar.org

বিচ্ছিন্ন হওয়াকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষেধ করেছেন। কাজেই বোঝা যায়, ইকামতে দ্বীনের কাজে মতপার্থক্য করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বিশেষভাবে যে নিষিদ্ধ, তা এখানে প্রতিভাত হয়।

'ইকামতে দ্বীন' একটি বহুল তাৎপর্যপূর্ণ পরিভাষা। এর কয়েকটি মর্ম হতে পারে এবং প্রত্যেকটি মর্মই এর উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। যেমন–

১. সকল মানুষকে দ্বীনের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও বিধিবিধানের ওপর সুদৃঢ় রাখার ব্যবস্থা করা।

২. দ্বীনের বিধিবিধানগুলোকে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে কার্যকর করার ব্যবস্থা নেওয়া।

৩. দ্বীনের প্রচার-প্রসার এবং তাকে তার শত্রুদের কবল থেকে পরিপূর্ণ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।[৩১১]

উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখ সাদী রহ. বলেন–

{ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ } أي: أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم، وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان. { وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ } أي: ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا، وتكونون شيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم.

"{أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ}– অর্থাৎ, তিনি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা দ্বীনের সকল বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করবে, চাই তা উসূল (মৌলিক বিষয়) হোক কিংবা ফুরূ (শাখাগত বিষয়)। এগুলো তোমরা নিজেরা বাস্তবায়ন করবে এবং অন্যদের জীবনেও প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে। অধিকন্তু তোমরা পরস্পর একে অপরকে ন্যায় ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করবে না। {وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}-অর্থাৎ, তোমাদের

৩১১. *আল-মাওসূআতুল আকদিয়াহ*, খ. ৮, পৃ. ৬৪

https://nagorikpathagar.org

থেকে একান্ত কাম্য হলো, দ্বীনের উসূল ও ফুরূ সকল বিষয়েই তোমরা ঐকমত্য পোষণ করবে। অধিকন্তু, তোমরা এ বিষয়ে যত্নশীল হও যে, দ্বীনের মূল বিষয়ের ওপর তোমাদের ঐকমত্য থাকা সত্ত্বেও যাতে ছোটোখাটো বিষয়গুলো তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে না দেয় এবং দল-উপদলে বিভক্ত না করে, ফলে তোমরা এমন বহু দলে পরিণত হবে– যারা একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।"[৩১২]

বিশিষ্ট মুফাসসির আলাউদ্দীন আল-খাযিন [৬৭৮-৭৪১ হি.] রহ. বলেন–

المراد بإقامة الدين هو توحيد الله والإيمان به وبكتبه ورسله واليوم الآخر وطاعة الله في أوامره ونواهيه وسائر ما يكون الرجل به مسلماً

"ইকামতে দ্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র (সত্যিকার) উপাস্য বলে জানা, তাঁকে বিশ্বাস করা, তাঁর কিতাবসমূহ ও নবী-রাসূলগণ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস করা, অধিকন্তু আল্লাহ তাআলার সকল বিধিনিষেধ মেনে চলা এবং যা কিছু একজন ব্যক্তিকে মুসলিমে পরিণত করে, তা সবই কার্যত পালন করা।"[৩১৩]

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রতি আরোপিত একটি বিশেষ দায়িত্ব ছিল, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত বিধিবিধানগুলো পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা এবং তা করতে গিয়ে কোনোরূপ বিভেদ তৈরি না করা। কাজেই বোঝা যায়, ইকামতে দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো নবী-রাসূলের যুগেই বিভেদ তৈরি করার সুযোগ ছিল না, আজও সেই সুযোগ নেই। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয় হলো– এ শাশ্বত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও আজ আলিমগণ শাখা-প্রশাখাগত ও ছোটোখাটো মতপার্থক্যের বিষয়গুলো সামনে নিয়ে এসে অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে একদিকে ইকামতে দ্বীনের কাজ চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে, অপরদিকে তাঁরা নিজেরাও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশ্যে হারামে জড়িয়ে পড়ছেন। আমরা আশা করব, নবী-রাসূলগণের ওয়ারিস ও খলীফা এবং উম্মতের একান্ত অভিভাবক হিসেবে আলিমগণ সকলেই ইকামতে দ্বীনের গুরুত্ব অনুধাবন করত একে জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং

---

৩১২. সাদী, *তাইসীরুল করীম*.. (তাফসীরুস সাদী), পৃ. ৭৫৪

৩১৩. আলাউদ্দীন আল-খাযিন, *লুবাতুত তাজীল* (তাফসীরুল খাযিন), খ. ৬, পৃ. ১১৮

https://nagorikpathagar.org

এ ক্ষেত্রে সব ধরনের বিচ্ছিন্নতা পরিহার করবেন, দলমত-নির্বিশেষে ছোটোখাটো মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এ গুরুদায়িত্ব পালন করে যাবেন।

ঝ. উম্মতের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ রাখা

উম্মতের সম্মিলিত স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণ সাধন সকলের জন্য অপরিহার্য। কারও পক্ষে এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন নয়, যাতে উম্মতের সম্মিলিত স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই অন্তত এ বিষয়ে সকলকেই সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বিভিন্ন দল ও মতের আলিমগণ নিজ নিজ দল ও মতের ওপর অবস্থান করেও উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনে কমন ইস্যুগুলোর ওপর একমত হতে পারেন, পরস্পরের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে পারেন। এ কারণে প্রত্যেক দল ও মতের আলিমগণকে যেকোনো সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণের সময় উম্মতের স্বার্থ ও কল্যাণকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

ঞ. পরস্পরের মধ্যে সংশোধনের কার্যকর চেষ্টা থাকা

এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় যে, কখনও যেকোনো কারণে ভুলভ্রান্তি ও বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন দল ও মতের আলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। তবে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের এ খারাপ অবস্থাকে দীর্ঘদিন চলতে দেওয়া সমীচীন নয়। এতে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব ও অনৈক্য ক্রমে আরও বৃদ্ধি পাবে। এ কারণে পবিত্র কুরআনে মুমিনদের পারস্পরিক ত্রুটিবিচ্যুতি ও অবনতিশীল সম্পর্ককে সংশোধন করতে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾- "সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং পরস্পরের মধ্যকার অবস্থা সংশোধন করে নাও।"[৩১৪] অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)﴾

৩১৪. আল-কুরআন, ৮ (সূরা আল-আনফাল) : ১

https://nagorikpathagar.org

"আর যদি মুমিনদের দুটি দল নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর তাদের একদল যদি আরেক দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করছে, তার বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করো, যে যাবৎ-না সেই দলটি (সম্পূর্ণত) আল্লাহ তাআলার হুকুমের দিকে ফিরে আসে। (হ্যাঁ, একবার) যদি সে দলটি (আল্লাহর হুকুমের দিকে) ফিরে আসে, তখন তোমরা দুটি দলের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং তোমরা ন্যায়বিচার করবে। অবশ্য আল্লাহ তাআলা ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন। নিশ্চয় মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। কাজে (বিরোধ দেখা দিলে) তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আশা করা যায় যে, তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।"[৩১৫]

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, কোনো কারণে যদি মুমিনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে কিংবা যদি তাঁরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হন, তাহলে অন্য মুমিনগণ তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। কাজেই কোনো কারণে আলিমদের মধ্যে যখনই কোনো মতপার্থক্য ও বিরোধ দেখা দেবে, তখন নিষ্ঠাবান আলিমগণ এগিয়ে এসে তাঁদের মধ্য ভুল বোঝাবুঝি দূরীভূত করার এবং সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এ উদ্দেশ্যে সব দল ও মত থেকে বিজ্ঞ আলিমদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে অথবা আলিমদের মধ্যে একটি তৃতীয় পক্ষও থাকতে পারে– যাঁরা সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষ হবেন এবং এরূপ পরিস্থিতিতে তাঁরা কোনো পক্ষকে বিশেষভাবে গুরুত্ব না দিয়ে বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে সাধারণ যোগাযোগের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। তাঁরা বিবদমান পক্ষগুলোর বক্তব্যগুলো শুনে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা প্রয়োজনবশত তৃতীয় একটি মতও উপস্থাপন করতে পারেন। বিরোধ এমনভাবে সমাধান করতে হবে, যাতে কোনো পক্ষই নিজেদের বঞ্চিত মনে না করে। আশা করা যায়, এরূপ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে বিবদমান আলিমগণের মধ্যে সহজেই কোনো বিরোধ চাঙা হতে পারবে না। কোনো কারণে কখনও কোনো বিরোধ চাঙা হয়ে উঠলেও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা দূরীভূত হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

---

৩১৫. আল-কুরআন, ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত) : ৯-১০

https://nagorikpathagar.org

ট. পারস্পরিক ছাড়ের মানসিকতা লালন করা

বৃহত্তর ঐক্য গঠন ও তা স্থায়ীকরণের জন্য প্রত্যেক দল ও মতের আলিমদের পারস্পরিক ছাড়ের দৃঢ় মানসিকতা লালন করতে হবে। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় যে, প্রত্যেক আলিমই ঐক্য কামনা করেন, ঐক্যের কথা বলেন এবং অনৈক্যের নিন্দা করেন। তবে পরিতাপের বিষয় হলো– তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য বক্তব্যের ভিত্তিতে বৃহত্তর ঐক্যের দিকে আহ্বান জানাতে যতখানি না তৎপর, তার চেয়ে নিজের মাসলাক ও দলমতকেই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মনে করে সে দিকেই আহ্বান করতে বেশি তৎপর। এরূপ কাজ একজন নিষ্ঠাবান উম্মাহদরদী আলিমের হওয়া সমীচীন নয়।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের আলিমদের প্রত্যেক দলই মনে করে যে, সব ক্ষেত্রেই তাঁরাই একমাত্র হক ও সঠিক; বাকি সব দল বাতিল বা গুমরাহ। আমাদের আলিমগণের এরূপ মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া উচিত। একজন আলিমের যে মাসলাক বা দলই পছন্দনীয় হোক না কেন, তাঁর সে মাসলাক ও দলেও তো কমবেশি ভ্রান্তি বা ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে এবং অন্য আলিমগণ তাঁর সে মাসলাক ও দলের ভ্রান্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো নিয়ে কথা ওঠাতে পারেন। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে অন্যদের আপত্তিগুলো যথার্থ নয়, তাহলেও যদি ওই বিষয়গুলোর বর্জন দ্বীন ও মিল্লাতের জন্য ভীষণ ক্ষতির কারণ না হয়, তাহলে উম্মতের কমন স্বার্থে উদার মন নিয়ে সেগুলো বর্জন করাটাই কল্যাণকর।

অনুরূপভাবে অন্য পক্ষের মাসলাক ও দলমতের মধ্যে যদি কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভ্রান্তি থাকেও, তাহলে দ্বীন ও মিল্লাতের স্বার্থে উম্মতের কমন ও মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণের উদ্দেশ্যে সেসব ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভ্রান্তিগুলো এড়িয়ে চলাটাই কল্যাণ বয়ে আনবে।

'আমরাই সঠিক ও হক'– এরূপ চিন্তা করে নিজের পছন্দের মাসলাক ও দলমতকে আঁকড়ে ধরে থেকে অন্য মাসলাক ও দলগুলোর আলিমগণকে মতপার্থক্য ভুলে ঐক্যের আহ্বান জানানো এবং অনৈক্য দূরীভূত করার চিন্তা অনেকটা অবাস্তব ও অযৌক্তিক। আলিমগণ প্রায় সকলেই লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে এ অবাস্তব ও অযৌক্তিক কাজটিই কমবেশি করে যাচ্ছেন। যদি তাঁরা প্রকৃতার্থে দ্বীন ও মিল্লাতের কল্যাণ ও স্বার্থ দেখার দাবিতে সত্যবাদী হন, তাহলে সকলকেই অহমিকা ভুলে, নিজ নিজ পছন্দের মাসলাক ও দলমত আঁকড়ে

https://nagorikpathagar.org

থাকার গোঁয়ার্তুমি বাদ দিয়ে এবং নেতৃত্ব ও সুযোগ-সুবিধার লোভ পরিহার করে দ্বীন ও মিল্লাতের স্বার্থে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতাকে কুরবানী করা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে আলিমগণ যিনি যত বেশি ছাড় দিতে পারবেন, তিনি দ্বীন ও মিল্লাতের তত বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী বলে প্রমাণিত হবেন। যাদের ছাড় না দেওয়ার কারণে এ অনৈক্য দূরীভূত হচ্ছে না, দিনদিন বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে, মনে রাখবেন– দ্বীন ও মিল্লাতের জন্য ক্ষতিকর অনৈক্য জিইয়ে রাখার একজন পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তারা দুনিয়াতেও তিরস্কৃত হবেন এবং আখিরাতেও কঠিন জবাবদিহি থেকে বাঁচতে পারবেন না।

ঠ. একে অন্যের পেছনে না লাগা

একে অন্যের পেছনে লাগা, একে অন্যের ত্রুটিবিচ্যুতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করা একটি জঘন্যতর অপরাধ। এতে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব ও শত্রুতা তৈরি হয়। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا تَجَسَّسُوا-"একে অপরের (দোষ খোঁজার জন্য তার পেছনে) গোয়েন্দাগিরি করো না।"[৩১৬] রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا-"একে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানোর জন্য গোয়েন্দাগিরি করো না এবং একে অন্যের মন্দ কথা জানতে চেয়ো না।"[৩১৭]

বৃহত্তর ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রেও এরূপ কাজের মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। প্রত্যেক দলই যদি তার প্রতিপক্ষ দলের পেছনে লেগে থাকে, তার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করে চর্চা করতে থাকে, তাহলে দলগুলোর মধ্যে বড়ো ধরনের ফাটল ও দূরত্ব তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে প্রতিপক্ষ দোষত্রুটিতে ভরা– এরূপ ধারণা যদি একবার কারও মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে স্থান করে নেয়, তাহলে এতে একদিকে তাদের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ ও আস্থা হ্রাস পাবে, অপরদিকে তা তাদের বিপক্ষে অহেতুক অভিমত সৃষ্টিতে উসকানি দেবে। কাজেই আলিমদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একে অন্যের ভুল ও ত্রুটিবিচ্যুতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

---

৩১৬. আল-কুরআন, ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত) : ১২

৩১৭. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, হা. নং : ৪৬/৪৮৪৯

https://nagorikpathagar.org

ড. ইখতিলাফের আদব ও নিয়মাবলি মেনে চলা

আলিমদের অনৈক্য দূরীভূত করতে এবং তাঁদের মধ্যে সদ্ভাব তৈরি করতে সকলকেই ইখতিলাফের আদব, সৌজন্য ও নিয়মাবলি যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের ইলমী জগতে তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিভিন্ন মতামতের নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার পথ প্রায় রুদ্ধ। প্রায় সকলেই নিজের পছন্দের মাসলাক ও দলের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটি বিষয় দেখতে ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত। এ কারণে আলিমদের মধ্যে সৃজনশীল গবেষণামূলক মনোবৃত্তি খুব বেশি গড়ে উঠছে না। তাঁরা প্রায়ই পূর্ববর্তী আলিমগণ তাঁদের সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যা বলে গেছেন, তার চৌহদ্দির মধ্যেই আবর্তন করতে থাকেন। সময় ও পরিস্থিতি উপলব্ধি করে দলীল ও যুক্তিভিত্তিক নতুন কিছু সমাধান দেবেন– সেই যোগ্যতা তাঁদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। বলতে গেলে, বর্তমানে তাঁরা প্রায় সকল ক্ষেত্রে লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে তাঁদের পূর্ববর্তী ইমাম, শাইখ ও আকাবিরের সম্পূর্ণ অন্ধ-অনুকরণই করে থাকেন। ফলে তাঁদের মধ্যে নিজেদের পছন্দের ব্যক্তি, মাসলাক, মাযহাব বা দলের মতামতকে– ভালো হোক বা মন্দ, ঠিক হোক বা বেঠিক– পুরো মেনে চলার মনোবৃত্তি গেড়ে বসেছে। ব্যক্তিগত বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে অভিমত প্রদান এবং ভালো-মন্দ পরখ করে পক্ষ অবলম্বনের চর্চা বা সুযোগ প্রায়ই বন্ধ বলা চলে। এর একটি নেতিবাচক প্রভাব হলো, আলিমগণের মধ্যে অহেতুক ও যুক্তিহীন মতপার্থক্য ও বিভেদ-বিসংবাদ ক্রমশ বেড়েই চলছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য মতপার্থক্যের আদব ও নিয়মাবলি ভালোভাবে রপ্ত ও চর্চা করা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আলিমগণ যদি তাঁদের পারস্পরিক সংলাপ ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে এ আদব ও নিয়মাবলি অনুশীলন না করেন, তাহলে তা হবে এ উম্মতের পতনের আরও ভয়াবহ একটি উপলক্ষ্য। এ কারণে অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় মতপার্থক্যের ক্ষতি থেকে মুক্তির জন্য একদিকে তাঁদেরকে তাঁদের ইলমী বন্ধ্যাত্ব ঝেড়ে ফেলার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, অপরদিকে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে অনুসৃত আদব ও নিয়মাবলি যথাযথরূপে মেনে চলতে হবে।

ইতঃপূর্বে ১ম অধ্যায়ে শরীয়তের ব্যাবহারিক বিষয়াদিতে ইখতিলাফের কতিপয় নিয়ম ও আদব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলিমগণ তো সেসব বিষয়ে ইখতিলাফের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত সব নিয়ম ও আদব অবশ্যই মেনে চলবেনই,

https://nagorikpathagar.org

অন্যান্য বিষয়েও মতানৈক্যের ক্ষেত্রে ওইসব আদব ও নিয়মের পাশাপাশি এমন সব আদব ও নিয়মও মেনে চলবেন, যা সাধারণত মুসলিম সমাজের স্বাভাবিক আদব ও সৌজন্য বলেই পরিচিত এবং যা মতপার্থক্যের ক্ষেত্রেও আদব হিসেবেই অনুসৃত হয়। নিম্নে এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় আদব ও নিয়ম তুলে ধরা হলো[৩১৮]:

ড.১. বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ও সুন্নাহর অনুসরণ

মুমিনমাত্রই এ কথা বিশ্বাস করে যে, যেকোনো কথা বা আমল আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণের উপযোগী হওয়ার জন্য এবং তা থেকে দুনিয়ায় সুন্দর ফলাফল লাভ করার জন্য যেমন তার পেছনের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ হতে হবে, তেমনি তা রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হতে হবে। কাজেই একজন আলিম যখন অন্য আলিমের সাথে কোনো বিষয়ে ইখতিলাফ করতে গিয়ে আলাপ কিংবা তর্ক করবেন, তখন একদিকে তাঁর একান্ত লক্ষ্য হবে– 'আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সত্যকে জানা, হক উন্মোচন করা, হক প্রতিষ্ঠা করা'; নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও পাণ্ডিত্য দেখানো কিংবা নিজের পছন্দের মাসলাক ও দলের কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করা তাঁর উদ্দেশ্য হবে না। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর জীবনে বিরোধীদের সাথে আলাপ ও তর্ক করার ক্ষেত্রে যেসব সৌজন্য ও শিষ্টাচার রক্ষা করে চলতেন, একজন আলিমও সাধ্যমতো সেসব মেনে চলবেন। যেমন– তিনি বিরোধীদের সাথে আলাপ বা র্তক করার সময় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবেন না, অশ্রাব্য ও অরুচিকর ভাষা ব্যবহার করবেন না, কোনো কথা বা আচরণের কারণে বিরোধীরা যাতে কোনো ধরনের আঘাত না পায়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন, আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কথা না বলে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলবেন প্রভৃতি।

ড.২. বিরোধীদের হিদায়াত কামনা করা

বিরোধী পক্ষ তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যতই নিন্দনীয় পথ অনুসরণ করুক না কেন, আলাপ ও তর্কের সময় একজন নিষ্ঠাবান সত্যাশ্রয়ী আলিমের একান্ত উদ্দেশ্য হবে– তারা যেন সত্যের দিশা লাভ করে, সঠিক পথে ফিরে

---

৩১৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন, ড. আয়িদ আল-কারনী, *আল-খিলাফ : আসবাবুহু ও আদাবুহু*, পৃ. ৩৮-৬১; তরীকুল ইসলাম, *মতপার্থক্য ও অনৈক্য : ইসলাম কী বলে* (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)।

https://nagorikpathagar.org

আসে। কারণ, একজন সত্যিকার আলিমের ঐকান্তিক কামনা তো এটাই হওয়া উচিত যে, একজন পথভ্রষ্ট মানুষ সত্য পথের সন্ধান পাবে, সঠিক পথে ফিরে আসবে। রাসূলুল্লাহ সা. সাইয়িদুনা আলী রা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

"আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা তোমার মাধ্যমে একজন লোককেও যদি হিদায়াত করেন, এটা তোমার জন্য লাল উটগুলোর মালিক হওয়ার চেয়েও অনেক উত্তম।"[৩১৯]

রাসূলুল্লাহ সা. নিজেও তাঁর বিরোধীদের হিদায়াত ও নাজাতের ব্যাপারে এত বেশি উদ্‌বিগ্ন ছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন–

﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾

"(হে নবী,) যদি এরা এ কথার ওপর ঈমান না আনে, তাহলে মনে হয় দুঃখ-কষ্টে আপনি এদের পেছনে নিজেকেই বিনাশ করে দেবেন।"[৩২০]

কাজেই এ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিরোধীদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ও ভালোবাসা দেখিয়ে কাছে টেনে কথা বলতে হবে। এটি ইখতিলাফের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার।

ড.৩. বিরোধীদের বক্তব্য ও যুক্তি-প্রমাণ শোনা

মতপার্থক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার হলো– বিরোধীদের ব্যাপারে কোনো মতামত প্রকাশের আগে তাদের সাথে খোলামেলা আলাপ করতে হবে, তাদের চিন্তা ও যুক্তি-প্রমাণগুলো মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। কেবল নিজের মত ও বক্তব্যটাই পেশ করব, অন্যের মত ও বক্তব্য শুনবই না– তা কোনো আলাপের শিষ্টাচারের মধ্যেই পড়ে না। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. প্রতিপক্ষ কাফির-মুশরিকদেরও তাদের বক্তব্য ও যুক্তি-প্রমাণ পেশের জন্য সুযোগ দিতেন এবং নিজে তা মনোযোগ সহকারে শুনতেন।

---

৩১৯. বুখারী, *আস-সহীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা. নং : ৩৪২৫; মুসলিম, *আস-সহীহ*, (কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা), হা. নং : ৪৪২৩

৩২০. আল-কুরআন, ১৮ (সূরা আল-কাহফ) : ৬

https://nagorikpathagar.org

ড.৪. দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন

যেকোনো মতপার্থক্য অবশ্যই দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে হতে হবে। দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কেবল বাগাড়ম্বরতার জোরে কিংবা ভয়ভীতি দেখিয়ে কোনো মত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করা যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি এ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত মত কোনো সুফলও বয়ে আনবে না; বরং বিভেদ আরও বাড়াতে থাকবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের তাদের কাছে কোনো দলীল-প্রমাণ থাকলে তা উপস্থাপন করে কথা বলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন–

﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾

"(হে নবী, তাদের) বলুন, তোমাদের কাছে কি (সত্যিই) কোনো ইলম (মজুদ) রয়েছে, (থাকলে) তা বের করে আমাদের জন্য নিয়ে এসো। বস্তুতপক্ষে তোমরা তো আন্দাজ-অনুমানের ওপর (নির্ভর করেই) কথা বলো এবং (হামেশাই) মিথ্যার অনুসরণ করো।"[৩২১]

অন্য একটি আয়াতে তিনি বলেন–

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"(হে নবী, তাদের) বলুন, তোমরা তোমাদের দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।"[৩২২]

কাজেই মতপার্থক্য এমন দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে হওয়া উচিত, যাতে একদিকে বিরোধীদের মত ও চিন্তার অসারতা ফুটে ওঠে, অপরদিকে নিজেদের মত ও চিন্তার যৌক্তিকতা ও প্রামাণিকতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় ।

ড.৫. শান্ত ও ভদ্রভাবে জবাব দান করা

নিজের চিন্তা ও কর্ম যতই সত্যনির্ভর ও যৌক্তিক হোক না কেন, তা সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিরোধীদের দলীল-প্রমাণগুলো মার্জিত ভাষায় খণ্ডন করতে হবে, শান্ত ও ভদ্রভাবে তাদের কথার জবাব দিতে হবে। এ কারণে লক্ষ

---

৩২১. আল-কুরআন, ৬ (সূরা আল-আনআম) : ১৪৮

৩২২. আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) : ১১১

https://nagorikpathagar.org

রাখতে হবে– যাতে বিরোধীদের সাথে আলাপ বা তর্কের সময় কণ্ঠস্বর বেশি উঁচু ও কর্কশ হয়ে না যায়। উল্লেখ্য যে, খুতবা ও ওয়াজের ক্ষেত্রে ভাবাবেগের কারণে অনেক সময় কণ্ঠস্বর বড়ো হয়ে যায়; এটা দোষণীয় নয়। কিন্তু পারস্পরিক আলাপ বা তর্কের সময় কণ্ঠস্বর বড়ো করা খুবই আপত্তিকর ও দোষণীয়, শিষ্টাচারবহির্ভূত কাজ। আল্লাহ তাআলাও বলেন, ﴿وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾-"তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো। নিশ্চয় সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ।"[৩২৩]

উম্মতের দুজন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির কণ্ঠস্বর উঁচু করে কথা বলাকেও যথোচিত মনে করা হয়নি। ইবনু আবী মুলাইকা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুজন উত্তম ব্যক্তি আবূ বাকর ও উমার রা. ধ্বংস হওয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু করেছিলেন, যখন তামীম গোত্রের প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে এসেছিল। তাঁদের একজন মুজাশি গোত্রের ভাই আকরা ইবনু হাবিসের দিকে ইঙ্গিত করলে অপরজন অন্য ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন আবূ বাকর রা. উমার রা.-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনার উদ্দেশ্য হলো, কেবল আমার বিরোধিতা করা।' এ কথা শুনে উমার রা. বললেন, 'না, আমার উদ্দেশ্য আপনার বিরোধিতা করা নয়।' এ ব্যাপারে কথাবার্তায় তাঁদের দুজনের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ الْآيَةَ-"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না।..." রাবী ইবনুয যুবাইর রহ. বলেন, 'এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর উমার রা. এতই ক্ষীণস্বরে কথা বলতেন যে, পুনরায় জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তা শুনতে পেতেন না'।"[৩২৪]

সুতরাং মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে আলাপের সময় মার্জিত ভাষায় অনুচ্চঃস্বরে ও শান্তভাবে প্রতিপক্ষের দলীল-প্রমাণগুলো খণ্ডন করতে হবে। আমরা প্রায়ই হকপন্থি লোকদের পারস্পরিক আলাপ ও তর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় দেখতে পাই। তাঁরা অত্যন্ত ধীরেসুস্থে ও যথাযোগ্য সৌজন্য রক্ষা করে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকেন। পক্ষান্তরে সত্যচ্যুত বাতিল বা ভ্রষ্টাচারী লোকদের প্রায়ই আলাপের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ওপর ক্ষোভ প্রকাশের

---

৩২৩. আল-কুরআন, ৩১ (সূরা লুকমান) : ১৯

৩২৪. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-তাফসীর, সূরা আল-হুজুরাত, হা. নং : ৪৫৬৪

https://nagorikpathagar.org

উদ্দেশ্যে কণ্ঠস্বর উঁচু করে কথা বলতে দেখি, কথায় কথায় প্রতিপক্ষের ওপর গরম হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তাদের একান্ত উদ্দেশ্য থাকে, কথার জোরে নিজেদের হকপন্থি ও শুদ্ধাচারী হিসেবে জাহির করা।

ড.৬. নিজের অবস্থান থেকে নেমে কথা বলা

পারস্পরিক তর্ক ও আলাপের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো– প্রতিপক্ষকে হকের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য শুরুতে নিজেকে এভাবে প্রকাশ করা, যাতে সে বুঝতে পারে যে, বক্ষ্যমাণ বিষয়ে আপনার অবস্থান সুদৃঢ় নয়। আপনি কথার শুরুতে বলবেন যে, এটি আমার অভিমত; তবে এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এরপর আপনি আপনার মতের পক্ষে দলীল-প্রমাণগুলো ধীরে ধীরে তুলে ধরবেন। আপনার এরূপ কৌশল অবলম্বনের ফলে আশা করা যায়, প্রতিপক্ষ আপনার প্রতি ঝুঁকে পড়বে, সে আপনার যুক্তি-প্রমাণ আগ্রহভরে শুনতে চাইবে এবং ভাবতে শুরু করবে যে, হয়তো তার মতও সঠিক হতে পারে। এভাবে সে একপর্যায়ে আপনার মতকে সঠিক বলে মেনে নিতে পারে কিংবা নিজের অবস্থানে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾- "(হে নবী,) আপনি (তাদের) বলুন, হয় আমরা কিংবা তোমরা হিদায়াতের ওপর আছি অথবা সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে আছি।"[৩২৫] এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর অনুসারীগণ হিদায়াতের ওপর রয়েছেন, পক্ষান্তরে কাফিররা সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে রয়েছে। এরপরও আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরকে কাফিরদের সাথে এ কৌশলে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। এর পেছনে উদ্দেশ্য হলো– প্রতিপক্ষ কাফিরদের নিজেদের দিকে টানা– এ আশায় যে, তারা রাসূল সা. ও মুমিনদের এ বিনয়-নম্রতা দেখে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তাঁদের উপস্থাপিত বক্তব্য ও দলীল-প্রমাণগুলো শুনে সেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে।

ড.৭. মতৈক্যের দিকগুলো আগে উল্লেখ করা

পারস্পরিক তর্ক ও আলাপের আরও একটি নিয়ম হলো– যেসব বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, সেগুলোর আগে যেসব বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আলাপের সূত্রপাত করা। অর্থাৎ, শুরুতে বিতর্কের

---

৩২৫. আল-কুরআন, ৩৪ (সূরা সাবা) : ২৪

https://nagorikpathagar.org

বিষয়গুলো উল্লেখ না করে ঐকমত্যের বিষয়গুলো তুলে ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ। এতে বিরোধীদের মানবিক উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয়। সে কঠোর অবস্থান থেকে সরে এসে বিরোধীর প্রতি কিছুটা হলেও নমনীয় হতে বাধ্য হয়। বিরোধী কেবল বিরোধীই, তা নয়; বরং তার সাথে আমাদের অনেক মিলও তো আছে– এমন একটি অনুভূতি তাকে নাড়া দিতে থাকে– যা মতপার্থক্যের দাবদাহ প্রশমিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। কাজেই মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে এরূপ কৌশল অবলম্বনের ফলে ভালো ও কার্যকর ফলাফল লাভ করা সম্ভব। আল্লাহ তাআলাও তাঁর রাসূলকে আহলে কিতাবের সাথে বিতর্কের সময় শুরুতে ঐকমত্যের বিষয়টি তুলে আনতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾- " (হে নবী,) আপনি বলুন, হে কিতাবধারীরা, এসো আমরা এমন একটি কথায় (উভয়ে একমত হই), যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান, অভিন্ন।"[৩২৬]

ড.৮. বিরোধের ক্ষেত্র ও পরিধি সুনির্দিষ্ট করা

অনেক সময় দেখা যায় যে, তর্কের সময় কেউ কেউ নির্দিষ্ট কোনো বিষয় ও পয়েন্টের ওপর আলোচনা না করে এলোমেলো কথা বলে। আবার কেউ কেউ কোন বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে– তা না জেনেই কথা বলা শুরু করে দেয়। ফলে বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, পারস্পরিক বিরোধ আরও বেড়ে যায়। এ কারণে তর্কের আগেই বিরোধের বিষয় ও আলোচনার পরিধি সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন, যাতে কেউ বিষয়ের বাইরে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে না পারে এবং প্রত্যেকেই বিষয়ের ওপর নিজের দলীল ও যুক্তি-প্রমাণগুলো সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করতে পারে।

ড.৯. তর্কিত বিষয়ের প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বীন ও শরীয়তের কিছু বিষয় হলো মৌলিক ও মুখ্য, আর কিছু হলো শাখাগত ও গৌণ; কিছু বিষয় হলো অকাট্য ও সন্দেহাতীতভাবে সুপ্রমাণিত আর কিছু বিষয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়; বরং প্রবল ধারণানির্ভর কিংবা দুর্বল সূত্রে বর্ণিত; কিছু বক্তব্য হলো দ্ব্যর্থহীন

---

৩২৬. আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলে ইমরান) : ৬৪

https://nagorikpathagar.org

আর কিছু বক্তব্য হলো নানারূপ ব্যাখ্যার সম্ভাবনাময়; কিছু বিষয় হলো সর্বজনজ্ঞাত আর কিছু বিষয় দ্বীন ও শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানী ও সমঝদার লোকেরাই কেবল জানেন।

দ্বীন ও শরীয়তের উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু বিধান নিয়ে মতপার্থক্যের কোনো সুযোগই নেই। এগুলো অস্বীকার করলে কিংবা মেনে না চললে তা ইরতিদাদ (দ্বীন থেকে বিচ্যুতি) কিংবা জঘন্য পাপাচাররূপে গণ্য হবে। আর কিছু বিষয় আছে, যেগুলো নিয়ে মতপার্থক্য করার অবকাশ রয়েছে। এ জাতীয় বিষয়গুলো কেউ অস্বীকার করলে কিংবা মেনে না চললে তা ইরতিদাদ কিংবা জঘন্য পাপাচাররূপে গণ্য হবে না।

সুতরাং তর্কের আগে বিরোধের বিষয়টির প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানা থাকা প্রয়োজন। কারণ, তা জানা না থাকলে যেমন অনেক সময় দ্বীনের মৌলিক নয়– এমন শাখাগত ইজতিহাদী বিষয়ে তর্ক করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে, তেমনি দ্বীনের মৌলিক ও অকাট্য বিষয়ে তর্ক করতে গিয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন হতে পারে। যেমন– সালাতের ফরযিয়্যাত নিয়ে মতপার্থক্য করা আর সালাতুল বিতরের রাকআতের সংখ্যা ও আদায়ের স্বরূপ নিয়ে মতপার্থক্য করা এক নয়। প্রথমটি দ্বীনের মৌলিক ও অকাট্য বিষয়, যা মুমিনমাত্রই অবগত আর দ্বিতীয়টি দ্বীনের শাখাগত বিষয়, যা নানা ইজতিহাদের অবকাশ রাখে। প্রথমটির ক্ষেত্রে বিরোধ দ্বীন ও শরীয়তের বিরুদ্ধে রীতিমতো বিদ্রোহরূপে গণ্য। কাজেই সেটাকে 'মতপার্থক্য' বলে হালকা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বিরোধ প্রকৃত অর্থে মতের ভিন্নতা, যা শারঈ দলীলের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এরূপ মতভিন্নতা নিয়ে পারস্পরিক আলাপ হতে পারে; কিন্তু তা নিয়ে উম্মতের মধ্যে কোনোরূপ বিভাজন তৈরি করা চরমভাবে নিন্দনীয়। তাই বিরোধীদের সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়ার আগে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রকৃতি ও গুরুত্ব জেনেই অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। তর্কের ভাষা, যুক্তি উপস্থাপন ও বিরোধীদের সাথে আচরণ প্রভৃতির ধরন আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃতির ওপরই নির্ভর করবে।

ড.১০. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালার দিকে প্রত্যাবর্তন

একজন সত্যিকার আলিমের পরিচয় হলো, তিনি কেবল বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করবেন না; বরং সত্য উন্মোচিত হলে তিনি তা স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করে নেবেন– এরূপ মানসিকতা নিয়েই বিরোধীদের সাথে পারস্পরিক সংলাপ

https://nagorikpathagar.org

ও তর্কে লিপ্ত হবেন। এ কারণে মতবিরোধকে জিইয়ে না রেখে সকল পক্ষের জন্য উচিত হলো– যেটি সত্য ও ন্যায্য, সেটি গ্রহণের জন্য উদারচিত্তে এগিয়ে আসা। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে পারস্পরিক মতপার্থক্য নিরসনের সূত্র স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন–

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

"অতঃপর কোনো ব্যাপারে যদি তোমরা একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফায়সালার জন্য) আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ তাআলার ওপর এবং পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো। (তাহলে) এ পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং পরিণামের দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা।"[৩২৭]

এ আয়াতে সকল মুমিনকেই স্পষ্ট এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা তর্ক-বিবাদের সময় দলীয় ও গোষ্ঠীগত সকল গোঁড়ামি ত্যাগ করে চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের দিকে বিবাদের বিষয়টি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এখানে আল্লাহ তাআলার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো– কুরআনের ফায়সালার কাছে আত্মসমর্পণ করা আর রাসূলুল্লাহ সা.-এর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো– (বিশুদ্ধসূত্রে প্রমাণিত) সুন্নাতের কাছে আত্মসমর্পণ করা। এ দুটিতে যে সমাধানই পাওয়া যাবে, তা সকলেই কোনো ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই উদারচিত্তে মেনে নেবে; এমনকি তা যদি নিজেদের এবং নিজেদের পছন্দের মাসলাক ও দলের বিরুদ্ধেও যায়। সকল আলিমই যদি আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশ অনুসারে আমল করতে পারেন, তাহলে আশা করা যায় যে, তাঁদের মধ্যকার অনেক মতপার্থক্যই নিরসন হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। কাজেই কোনো বিষয়ে যদি একজন আলিমের সাথে অন্য আলিমের মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে তাঁদের একান্ত কর্তব্য হলো– তাঁরা একজন অপরজনকে বলবেন, আসুন! আমরা ফায়সালার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাই এবং সেখানে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে আমাদের বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করি।

---

৩২৭. আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ৫৯

https://nagorikpathagar.org

ড.১১. ফায়সালার জন্য বিজ্ঞ আলিমদের শরণাপন্ন হওয়া

কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে পারস্পরিক মতপার্থক্য নিরসনের একটি উত্তম পথ হলো– সমাজের নিষ্ঠাবান বিজ্ঞ আলিমগণের শরণাপন্ন হওয়া, যাঁরা সালাফে সালিহীনের অনুসৃত রীতি অনুসারে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো যোগ্যতা রাখেন। আল্লাহ বলেন, ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾- "তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা না জানো।"[৩২৮] কাজেই নিষ্ঠাবান আলিমগণের ফায়সালা গ্রহণ করে নেওয়ার মাধ্যমেও পারস্পরিক মতপার্থক্যের থাবা থেকে বিবদমান আলিমগণ মুক্তি লাভ করতে পারেন।

সাহাবীগণের মধ্যেও এ রীতি প্রচলিত ছিল যে, যখনই তাঁদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিত, তখন তাঁরা তাঁদের মধ্যকার বিজ্ঞ আলিমের শরণাপন্ন হতেন। যেমন– আবওয়া নামক স্থানে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. ও মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ রা.-এর মধ্যে 'মুহরিম মাথা ধৌত করতে পারবে কি না'– এ প্রসঙ্গে মতপার্থক্য দেখা দেয়। ইবনু আব্বাস রা. বললেন, ধৌত করতে পারবে, পক্ষান্তরে মিসওয়ার রা. বললেন, পারবে না। সুতরাং তাঁরা দুজনে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য আবূ আইয়ূব আল-আনসারী রা.-এর ফায়সালা কামনা করলেন। আবূ আইয়ূব রা. বিষয়টি এভাবে ফায়সালা করলেন যে, তিনি তাঁর হাতটি কাপড়ের ওপর রেখে তা নিচু করলেন, এমনকি এ অবস্থায় তাঁর মাথা প্রকাশ পেল। এরপর তিনি এক ব্যক্তিকে তাঁর মাথায় পানি ঢালতে বললেন। লোকটি তাঁর মাথায় পানি ঢালল, আর তিনি হাত দিয়ে তাঁর মাথা নাড়লেন এবং তিনি মাথায় দু-হাত দিয়ে একবার সামনে আনলেন, আবার পেছনে নিলেন। এরপর বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে এরূপ করতে দেখেছি'।"[৩২৯] মোজার ওপর মাসহের ব্যাপারেও সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. মোজাদ্বয়ের ওপর মাসহ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. তাঁর পিতার থেকে বিষয়টি জানতে চান। তখন উমার রা. বলেন, نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ- "হ্যাঁ, যখন সাদ রা. রাসূলুল্লাহ সা.-এর ব্যাপারে থেকে তোমাকে কিছু বর্ণনা করবে, তখন ওই বিষয়ে তুমি অপর কারও থেকে জিজ্ঞেস করো না।"[৩৩০]

---

৩২৮. আল-কুরআন, ২১ (সূরা আল-আম্বিয়া) : ৭

৩২৯. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইহসার.., হা. নং : ২৫/১৭৪৩

৩৩০. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু উমার রা.), হা. নং : ৮৮; হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

https://nagorikpathagar.org

কাজেই আলিমগণও তাঁদের মতপার্থক্যের সময় সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলিমকে– যোগ্য হওয়ার শর্তে– মীমাংসার জন্য ডাকতে পারেন এবং সকলেই তাঁর প্রদত্ত ফায়সালা মেনে বিরোধ থেকে বিরত থাকতে পারেন।

ড.১২. বিরোধীদের কথার ন্যায্যতা ও সত্যতা স্বীকার করা

মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, সে যেকোনো ব্যাপারে নিজের অবস্থান ও মতকে বিশুদ্ধ ও কল্যাণকর মনে করে। পক্ষান্তরে অপরের অবস্থান ও মতকে ভুল বা ক্ষতিকর মনে করে। এ কারণে সহজেই কেউ অন্যের প্রতি নিরপেক্ষ হতে পারে না। নিজের অবস্থান পরিমাপ করতে না পারা এবং চিন্তা ও জ্ঞানের জড়তা থেকেই এ অবস্থার উদ্ভব হয়। আবার কেউ কেউ দলীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেও বিরোধীদের কথা সত্য ও ন্যায্য হওয়া সত্ত্বেও তা অস্বীকার করে থাকে। এভাবে অন্যের চিন্তা ও মতকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় না রাখা এবং তার কথার ন্যায্যতা ও সত্যতা অস্বীকার করা চরম অন্যায়।

মতপার্থক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার হলো– যখনই বিরোধী পক্ষ ন্যায্য ও যুক্তিসংগত কোনো কথা বলবে, তখন তা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করে নেবে। বস্তুতপক্ষে সত্য অনুসন্ধান এবং এর কাছে আত্মসমর্পণ প্রত্যেকেরই লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত। যার কাছেই সত্য পাওয়া যাবে, তা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হওয়া মুমিন চরিত্রের একটি প্রধান ভূষণ। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها

"হিকমত (সত্যাশ্রিত বক্তব্য) হলো মুমিনের হারানো সম্পদ। সে যেখানে তা পাবে, সে তা লুফে নেওয়ার অধিক হকদার।"[৩৩১]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের মুজতাহিদ ইমামগণ যদিও নানা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের অনুসৃত একটি রীতি ছিল যে, তাঁদের কেউ যখনই লক্ষ করতেন, তাঁর মতের চেয়ে অন্যের মত বিশুদ্ধ দলীলনির্ভর, তখনই তিনি প্রসন্নচিত্তে নিজের মত পরিত্যাগ করে তাঁর মত গ্রহণ করে নিতেন। এক্ষেত্রে কোনোরূপ স্বার্থপরতা ও হঠকারিতা তাঁদের স্পর্শ করেনি। তাঁদের সকলেরই একান্ত উদ্দেশ্য ছিল সত্যানুসন্ধান। এ কারণে

৩৩১. তিরমিযী, *আস-সুনান*, হা. নং : ২৬৮৭; ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি গরীব।

https://nagorikpathagar.org

তাঁদের মধ্যে যদিও বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মাযহাবও গড়ে উঠেছে; কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো দলাদলি ও বিভেদ তৈরি হয়নি। পক্ষান্তরে আমাদের বদ অভ্যাস হলো, নিজ বা নিজ দল বা মাসলাকের বিপক্ষে গেলেই আমরা আর কারও সত্য ও ন্যায্য কথাও স্বীকার করতে চাই না। এ মারাত্মক ব্যাধির কারণে প্রতিপক্ষ যত সত্যনির্ভর অভিমতই দিক না কেন, আমরা তা গ্রহণ করি না; বরং এর বিপরীতে অন্যায্য ও অসত্য মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্যত হই। এরূপ আচরণ মতপার্থক্যের শিষ্টাচারের স্পষ্টত পরিপন্থি। আমরা সকলেই যদি সত্য ও ন্যায্যতার কাছে ফিরে যেতে অভ্যস্ত হতে পারতাম, তাহলে আমাদের পক্ষেও মতপার্থক্যের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা অনেকখানি সহজ হতো এবং উম্মতও বহুধা বিভাজনের কবল থেকে রেহাই পেত।

ড.১৩. বিরোধীদের ইজ্জত-আব্রুর ওপর আঘাত না হানা

মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে তর্ক ও আলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার হলো– কেউ কারও ইজ্জত-আব্রুর ওপর আঘাত হানবে না। প্রত্যেকেই অপরকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে কথা বলবে। মতপার্থক্যকে সহনশীল পর্যায়ে রাখার জন্য এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখা একান্ত প্রয়োজন। কেউ আপনার পছন্দের মতের সাথে একমত নয় বলে তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, গালমন্দ করা, মিথ্যা ট্যাগ লাগানো প্রভৃতির কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। এরূপ আচরণের কারণে পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য তো আরও বাড়বেই; বরং তা তাদের মধ্যে বিভেদ-বিভাজনকে আরও উসকে দেবে।

বর্ণিত আছে, বিশিষ্ট ফকীহ ইবনু কুদামাহ রা. যখন কারও সাথে তর্ক করতেন, তখন তার চেহারায় মৃদু হাসির আভা ফুটে উঠত। জনৈক আলিম তো মন্তব্য করেন, هذا والله يقتل الناس بتبسمه-'আল্লাহর কসম! ইনি তো দেখি তাঁর হাসি দিয়েই লোকদের ধরাশায়ী করে ফেলেন।' বস্তুতপক্ষে কারও ইজ্জত-আব্রুর ওপর আঘাত নয়; বরং মৃদু হাসি, শান্তভাব ও মার্জিত আচরণ প্রভৃতিই প্রতিপক্ষের অহমিকা ও ঔদ্ধত্যকে চূর্ণ করে দেয়। এরূপ আচরণের ফলে কখনও সে তার অবস্থান থেকে নিচে নেমে এসে সাগ্রহে আপনার কথা শুনবে এবং আপনাকে মূল্যায়ন করবে; কখনও তো এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার একান্ত ইচ্ছায় বিরোধও নিরসন হয়ে যেতে পারে।

https://nagorikpathagar.org

মতপার্থক্য নিরসন করা কিংবা সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য অনুসৃত শিষ্টাচার যদি অকার্যকরও হয়ে পড়ে, তাহলেও ধৈর্যহারা হয়ে বিরোধী পক্ষের সম্মানহানি করা স্বাভাবিক শিষ্টাচারের পর্যায়ে পড়ে না। বরং সব সময় তাদের ইজ্জত-আব্রুর প্রতি লক্ষ রেখেই অগ্রসর হতে হবে। এটিই হলো দাওয়াতের ক্ষেত্রে কুরআনে অনুসৃত সাধারণ মানহাজ। আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের বহু জায়গায় নাম ধরে না ডেকে ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾-'হে আহলে কিতাব' বলে সম্বোধন করেছেন। রাসূলুল্লাহ সা.-ও তাঁর দাওয়াতী জীবনে এ মানহাজ অনুসরণ করেছেন। তিনি কট্টর কাফিরদের সাথেও মতপার্থক্যের মজলিসে তাদের নাম ধরে না ডেকে সম্মানের সাথে তাদের উপনামকে ব্যবহার করে সম্বোধন করতেন। কট্টর কাফির উতবাহ ইবনু রাবীআহকে তিনি আবুল ওয়ালীদ বলে আর মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবন সালূলকে আবুল হুবাব বলে সম্বোধন করেছেন। কাজেই পারস্পরিক মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে তর্ক ও আলাপের সময় সকলকেই রাসূলুল্লাহ সা.-এর এ সুন্নাত অনুসরণ করে যেতে হবে।

ড.১৪. শত্রু হলেও বিরোধীদের প্রতি সুবিচার করা

সুবিচার করা, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা মুমিন চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরের প্রতি সুবিচার করা, তাকে তার ন্যায্য অধিকার দান করা একজন মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে অবিচল দাঁড়িয়ে থেকো। (মনে রেখো, বিশেষ) কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, (এর ফলে) তোমরা (তাদের সাথে) ন্যায় ও ইনসাফ করবে না। তোমরা সুবিচার করো। কারণ, এটিই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলার অধিক নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।"[৩৩২]

---

৩৩২. আল-কুরআন, ৫ (সূরা আল-মায়িদাহ) : ৮

https://nagorikpathagar.org

ইসলামের এ অনুপম সৌন্দর্য সমুন্নত রাখা এবং কারও সাথে তর্ক করার ক্ষেত্রেও যাতে তা ম্লান না হয়, সেদিকে সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন। যার সাথে মতপার্থক্য হয়– তার সাথে যা ইচ্ছা করলাম, তাকে যা ইচ্ছা বললাম, তার ইজ্জত-আব্রু নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করলাম– এ ধরনের আচরণ সুবিচার ও ন্যায্যতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। মোটকথা, সুবিচার ও ন্যায্যতা একটি সামাজিক শিষ্টাচার; মতপার্থক্যের ক্ষেত্রেও তা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।

আমরা লক্ষ করি যে, যারা জীবনে এ নিয়মনীতি অনুসরণ করতে অভ্যস্ত নয়, তাদের সামনে যখনই আপনি তাদের কোনো প্রতিপক্ষের ভালো কোনো গুণ বা কীর্তি নিয়ে আলোচনা করবেন, তখন তারা আপনার ওপর রাগে ফেটে পড়ে, আপনাকে শায়েস্তা করে ছাড়ে। পার্থিব ক্ষেত্রে এরূপ আচরণ তো প্রায়ই ঘটে; কিন্তু দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রেও এরূপ আচরণ প্রতিনিয়ত ঘটছে। বরং এক্ষেত্রে এরূপ আচরণ আরও জঘন্যভাবে প্রকাশ পেতে দেখা যায়। কারণ, চিন্তা-বিশ্বাস-ধর্মের কারণে পরস্পরের মধ্যে যে শত্রুতা জন্ম নেয়, তা সাধারণত অন্য যেকোনো শত্রুতার চেয়েও জঘন্য হয়ে থাকে। এ কারণে জনৈক কবি বলেন–

كل العداوات قد ترجى إماتتها *** إلا عداوة من عاداك في الدينِ .

"প্রত্যেক শত্রুতার অবলুপ্তির আশা করা যায়; কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের কারণে যে ব্যক্তি তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, সেই শত্রুতার অবলুপ্তির আশা করা যায় না।"[৩৩৩]

তবে বিদআতীদের কীর্তিসমূহ উল্লেখের প্রসঙ্গটি ভিন্ন। কারণ, এতে জনমনে তাদের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাওয়ার এবং তাদের মাধ্যমে বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সকল বিদআতীই সমপর্যায়ের নয়। কাজেই আচরণের ক্ষেত্রেও সকলকে একই সারিতে নিয়ে আসা সমীচীন নয়। বিদআতীদের সাথে আচরণ কীরূপ হবে– সেই আলোচনা আমরা পরে করছি।

ড.১৫. বিরোধীদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা

কারও প্রতি নিছক আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে খারাপ ধারণা পোষণ করা একটি মারাত্মক ব্যাধি– যা পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব ও বিভেদ তৈরির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে নানা নির্দেশনা এসেছে।

---

৩৩৩. আয়িদ, *আল-খিলাফ : আসবাবুহু ওয়া আদাবুহু*, পৃ. ৫৫

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা বেশি বেশি ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, কিছু কিছু (ক্ষেত্রে) ধারণা (আসলেই) অপরাধ।"[৩৩৪]

'ইফক' (উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রা.-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ রটানো)-এর ঘটনায় মুমিনরা কেন ভালো ধারণা পোষণ করল না? সে সম্পর্কে তাদের তিরস্কার করে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾

"যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন মুমিন নর ও মুমিন নারীরা তাদের নিজেদের সম্পর্কে কেন সুধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, এটা তো একটি সুস্পষ্ট অপবাদ।"[৩৩৫]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

"তোমরা কারও প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় খারাপ ধারণা সর্বাপেক্ষা জঘন্য মিথ্যা।"[৩৩৬]

এ হাদীসে কারও প্রতি খারাপ ধারণাকে 'সবচেয়ে বড়ো মিথ্যা' বলা হয়েছে। কখনও খারাপ ধারণার কারণে দুনিয়াতেও খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়। জাবির ইবনু সামূরাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কূফাবাসীরা সাদ রা.-এর বিরুদ্ধে উমার রা.-এর নিকট অভিযোগ করল এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁর পরিবর্তে আম্মার রা.-কে শাসক নিযুক্ত করলেন। কূফাবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে এও বলে যে, তিনি সুচারুরূপে সালাত আদায় করতে পারেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে উমার রা. তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'হে আবূ ইসহাক, তারা আপনার বিরুদ্ধে

---

৩৩৪. আল-কুরআন, ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত) : ১২

৩৩৫. আল-কুরআন, ২৪ (সূরা আন-নূর) : ১২

৩৩৬. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, হা. নং : ৪৬/৪৮৪৯

https://nagorikpathagar.org

অভিযোগ করছে যে, আপনি নাকি সুচারুরূপে সালাত আদায় করতে পারেন না।' সাদ রা. জবাব দেন, 'আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুরূপই সালাত আদায় করে থাকি। এতে আমি সালাতুল ইশা আদায় করার ক্ষেত্রে প্রথম দু-রাকআত একটু দীর্ঘ এবং শেষের দু-রাকআত সংক্ষিপ্ত করে থাকি।' এ জবাব শুনে উমার রা. বলেন, ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ-'হে আবূ ইসহাক, আপনার সম্পর্কে তো আমারও তো এ-ই ধারণা।'

এরপর উমার রা. কূফার অধিবাসীদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সাদ রা.-এর সাথে কূফায় পাঠান। সে ব্যক্তিটি প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সাদ রা. সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল এবং তারা সকলেই তাঁর সুনাম করল। অবশেষে ব্যক্তিটি বনু আবস গোত্রের মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে উসামাহ ইবনু কাতাদাহ নামে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'যেহেতু তুমি আল্লাহ তাআলার নামে কসম করে জানতে চাচ্ছ, তাই আমি বলছি, সাদ রা. কখনোই সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধে যান না, গনীমতের সম্পদ সমভাবে বণ্টন করেন না এবং বিচারে ইনসাফ করেন না।' এটি দেখে সাদ রা. বললেন, 'মনে রেখো, আল্লাহর কসম! আমি তিনটি দুআ করছি, হে আল্লাহ! যদি আপনার এ বান্দা মিথ্যাবাদী হয়; লোক দেখানো কিংবা আত্মপ্রচারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তার হায়াত বৃদ্ধি করে দিন, তার অভাব বৃদ্ধি করে দিন এবং তাকে ফিতনার সম্মুখীন করুন!' পরবর্তীকালে লোকটিকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলত, شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ-'আমি একজন বয়োবৃদ্ধ লোক; কিন্তু ফিতনায় জড়িত। সাদ রা.-এর বদদুআ আমার ওপর পড়েছে।' রাবী আবদুল মালিক রহ. বলেন, 'অতি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তার উভয় ভ্রু চোখের ওপর ঝুলে পড়েছে এবং সে পথে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করত এবং তাদের চিমটি কাটত'।"[৩৩৭]

কাজেই বোঝা যায়, মানুষের প্রতি আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে খারাপ ধারণা পোষণ করা মারাত্মক পাপ। মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে তর্কের সময় তা সম্পূর্ণ পরিহার করে চলা প্রয়োজন। কারও প্রতি খারাপ ধারণা থাকলে সে যতই বস্তুনিষ্ঠ ও দলীলনির্ভর কথা বলুক না কেন– তার প্রতি আস্থার সংকট তৈরি হয়, অহেতুক মতপার্থক্য সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে অন্যের প্রতি

---

৩৩৭. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : সিফাতুস সালাত, হা. নং : ১৩/৭২২

https://nagorikpathagar.org

খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকা মতপার্থক্যকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার অন্যতম উপায়। কাজেই যখন আপনি লক্ষ করবেন যে, কোনো মুসলিম ভাই কোনো ভুল চিন্তা বা কাজ করছে, তখন শুরুতে আপনি তার সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করবেন এবং সে ব্যাপারে নিজে কোনো বিরূপ চিন্তা না করে বরং তার বক্তব্য শুনবেন। এরপর সত্যাসত্য যাচাই করবেন।

ড.১৬. ব্যবহারের বেলায় প্রতিপক্ষের স্থানে নিজেকে ভাবা

প্রত্যেক লোকই প্রত্যাশা করে যে, অন্যরা তার সাথে সুন্দর ও ভালো আচরণ করুক। কেউ তাকে একান্ত উপদেশ দিলে তা যেন পরিশীলিত ভাষায়, হাসিমুখে ও নম্রস্বরে দান করুক, সরাসরি না বলে ইশারা-ইঙ্গিতে বলুক। নিজের ব্যক্তিত্ব, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সামান্যতম আঘাত লাগুক– তা কেউ চায় না। কেউ তাকে বাতিল বা বিদআতী কিংবা গুমরাহ বলুক– তা কেউ চায় না। সুতরাং এ ধরনের কিছু ব্যবহার আছে– যা প্রত্যেকেই অন্যের নিকট থেকে কামনা করে। আবার এ ধরনের কিছু ব্যবহার আছে– যা কেউ অন্যের নিকট থেকে প্রত্যাশা করে না। এ ধরনের কামনা-প্রত্যাশা অবশ্যই খারাপ কিছু নয়; এটি মানুষের সহজাত চাহিদা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে আলাপ ও তর্কের সময় বিরোধীদেরও যে এমন কামনা-প্রত্যাশা রয়েছে, তা প্রায় মানুষ বেমালুম ভুলে যায়। মতপার্থক্যের সময় বিরোধী পক্ষকে নিজের স্থানে বসিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করতে পারলে তাদের প্রতি এমন আচরণ করাটাই আমরা প্রাধান্য দিতে পারতাম, যেমনটি আমরা নিজেরা অন্যের নিকট থেকে কামনা করি। আর এমনটি করতে পারলে মতপার্থক্যের উপর্যুক্ত সকল শিষ্টাচার ও নিয়ম মেনে চলা আমাদের পক্ষে অতি সহজতর হতো, মতপার্থক্যের মঞ্চ উত্তপ্ত হতে পারত না, খুবই সুন্দর ও শালীন একটি পরিবেশ সকলেই উপলব্ধি করতে পারত।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"তোমাদের কেউ (পূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না, যে যাবৎ-না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[৩৩৮]

---

৩৩৮. বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, হা. নং : ৬/১৩

https://nagorikpathagar.org

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায়, নিজের বেলায় যা পছন্দ করা হয়, তা অন্যের বেলায়ও পছন্দ করা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। কাজেই সমালোচনা বা তর্কের সময় নিজেকে বিরোধী পক্ষের স্থানে ভেবে নিজের বেলায় তাদের পক্ষ থেকে যেরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি, তাদের বেলায়ও অনুরূপ আচরণ করা একান্ত আবশ্যক। আমরা যেন কখনোই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এ কথা ভুলে না যাই, ﴿كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾-"তোমরাও আগে এমনিই ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন।"[৩৩৯] অর্থাৎ, আমরাও একসময় তাদের মতো ভুলভ্রান্তিতে ছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুগ্রহ করে সত্যের দিশা দান করেছেন। সুতরাং যারা এখনও ভুলভ্রান্তিতে আছে, তাদের প্রতি সদয় হতে হবে, তাদের সুন্দর আচরণ ও ভালোবাসা দিয়ে কাছে টেনে এনে সৎপথে পরিচালনার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বিদআত চর্চাকারীদের সাথে আচরণ

বহু বিদআতই অনেক মুসলমানের জীবনে অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে খুবই দৃঢ়ভাবে গেড়ে বসেছে। তারা এসব বিদআতকে হক ও দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশই মনে করে। অধিকন্তু, তারা বিশ্বাস করে যে, এ সকল কাজ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের অন্যতম পথ। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

"তারপর আমি (তাদের বংশে) একের পর এক অনেক রাসূলই প্রেরণ করেছি। তাদের পর (একপর্যায়ে) আমি মারয়ামপুত্র ঈসাকে (রাসূল বানিয়ে) পাঠিয়েছি এবং তাঁকে আমি ইনজিল দান করেছি। যারা তার আনুগত্য করেছে, তাদের মনে (তার প্রতি) দয়া ও করুণা দান করেছি। (তার অনুসারীদের অনুসৃত) সন্ন্যাসবাদের উদ্ভব (আসলে) তারা নিজেরাই ঘটিয়েছে। আমি কখনোই এটি তাদের

৩৩৯. আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা) : ৯৪

https://nagorikpathagar.org

জন্য নির্ধারণ করে দিইনি। (আমি শুধু বলেছিলাম) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে। অতঃপর তারা এর যথাযথ হক আদায় করেনি। তারপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের আমি (যথার্থ) পুরস্কার দিয়েছি। কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই ছিল পাপিষ্ঠ।"[৩৪০]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, বিদআতপ্রবণ অধিকাংশ লোকই নিরন্তর সত্যের অন্বেষায় থাকে; তবে এ উদ্দেশ্যে তারা যে পথ অনুসরণ করে, তা অবশ্যই সঠিক পথ নয়। তারা ভুল পথ অনুসরণ করে। তারা নানারূপ নতুন নতুন ইবাদাত ও কর্ম সম্পাদন করে এবং বিশ্বাস করে যে, এগুলো হক। এ কারণে বিদআতপ্রবণ লোককে– যদি না সে যিন্দীক (ইসলামবিদ্বেষী) হয়– মুসলিম হিসেবেই সর্বাবস্থায় স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং তার অবস্থা প্রকাশ্য কুফর কিংবা শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক ভালো বলে বিবেচিত হবে। তবে অবশ্যই দ্বীন ও মিল্লাতের ক্ষতির দিক থেকে কাফির ও মুশরিকদের তুলনায় বিদআতীদের ভূমিকা অত্যন্ত মারাত্মক। কারণ, প্রথমত, কাফির ও মুশরিকদের ভূমিকা স্পষ্ট। সাধারণ মুসলিমরা তাদের কথা ও কাজ দ্বারা প্রতারিত হয় না। অপরদিকে বিদআতীরা যা বলে বা করে, তা সবই ঈমান ও ইবাদাতের নামেই করে। ফলে সাধারণ মুসলিমরা তাদের কথা ও কর্ম দ্বারা সহজেই প্রতারিত হয়। দ্বিতীয়ত, বিদআত ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে বিকৃত করে দেয় এবং লোকদের সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে নানা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। ফলে উম্মতের মধ্যে দেখা দেয় নানা ভাঙন, বিপর্যয় ও দলাদলি। এ দিকেই ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে, যাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া বাকি সব দলই জাহান্নামী হবে।' এ কারণে তিনি বিভিন্ন হাদীসে উম্মতকে বিদআত ও বিদআতীদের ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন।

বিদআতপ্রবণ লোকেরা সামগ্রিক বিবেচনায় যেহেতু মুসলিম সমাজেরই সদস্য এবং উম্মতের অংশবিশেষ, তাই ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও শারঈ অধিকারসমূহ তারা নিশ্চয়ই ভোগ করবে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো– তারা মুসলিম সমাজের সুস্থ সদস্য নয়; ব্যাধিগ্রস্ত সদস্য। শরীরে কোনো রোগ হলে যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি মুসলিম সমাজের সুস্থতা ও সংহতির জন্য এসব ব্যাধিগ্রস্ত লোকের চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, যাতে একদিকে

---

৩৪০. আল-কুরআন, ৫৭ (সূরা আল-হাদীদ) : ২৭

https://nagorikpathagar.org

তারা ইসলামের সুস্থ ধারায় ফিরে আসে, অপরদিকে মুসলিম সমাজ তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে। তবে এজন্য প্রয়োজন বিজ্ঞজনোচিত চিকিৎসাপদ্ধতির অনুসরণ।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ প্রচারে সচেষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সমাজ সংস্কার ও বিদআত নির্মূলের উদ্দেশ্যে অতি বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সাথে এ কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। এক্ষেত্রে তাঁদের অত্যন্ত ধৈর্যশীল, উদার, বিনয়ী, সদাচারী, মিষ্টভাষী ও কৌশলী হতে হবে, যাতে বিদআত চর্চাকারী ব্যক্তিরা তাঁদের সুন্দর কথা ও ব্যবহার দেখে হক গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করে। তা ছাড়া বিদআতগুলো যেভাবে সমাজে শিকড় গেড়ে বসেছে, যেহেতু এসব বিদআত একই পর্যায়ভুক্ত নয় এবং একসাথে সব ধরনের বিদআত সমাজ থেকে নির্মূল করাও সম্ভব নয়, তদুপরি রাসূলুল্লাহ সা.-এর সব ধরনের সুন্নাতও সমাজে একসাথে প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, তাই সুন্নাহ প্রচারে সচেষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একদিকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাতের নানা স্তর ও প্রকরণ, অপরদিকে বিদআতের নানা পর্যায় ও ক্ষতি সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে, যাতে বিদআতের ক্ষতি ও ভয়াবহতার মাত্রানুযায়ী তাঁরা পর্যায়ক্রমে সময়োচিত ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। প্রথমে বড়ো বড়ো বিদআত ও বিদআত চর্চাকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিদআত ও বিদআত চর্চাকারীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা জোরালো করতে হবে ও ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি সুন্নাত অনুসরণের গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রচারণাও বৃদ্ধি করতে হবে।

এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ, বিদআত দূর করতে গিয়ে বিদআতে নিমজ্জিত মানুষদের যদি বলা হয় যে, আপনারা বিদআতী; আপনারা যা করছেন, এগুলো তো সব বিদআত ও ভ্রান্ত; এগুলো আপনাদের জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ সেই কথা শুনবে না; বরং তারা নিরন্তর বিরোধিতাই করে যাবে। আর যদি বিদআতের নাম না নিয়ে সুন্নাতের মহব্বত ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর অনুসরণের মর্যাদা কী, তাঁকে ভালোবাসার স্বরূপ কী, সুন্নাতের একান্ত অনুসরণই তাঁকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয় বেশি বেশি বর্ণনা করা হয়, তাহলে এটি মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে এবং সুন্নাতের প্রতি তারা আকৃষ্ট হবে। ফলে একদিকে ধীরে ধীরে সুন্নাতের প্রসার ঘটবে, অপরদিকে ক্রমে বিদআত উঠে যাবে। তাতে মূল কাজই বেশি হবে। তাই বিদআতের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে সুন্নাতের প্রসারতায় আত্মনিয়োগই হবে

https://nagorikpathagar.org

অধিক কার্যকর ও ফলদায়ক ব্যবস্থা। কাজেই বিদআত চর্চাকারীদের সকলকেই পাইকারি হারে প্রবৃত্তিপূজারি ও বিদআতী নামে আখ্যায়িত করা এবং তাদের সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়। এরূপ আচরণ বিজ্ঞজনোচিত নয়।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সকল বিদআত একই পর্যায়ের নয়। তন্মধ্যে কোনোটি দ্বীনের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর, আবার কোনোটি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর; কোনোটি কুফরের পর্যায়ভুক্ত, কোনোটি পাপের পর্যায়ভুক্ত, আবার কোনোটি কেবল অশোভনীয়। বিদআতে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের মধ্যেও কেউ কেউ নিজের বিদআতের পক্ষে জোর প্রচারণা চালায় এবং লোকদের তদনুসারে আমলের জন্য নানাভাবে প্ররোচনা দেয়, আবার কেউ নীরব, সে তার বিদআতের পক্ষে প্রচারণাও চালায় না এবং লোকদেরও তদনুসারে আমলের জন্য আহ্বানও জানায় না; তাদের মধ্যে কেউ নানা উদ্দেশ্যে সচেতন ও ইচ্ছাকৃতভাবে বিদআত চর্চা করে, আবার কেউ নিছক অজ্ঞতা ও অসর্তকতার কারণে বিদআত চর্চা করে। এ কারণে বিদআত চর্চাকারী সকলের হুকুম যেমন একই রূপ হবে না, তেমনি তাদের সাথে আচরণও একই ধরনের হবে না; বরং বিদআতের ক্ষতি ও ভয়াবহতার মাত্রা এবং ব্যক্তির অবস্থা ও ভূমিকা অনুসারে বিদআত ও বিদআত চর্চাকারীদের সাথে ন্যায়ানুগ ও যথোপযুক্ত আচরণ করতে হবে। কারও বিরুদ্ধে হয়তো কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে, আবার কারও সাথে বিনম্র আচরণ কিংবা শৈথিল্য প্রদর্শন করাও সময় ও অবস্থার দাবি হতে পারে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় সংস্কারকদের মধ্যে বিদআত চর্চাকারীদের অবস্থা ও ভূমিকা এবং সময় ও পারিপার্শ্বিকতা প্রভৃতি আন্দাজ করার মতো যোগ্যতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ হিতে বিপরীত হতে পারে এবং কল্যাণের পরিবর্তে ফিতনা বৃদ্ধি পেতে পারে।

ইমাম শাতিবী রহ. বিদআত চর্চাকারীদের সাথে আচরণের পনেরোটি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

ক. সঠিক নির্দেশনা ও শিক্ষাদান এবং দলীল-প্রমাণ সহকারে বিদআতের অসারতা প্রমাণ করা। উল্লেখ্য যে, ইসলামের ইতিহাসে খারিজীরাই হলো প্রথম বিদআতী সম্প্রদায়। তারা ইসলামের মধ্যে নানা বিদআত চালু করে। বর্ণিত রয়েছে, সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. খারিজীদের কাছে গিয়ে তাদের বিভিন্ন বিদআতের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন এবং যুক্তি-প্রমাণ সহকারে তাদের বিদআতগুলোর অসারতা তুলে ধরেন। ফলে তাদের দু-তিন হাজার লোক খারিজী মত ত্যাগ করে।

https://nagorikpathagar.org

খ. সঠিক নির্দেশনা দানের পরও যদি বিদআত চর্চাকারীরা বিদআত থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তাদের একান্ত সংশোধনের নিয়তে এড়িয়ে চলতে হবে। তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখা এবং একান্তে ওঠাবসা ও সালাম-কালাম করা সমীচীন নয়। কারণ, এতে তারা অনুপ্রাণিত হবে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সালাফে সালিহীনের অনুসৃত রীতি ছিল, তাঁরা বিদআত চর্চাকারীদের সাথে কোনোরূপ সুসম্পর্ক রাখতেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

"আপনি যখন এমন সব লোককে দেখতে পাবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে দোষ খুঁজে বেড়ায়, তখন আপনি তাদের এড়িয়ে চলুন, যতক্ষণ-না তারা অন্য কথায় মনোনিবেশ করে। যদি কখনও শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে (ওখানে বসিয়ে) রাখে, তাহলে মনে পড়ার পর আপনি যালিম সম্প্রদায়ের সাথে আর বসে থাকবেন না।"[৩৪১]

এ আয়াত থেকে জানা যায় তর্ক-বিবা যেসব লোক দ্বীন ও শরীয়ত নিয়ে অন্যায় ও অমূলক কথাবার্তা বলে, তাদের এড়িয়ে চলতে হবে এবং তাদের আসরে গমন করা ও তাদের সাথে একান্তে বসা উচিত নয়। সাইয়িদুনা কাব ইবনু মালিক রা.-এর ঐতিহাসিক ঘটনা প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু আবদিল বার [৩৬৮-৪৬৩ হি.] রহ. বলেন–

وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع، وهجرته، وقطع الكلام عنه

"বিদআতীদের থেকে দূরে সরে থাকা এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে এ ঘটনাটি আলিমদের নিকট একটি প্রামাণ্য দলীল হিসেবে বিবেচিত।"[৩৪২]

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মুহিউস সুন্নাহ আল-বাগভী [৪৩৬-৫১০ হি.] রহ. বলেন–

وفيه، أي حديث كعب بن مالك، دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد

"এ ঘটনার মধ্যে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, বিদআতীদের সাথে স্থায়ীভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে।"[৩৪৩]

---

৩৪১. আল-কুরআন, ৬ (সূরা আল-আনআম) : ৬৮

৩৪২. ইবনু আবদিল বার, *আত-তামহীদ*, খ. ৪, পৃ. ৮৭

৩৪৩. বাগভী, *শারহুস সুন্নাহ*, খ. ১, ২২৭

https://nagorikpathagar.org

গ. বিদআত চর্চাকারী ও তাদের বিদআত সম্পর্কে লোকদের জানাতে হবে এবং সচেতন করে তুলতে হবে, যাতে বিদআত চর্চাকারীরা সতর্ক হয়ে যায়, আর অন্য লোকেরাও তাদের কথায় প্রতারিত না হয়।[৩৪৪]

আমরা মনে করি, যেসব বিদআতের ব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, অর্থাৎ তা সুন্নাত নাকি বিদআত, এ জাতীয় বিদআতের ব্যাপারে কাউকে বিদআতী ও গুমরাহ অভিধায় অভিহিত করা সমীচীন নয়। অনুরূপভাবে সমাজে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোক হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ যেসব ছোটোখাটো বিদআতে লিপ্ত হয়, যদি এসব বিদআতের কোনো সংগত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তাহলেও এদের এসব বিদআতে লিপ্ত হওয়ার কারণে বিদআতী বা গুমরাহ অভিধায় অভিহিত করা সমীচীন নয় এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক নষ্ট করাও উচিত নয়। মনে করতে হবে– এ সজ্জন ব্যক্তিরা সমস্যাগ্রস্ত। এ কারণে ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রেখে তাদের বিদআতগুলোর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং সুকৌশলে তাদের বিদআত থেকে ফেরানোর চেষ্টা করতে হবে। অনুরূপভাবে সাধারণ লোক, যারা অসচেতনতা কিংবা অজ্ঞতাবশত নানা ছোটোখাটো বিদআত চর্চা করে, তাদেরও বিদআতী বলা সমীচীন নয়। দাওয়াত ও ইসলাহের মনোবৃত্তি নিয়ে দরদের সাথে তাদের ভুলভ্রান্তিগুলো সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। তবে যেসব ব্যক্তি নানা পার্থিব স্বার্থে কুফর বা শিরক কিংবা বড়ো পাপের পর্যায়ভুক্ত নয়– এরূপ অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর বিদআতের প্রচারণায় লিপ্ত থাকে এবং লোকদের তা আমলের জন্য আহ্বান জানায়, তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। তাদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে এবং সংশোধনের মানসে তাদের সাথে একান্তে ওঠাবসা বন্ধ করে দিতে হবে।

আর যেসব বিদআতের ব্যাপারে উম্মতের সকল কিংবা অধিকাংশ আলিমই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, তা কুফর বা শিরকের পর্যায়ভুক্ত কিংবা দ্বীনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর (যেমন– কুফর ও শিরক জাতীয় নানা চিন্তা [যেমন– হুলূল] এবং কবরকেন্দ্রিক শিরকের পর্যায়ভুক্ত নানা বিদআত), সেসব বিদআতের বিরুদ্ধে যেমন জোরালো প্রচার-প্রচারণা চালানো প্রয়োজন, তেমনি সেসব বিদআত চর্চাকারীর বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা প্রয়োজন।

---

৩৪৪. শাতিবী, *আল-ইতিসাম*, খ. ১, পৃ. ১৩৭

https://nagorikpathagar.org

এদের 'বিদআতী' নামে অভিহিত করা যাবে এবং তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখা বৈধ নয়। প্রথমে তাদের তাওবার আহ্বান জানানো হবে। যদি তারা তাওবা করে ফিরে না আসে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি উত্থাপন করা হবে। সরকার তাদেরকে তাদের অনুসৃত বিদআতের ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী বিচারসাপেক্ষে যেকোনোরূপ শাস্তি দিতে পারবে। বর্ণিত আছে, সাবীগ আস-সুলামী ছিল একজন বিদআতপ্রবণ লোক। এ কারণে সাইয়িদুনা উমার রা. তাঁকে বেত্রাঘাত করেন এবং লোকদের তার সাথে ওঠাবসা করতে বারণ করেন, সর্বশেষে তিনি তাকে দেশান্তরিতও করেন।[৩৪৫]

ইসলামে দল গঠনের হুকুম

নীতিগতভাবে ইসলামে এমন যেকোনো কর্ম নিষিদ্ধ, যা উম্মতের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করে এবং মতপার্থক্য বৃদ্ধি করে। তবে দ্বীনের নির্দিষ্ট কোনো কর্ম সম্পাদন বা কোনো ভালো উদ্দেশ্যে মুমিনদের মধ্যকার কিছু লোক যদি দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ হয় এবং এর ফলে যদি মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে কোনোরূপ ফাটল তৈরি না হয় এবং তারা অন্যদের দ্বীন থেকে খারিজ বা বাতিল বলে গণ্য না করে, তাহলে এ ধরনের সংঘবদ্ধতা নিন্দিত দলাদলি বা বিভক্তি বলে গণ্য হবে না। এটা মূলত ঐক্যের মধ্যে থেকেও কর্ম ও অঙ্গনের বিভাজন, যা দোষণীয় নয়। যেমন– দাঈগণ সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে পারেন; সমাজ ও রাষ্ট্রে দ্বীন প্রতিষ্ঠা কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দানের উদ্দেশ্যে সংগঠন গড়ে তোলা যেতে পারে, সেবা ও কল্যাণমূলক নানা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে প্রভৃতি। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের পথে মানুষকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।"[৩৪৬]

---

৩৪৫. বাযযার, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু উমার রা.), হা. নং : ২৯৯; আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা. নং : ২০৯০৬; শাতিবী, *আল-ইতিসাম*, খ. ১, পৃ. ১৩৭

৩৪৬. আল-কুরআন, ৩ (সূরা আলে ইমরান) : ১০৪

https://nagorikpathagar.org

এ আয়াত থেকে জানা যায়, গণমানুষের কল্যাণ সাধন, মানুষের সেবা, ইকামতে দ্বীন এবং আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার প্রভৃতি দায়িত্ব পালনের মহৎ উদ্দেশ্যে দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ হওয়া দোষণীয় তো নয়ই; বরং ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যত রকমের দ্বীনী ও বৈষয়িক দল, গোষ্ঠী ও সংগঠন রয়েছে, নগণ্যসংখ্যক ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সবার মধ্যে কমবেশি নেতিবাচক ও অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কাজেই এক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ইসলামে একান্ত কাম্য হলো, সকল মুসলিমই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারাদিতে সর্বদা একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে নানা কারণে তা সম্ভব নয় বললেই চলে এবং এরূপ কিছু আশা করাও সুদূরপরাহত। কারণ, বর্তমানে মানুষের যে চিন্তানৈতিক অবস্থা ও মতপার্থক্য, তাতে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, সরকার পরিচালনা ও শাসনকার্য নির্বাহ করার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন থাকতে পারে। অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের বিভিন্ন কর্মসূচি থাকাও সম্ভব। কাজেই আমরা মনে করি যে, তাদের নানা চিন্তা ও কর্মসূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনও গড়ে তোলা যেতে পারে। যেমন– ফিকহী মাসআলাসমূহে উম্মতের ফকীহদের বিভিন্ন চিন্তা ও মত রয়েছে। তদুপরি এ বিভিন্ন চিন্তা ও রায়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন ফিকহী মাযহাবও গড়ে উঠেছে। কিন্তু মাযহাবগুলোর মতবিরোধ যেমন উম্মতের ঐক্যের পরিপন্থি নয় এবং উম্মতের মধ্যে কোনো গ্রুপিং ও দলাদলি সৃষ্টি করেনি, তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের জন্যও শর্ত হচ্ছে, তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থি হতে পারবে না এবং উম্মতের মধ্যে কোনো গ্রুপিং ও দলাদলি সৃষ্টির উপলক্ষ্য হতে পারবে না। তা ছাড়া প্রত্যেক সংগঠনের সকল কর্মকাণ্ড ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের সংগঠনসমূহ নিজেদের কর্মসূচির পক্ষে জনগণের মাঝে প্রচারণা চালাতে পারবে, সমমনা লোকদের সংগঠিত করতে পারবে এবং বিভিন্ন নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে পারবে।

আলিমদের নামের সাথে গোষ্ঠীগত পরিচয় প্রসঙ্গ

অনেক আলিমই নিজেদের নামের সাথে নিজেরা যে মত ও চিন্তা পোষণ করেন, সে দিকে সম্বন্ধ করে একটি বিশেষণ যুক্ত করে থাকেন। যেমন–

https://nagorikpathagar.org

দেওবন্দী ধারার আলিমগণ নিজেদের নামের সাথে দেওবন্দী, সালাফী ধারার আলিমগণ নিজেদের নামের সাথে সালাফী ও বেরেলভী ধারার আলিমগণ নিজেদের নামের সাথে বেরেলভী যুক্ত করে থাকেন। অনুরূপভাবে তরীকতপন্থিরা নিজেদের নামের সাথে কাদিরী, মুজাদ্দিদী, চিশতী প্রভৃতি যুক্ত করে থাকেন। অনুরূপভাবে মুকাল্লিদরা নিজেদের নামের সাথে হানাফী, শাফিয়ী, মালিকী ও হাম্বলী প্রভৃতি বিশেষণ যুক্ত করে থাকেন। এরূপ প্রবণতা একে তো মুসলিম সমাজে নতুন। সালাফে সালিহীনের মধ্যে এরূপ কোনো প্রবণতা লক্ষ করা যায় না। উপরন্তু, পরিণামের দিক থেকেও এরূপ কাজ মোটেই সুখকর নয়। কেননা, যেখানে ইসলামে সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং নিজেদের মধ্যে কোনোরূপ ভেদাভেদ তৈরি না করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে নামের মধ্যে এমন কোনো বিশেষণ যুক্ত করা মোটেই সমীচীন হবে না, যা দ্বারা উম্মতের লোকদের মধ্যে বিভাজন ও পক্ষপাতিত্ব বোঝা যায়।[৩৪৭]

উল্লেখ্য, কারও কাছে কোনো নির্দিষ্ট ধারা বা গোষ্ঠীর চিন্তা ও কর্ম যুক্তিযুক্ত মনে হলে হয়তো তিনি সেই ধারার অনুবর্তন করতে পারেন; কিন্তু তাই বলে সেই ধারা বা গোষ্ঠীর প্রতি গোঁড়ামি ও পক্ষপাতমূলক আচরণ করা মোটেই কাম্য নয়। এটা উম্মতের ঐক্যের জন্য হুমকি। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ...﴾

"নিশ্চয় যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোনোই সম্পর্ক নেই।..."[৩৪৮]

এ প্রসঙ্গে শাইখ ইবনু সালিহ আল-উছাইমীন রহ. বলেন–

ولا الانتساب، فالانتساب معناه: أنك تشعر بأنك منفرد عن الآخرين، وكيف تنفرد عن الآخرين وهم إخوانك من المؤمنين إذا ما أخطئوا في شيء عَمَلي أو عَقَدي، إذْ الذي ينبغي عليك أن تجتمع بهم وتناقشهم وتبين لهم الخطأ.

"'ইন্তিসাব' (কোনো দলের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে নিজের পরিচয় দান করা)-ও সমীচীন নয়। কারণ, এর মানে দাঁড়ায়– আপনি ভাবছেন যে, আপনি অন্যদের থেকে আলাদা। (আপনার এ ভাবনা যথার্থ নয়;

---

৩৪৭. *ফাতাওয়াল লাজনাত*.., খ. ১, পৃ. ১৮৭

৩৪৮. আল-কুরআন, ৬ (সূরা আল-আনআম) : ১৫৯

https://nagorikpathagar.org

কারণ,) আপনি অন্যদের থেকে কীভাবে আলাদা হবেন? তারা তো আপনার মুমিন ভাই। যখন তারা কোনো বিষয়ে– চাই তা ব্যাবহারিক হোক কিংবা বিশ্বাসগত– ভুলও করে থাকেন, তখন আপনার দায়িত্ব হলো, আপনি তাদের সাথে মিলিত হয়ে সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করবেন এবং তাদের ভুলত্রুটিগুলো স্পষ্ট করে দেবেন।"[৩৪৯]

শেষকথা

উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা ইসলামের একটি বড়ো মৌলিক ফরয। এখানে অনৈক্য ও বিভেদের কোনো সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীসের মর্মানুসারে মুসলিম জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কুফর এবং পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত হওয়া হারাম ও জঘন্যতর পাপ। উম্মাহর একান্ত অভিভাবক হিসেবে অন্যদের তুলনায় আলিমদের ওপর এ দায়িত্ব বেশি বর্তায় যে, তাঁরা উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করতে এবং অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দূর করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োগ করবেন।

বলাই বাহুল্য, ইসলামের শত্রুরা বসে নেই। তারা তাদের সকল উপায়-উপকরণ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে চলেছে। তাদের একটি প্রধান কৌশল হচ্ছে– 'ভাগ করো এবং শাসন করো' (Divide and Rule)। এটা তাদের বহুলাংশে সুযোগ করে দিয়েছে আলিমদের মতানৈক্যের কারণে। সুখের বিষয় হলো, ইসলামের শত্রুদের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উম্মাহর বহু সদস্যই, বিশেষ করে যুবকরা বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে, আর কেউ দাওয়াহ ও তাযকিয়ার মাধ্যমে, আর কেউ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে। তবে এসব উপায় পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় ও সমঝোতার অভাবে সমস্যার উত্তরণে কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। ফলে সমস্যা তিমিরেই থেকে যাচ্ছে।

উম্মাহদরদী নিষ্ঠাবান মুসলিমরা সব সময় আন্তরিকভাবে উম্মাহর সংকট উত্তরণ করতে চেয়েছেন, এখনও তাঁদের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান অবস্থায় তাঁরা অন্তত দুটি উদ্দেশ্যে সফল হতে চান :

এক. ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা ও অন্য আদর্শগুলোর অসারতা প্রমাণ করা। এর মাধ্যমে তাঁরা আশা করছেন,

---

৩৪৯. ইবনু সালিহ আল-উছাইমীন, *লিকাউল বাবিল মাফতূহ*, খ. ৪৫, পৃ. ১৫

https://nagorikpathagar.org

মুসলিমদের মনমানসিকতায় ও চিন্তাচেতনায় বিশুদ্ধতা আসবে। ফলে ইসলামের শাশ্বত শিক্ষার আলোকে একটি সুন্দর মুসলিম সমাজের পত্তন হবে।

দুই. ইসলামের বিরুদ্ধে নানা প্রোপাগান্ডা দূর করে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার একক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু এটা বড়োই দুঃখের কারণ, উম্মাহর একান্ত অভিভাবক আলিমগণ তাঁদের নানা ইখতিলাফ, মত ও পথ থেকে উত্তরণের কোনো উপায় অবলম্বন করেননি। ফলে ইসলাম নানা পথ ও মত দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আর তাঁদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ লেগে আছে, যা উম্মাহকে বড়োই বেদনাবিধুর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সুতরাং বর্তমানে আলিমদের একটি প্রধান কর্তব্য হচ্ছে– ইসলামের অকাট্য ও নিগূঢ় সত্যসমূহ সুন্দর ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং কালবিলম্ব ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই তার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসা।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎকে সংশোধন ও উজ্জ্বল করতে হলে ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং অতীত ঐতিহ্যের অনুসরণ ব্যতিরেকে গত্যন্তর নেই। আর এ লক্ষ্যে পৌঁছা কেবল তখনি সম্ভব হবে, যখন উম্মতের আলিমগণ উম্মতের স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনে নিজেদের দলীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ ও মতভেদের উর্ধ্বে উঠে অন্তত কমন ইস্যুগুলোতে ঐক্যবদ্ধ হবেন। ইসলামের ইতিহাসে পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় আজ তার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

আলিমগণ যদি অন্তত দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে পারেন, তা-ই হবে উম্মতের জন্য বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। যদি তাঁরা সিসাঢালা প্রাচীরের মতো পরস্পর এক হয়ে যেতে পারেন, তবে তাঁরা উম্মাহর জন্য বহু কল্যাণ সাধন করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

সূর্যের অনেক আলোকরশ্মি একটি কাগজের টুকরোকে জ্বালাতে সক্ষম নয়; কিন্তু একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে যখন সূর্যের আলোকরশ্মিগুলোকে একটি সূত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন কাগজের টুকরোটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হতে বাধ্য। তেমনিভাবে যদি আলিমগণ ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন, তা হলে সকল বাতিল ও আল্লাহদ্রোহী পরাশক্তি তাঁদের সামনে দাঁড়াবার হিম্মত পাবে না।

https://nagorikpathagar.org

তারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও পর্যুদস্ত হবে। আর তাঁরা এখনও যদি নিজেদের মধ্যকার মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারেন, তাহলে যেমন দ্বীন ও মিল্লাত ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তেমনি তাঁরা নিজেরাও চরমভাবে অপমানিত হবেন, নিগৃহীত হবেন।

অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো– আলিমগণ আজও দলমত-নির্বিশেষে ছোটো-বড়ো বিষয়ে মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে অন্তত কমন ইস্যুগুলোতেও ঐক্যবদ্ধ হতে পারছেন না। এ ঐক্যবদ্ধ হতে না পারার পেছনে যে বা যারা– কম হোক বা বেশি– দায়ী, তাদের এ কথা মনে রাখা উচিত, তাদের সকলকেই আখিরাতে আল্লাহ তাআলার নিকট অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। অনেকেই তো এমনও আছেন, যারা একই মাসলাক ও দলের অভ্যন্তরেও নানা স্বার্থের পেছনে পড়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মতপার্থক্য তৈরি করে মাসলাক ও দলকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলছেন, তাঁরাও কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট জবাবদিহির হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না। ফিকহী মতপার্থক্যের ছত্রছায়ায় জন্ম নেওয়া বৈধ মতপার্থক্যও যদি পারস্পরিক দলাদলি ও বিভেদের উপলক্ষ্যে পরিণত হয়, তবে সেই মতপার্থক্যও হারামে পরিণত হয়। বাংলাদেশে হানাফী ও আহলে হাদীসের আক্রমণাত্মক ও বিদ্বেষপূর্ণ মতবিরোধ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ কারণে ইলমী জগতে মতপার্থক্য সীমিত পর্যায়ে অনুমোদিত বলে তার চর্চা করতে করতে আমরা যে শোচনীয় অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছি, তা কিন্তু আমরা সকলেই উপলব্ধি করছি। আমরা আমাদের মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে পারস্পরিক মূল্যায়ন ও পরমতসহিষ্ণুতার যে চিত্র দেখতে পেয়েছি, তার সাথে আমাদের বর্তমান যুগে আলিমদের পারস্পরিক গীবত ও কাদা ছোড়াছুড়ির তুলনা করলে আমরা যে মতপার্থক্যের বল্গাহীন ঘোড়ায় আরোহণ করে জাহান্নামের দিকে ক্রমে ধাবিত হচ্ছি, তা সহজেই অনুমেয়।

মোটকথা, সকল অনৈক্য ও বিদ্বেষমূলক বিরোধ তো বটেই, এমনকি জীবনের যেকোনো পর্যায়ে বৈধ মতপার্থক্যও যদি এড়ানো যায়– যদিও তা কঠিন ও প্রায় অসম্ভব– তা হবে আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর ও নিরাপদ। যদি কোনো বিষয়ে আমাদের একান্তই মতপার্থক্য করতে হয়, তাহলে কোনোক্রমেই এর জন্য অনুসৃত আদব ও নিয়মাবলি পালনে আমরা যেন কোনোরূপ কুণ্ঠিত না হই, সেদিকে সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য।

https://nagorikpathagar.org

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই অনৈক্য ও বিভেদের এ করাল গ্রাস থেকে হিফাযত করুন! সকল বিভেদের প্রাচীর ছিন্ন করে দ্বীনের মহিমা ও শক্তি বৃদ্ধি এবং উম্মাহর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন! আমীন!

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

*****

https://nagorikpathagar.org

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাদির তালিকা

১. যুবদাতুল বায়ান ফী ঈদাহিল কুরআন ১ম খণ্ড (সূরা ফাতিহার তাফসীর), প্রচ্ছদ প্রকাশন, ঢাকা

২. যুবদাতুল বায়ান ফী ঈদাহিল কুরআন ২য় খণ্ড, প্রচ্ছদ প্রকাশন, ঢাকা

৩. খলীফাতু রাসূলিল্লাহ আবূ বাক্‌র আছ ছিদ্দীক (রা.), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

৪. তুলনামূলক ফিক্‌হ ১ম খণ্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা

৫. তাসাউফের স্বরূপ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

৬. মুসলিম লিপিকলা : উৎপত্তি ও বিকাশ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৭. বিদ'আত ১ম খণ্ড (প্রসঙ্গ : পরিচয়, প্রকরণ ও পরিণাম), ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা

৮. বিদ'আত ২য় খণ্ড (প্রসঙ্গ : ইসলামী আকীদা), ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা

৯. বিদ'আত ৩য় খণ্ড (প্রসঙ্গ : ইবাদত), বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা

১০. বিদ'আত ৪র্থ খণ্ড (জানাযা, কবর, যিয়ারত ও ঈছালে সওয়াব), ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা

১১. বিদ'আত ৫ম খণ্ড (ঈদে মীলাদুন্নবী সা., সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান), ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা

১২. বিদ'আত ৬ষ্ঠ খণ্ড (প্রসঙ্গ : তাসাউফ), ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা

১৩. বিদ'আত ৭ম খণ্ড (ইসলামের নানা ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তা ও মতবাদ), ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা

১৪. ইসলামের শাস্তি আইন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

১৫. তাযকিয়াতুন নাফ্‌স (আত্মশুদ্ধি), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

১৬. ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক, পর্দা ও সাজসজ্জা, বিআইসি, ঢাকা

১৭. ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা

https://nagorikpathagar.org

১৮. আধুনিক আরবী কাব্য সাহিত্য ১ম খণ্ড, আল-আকিব পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম

১৯. ইসমাতুল আম্বিয়া, আল-আকিব পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম

২০. অমুসলিমদের অধিকার ও মর্যাদা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

২১. সার্বভৌমত্ব : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

২২. গণতন্ত্র : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, প্রচ্ছদ প্রকাশন, ঢাকা

২৩. জঙ্গিবাদের উত্থান বনাম ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চ.বি.

২৪. নামাযে চেয়ারের ব্যবহার, বিআইসি, ঢাকা

২৫. সালাতুত তারাবীহ, মাকতাবাতুস সালাম, ঢাকা

২৬. প্রকৃত আলিমের সন্ধানে, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ঢাকা

২৭. আলিম সমাজের ঐক্য (অন্তরায় ও প্রক্রিয়া : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ)

প্রকাশের পথে

১. উসূলুল ঈমান ১ম খণ্ড (ঈমানের পরিচয় ও আল্লাহর ওপর ঈমান)

২. উসূলুল ঈমান ২য় খণ্ড (ঈমানের পরিপন্থি বিষয়সমূহ : কুফর, শিরক ও নিফাক)

৩. উসূলুল ঈমান ৩য় খণ্ড (ফেরেশতা, আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূলগণের ওপর ঈমান, সাহাবা ও আহলে বাইতের মর্যাদা)

৪. উসূলুল ঈমান ৪র্থ খণ্ড (আখিরাত ও কদরের ওপর ঈমান)

৫. উসূলুল ঈমান ৫ম খণ্ড (ইসলাম, ইহসান, ইখলাস, তাকওয়া, যুহদ ও তাসাউফ)

৬. উসূলুল ঈমান ৬ষ্ঠ খণ্ড (দাওয়াত, জিহাদ, ইকামতে দীন, খিলাফত, ই'তিসাম, ইফতিরাক, ওলা ও বরা')

৭. বিদ'আত ৮ম খণ্ড (প্রসঙ্গ : আধুনিক নানা চিন্তা ও মতবাদ)

৮. মুনাফিকের পরিচয় ও স্বরূপ

*****

https://nagorikpathagar.org

কুরআন-হাদীসের মর্মানুসারে মুসলিমরা পরস্পর ভাই ভাই। তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক হবে ভালোবাসা ও সহযোগিতার। এই ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের মূলভিত্তি হলো ঈমান। যে কেউ ঈমান আনবে, সে এই মহান ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে; চাই সে যেকোনো বর্ণেরই হোক কিংবা যেকোনো অঞ্চলেরই হোক অথবা যেকোনো ভাষাভাষী হোক। সকল মত ও বর্ণ-নির্বিশেষে মুসলিম জাতি একতাবদ্ধ হয়ে পুরো বিশ্বে নিজেদের মিশন পরিচালনা করবে– এটিই ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

ইসলামের ঐক্যের চিরন্তন শিক্ষাকে মজবুতভাবে ধারণ করেই মুসলমানরা দুনিয়ার বুকে অসাধ্য সাধন করেছে। তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুনিয়ার বুকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক নবযুগের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছে। কিন্তু যখনই মুসলমানরা ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনৈক্য ও দলাদলির পথে পা বাড়িয়েছে; গোষ্ঠীগত, জাতিগত, মতাদর্শ ও মত-পথের বিভাজন-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে ইসলামের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই তারা সব গৌরব হারিয়ে একটি হতভাগা হতোদ্যম জাতিতে পরিণত হয়েছে। তারা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়েছে।

আলিমগণই উম্মাহর পথপ্রদর্শক। অতএব, উম্মাহর কাঙ্ক্ষিত ঐক্য সাধনে আলিমগণই অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন– এটাই প্রত্যাশিত। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আলিম সমাজের সেই বহুল প্রতীক্ষিত ঐক্যের রূপরেখা অঙ্কন এবং ঐক্যের পথে যাবতীয় অন্তরায় দূরীকরণে বইটি একটি মাইলফলক বিবেচিত হবে বলে আমরা আশা রাখি, ইনশাআল্লাহ।

প্রচ্ছদ প্রকাশন
978-984-96946-5-6

https://nagorikpathagar.org